NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EEC

PAPER V

MODULES XVII-XX

ELECTIVE ECONOMICS
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, 2013

ভারত সরকারের দূর শিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক অর্থনীতি

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম — পর্যায় : E.E.C.-17

রচনা	সম্পাদনা
একক – 1, 2, 3, 4 — অধ্যাপিকা শিউলি জানা	অধ্যাপিকা বিজয়লক্ষ্মী মুখার্জী

পাঠক্রম — পর্যায় : E.E.C.-18

রচনা	সম্পাদনা
একক – 1, 2, 3, 4 — অধ্যাপক মৈনাক রায়	অধ্যাপিকা বিজয়লক্ষ্মী মুখার্জী

পাঠক্রম — পর্যায় : E.E.C.-19

রচনা	সম্পাদনা
একক – 1, 2, 3 — অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ	অধ্যাপক কল্যাণ কুমার দত্ত

পাঠক্রম — পর্যায় : E.E.C.-20

রচনা	সম্পাদনা
একক – 1, 2, 3 — অধ্যাপক কল্যাণ কুমার দত্ত	অধ্যাপক আশিস দাশগুপ্ত

ঘোষণা

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

E.E.C.—5

অর্থনীতির ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায় 17

একক	1	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের লক্ষ্য এবং বিচার্য বিষয়সমূহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্লাসিকাল তত্ত্ব	7-27
একক	2	হেক্‌শচার-ওলীন-স্যামুয়েলসন তত্ত্ব	28-40
একক	3	বাণিজ্য-নীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব	41-53
একক	4	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ	54-64

পর্যায় 18

একক	1	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং লেনদেন উদ্বৃত্ত	65-73
একক	2	বৈদেশিক মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজার	74-84
একক	3	লেনদেন ভারসাম্যর সমতা আনয়নকারী বিষয়সমূহ	85-102
একক	4	আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্ব-ব্যাঙ্ক	103-113

পর্যায় 19

একক	1	সামাজিক দ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্য ; বিশুদ্ধ সামাজিক দ্রব্যের সুদক্ষ বণ্টন, বাহ্যিকতা	114-129
একক	2	করারোপ ও সরকারি ব্যয়ের নীতি ; সুবিধার নীতি ও সামর্থ্যের নীতি	130-144

একক 3 ❑ প্রত্যক্ষ কর — করের ভিত্তি, আয়, ব্যয়, মূলধনী লাভ; কর্মপ্রয়াস, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর আয়করের প্রভাব 145-160

একক 4 ❑ পরোক্ষ কর — বিক্রয় কর ও উৎপাদন শুল্ক, পরোক্ষ করের বাড়তি বোঝা, করভার ও করচালন 161-171

পর্যায় 20

একক 1 ❑ রাজস্ব নীতি — উদ্দেশ্য, বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধী রাজস্ব নীতি, আর্থিক উন্নয়নের জন্য রাজস্ব নীতি 173-194

একক 2 ❑ সরকারি ঋণ 195-207

একক 3 ❑ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব নীতি 208-228

একক ১ ❐ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের লক্ষ্য এবং বিচার্য বিষয়সমূহ

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা

১.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব

- ১.৩.১ লক্ষ্য
- ১.৩.২ শ্রেণীবিভাগ — বিশুদ্ধ এবং আর্থিক
- ১.৩.৩ বিচার্য্য বিষয়সমূহ

১.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব

- ১.৪.১ ঐতিহাসিক পটভূমি
- ১.৪.২ অ্যাডাম স্মিথের পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব
- ১.৪.৩ ডেভিড রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব
- ১.৪.৪ সুবিধা ব্যয়ের ধারণা ও রিকার্ডোর তত্ত্ব

১.৫ ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের সংযোজন

- ১.৫.১ পরিবর্তনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব
- ১.৫.২ দুই-এর অধিক দেশের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব
- ১.৫.৩ দুই-এর অধিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব

১.৬ সারাংশ

১.৭ অনুশীলনী

১.৮ গ্রন্থ পঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে আমরা কি বুঝি।
- এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তত্ত্ব ঠিক কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের আলোচনার লক্ষ্য।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরা, প্রধানত অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর বক্তব্য কি ছিল।
- আডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর তত্ত্বে আর কি কি সংযোজন পরে ঘটেছে।

১.১ প্রস্তাবনা

আমরা আগে ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে পড়েছি। অর্থনীতির এই দুটি প্রধান শাখায় যে তত্ত্বের আলোচনা হয়, তা মূলত একটি বদ্ধ অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে সব দেশই অল্পবিস্তর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত বদ্ধ অর্থনীতির দেখা প্রায় মেলে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য চলে, তাকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত একটি অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত তত্ত্বসমূহের প্রয়োগ অর্থনীতির একটি বিশেষ শাখার জন্ম দিয়েছে—এই শাখাটির নাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত, অর্থাৎ অ্যাডাম স্মিথ থেকে কার্ল মার্কস্ পর্যন্ত যে সমস্ত অর্থনীতিবিদ তাঁদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করে গিয়েছেন তাঁদের আমরা ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ হিসাবে উল্লেখ করে থাকি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য যে গোটা পৃথিবীর পক্ষে এবং বাণিজ্যকারী সব দেশের পক্ষে লাভজনক, তা প্রতিপাদন করার জন্য এই ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো দুটি বিশেষ তত্ত্ব আমাদের দিয়ে গিয়েছেন।

এই এককে আমাদের আলোচনার বিষয় হল : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের লক্ষ্য ও তার বিচার্য বিষয়সমূহ, অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব এবং সেগুলিতে পরবর্তী কালের সংযোজন। দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য কেন ঘটে, তার কারণ আমরা অনুসন্ধান করব ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে।

১.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা

পৃথিবীর দুটি দেশের মধ্যে যখন দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবামূলক কার্যাদির লেনদেন ঘটে তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। বাণিজ্য একটি দেশের দুটি ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও ঘটতে পারে। যেমন ভারতের দুটি রাজ্য

পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান ঘটে থাকে। এই ধরণের বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি অঞ্চল অপর একটি অঞ্চলকে তার পাওনা মেটানোর সময় মুদ্রা সংক্রান্ত কোন অসুবিধায় পড়ে না, কারণ একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মুদ্রার নাম ও মান একই। পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপ্রদেশের কাছ থেকে কোন দ্রব্য ক্রয় করে যদি তার দাম টাকায় পরিশোধ করতে চায় তবে উত্তরপ্রদেশ তা নিতে অরাজী হবে না, কারণ দুটি রাজ্যেই একই মুদ্রার মাধ্যমে সমস্ত রকম লেনদেন চলে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি দেশের মুদ্রা অন্য একটি দেশের কাছে সাধারণত গ্রহণীয় হয় না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামের এবং বিভিন্ন মানের মুদ্রা প্রচলিত থাকায় যখন দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘটে তখন একটি নির্দিষ্ট হারে একটি দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করে নিতে হয়। বস্তুত বাণিজ্যের মাধ্যমে দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হারে বিনিময় ঘটে। ভারত যদি আমেরিকার পাওনা টাকায় মেটাতে চায় তাহলে আমেরিকা সেই টাকা নিতে অস্বীকার করবে কারণ আমেরিকায় ভারতের টাকার কোন ব্যবহার মূল্য নেই। কাজেই ভারতে ডলার এবং টাকার মধ্যে যে নির্দিষ্ট বিনিময় হার প্রচলিত আছে সেই বিনিময় হারে টাকাকে ডলারে পরিবর্তিত করে আমেরিকার পাওনা মেটাতে হবে। মুদ্রা সংক্রান্ত এই ধরণের জটিলতা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নেই।

দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য আবার অবাধ এবং নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কোন দেশের সরকার সেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর শুল্ক অথবা পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্যদিকে যদি এই ধরনের কোন নিয়ন্ত্রণ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর আরোপিত না হয় তাহলে অবাধ বাণিজ্যের অবস্থা বজায় থাকে।

১.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তত্ত্বকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত যে সমস্ত তত্ত্ব আমরা পড়েছি সেগুলির অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ। এই তত্ত্বের লক্ষ্য, শ্রেণীবিভাগ এবং বিচার্য বিষয়সমূহ আলোচনা করলে আমরা এই তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে তুলতে পারব।

১.৩.১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের লক্ষ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বের আলোচনার মূল কয়েকটি লক্ষ্য হল :

(১) দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য কেন হয় তা নির্ধারণ করা।

(২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী দেশগুলি কিভাবে লাভবান হয় তা দেখা।

(৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ কিভাবে দেশগুলির মধ্যে বণ্টিত হয় তা নির্ধারণ করা।

(৪) আন্তর্জাতিক লেনদেনের হিসাব কিভাবে করা হয় তা জানা।

(৫) দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তা দেখা এবং সবশেষে

(৬) বিভিন্ন বাণিজ্যিক নীতি কেন এবং কখন গ্রহণ করা হয় এবং তার ফল কি হয় তা নির্ধারণ করা।

সাধারণত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আলোচনা দুটি দেশের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়। ধরা যাক এই দুটি দেশ হল ভারত এবং আমেরিকা। এখন ভারত যদি 'ক' দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম হয় এবং আমেরিকা 'খ' দ্রব্য উৎপাদনে, তাহলে স্পষ্টতই ভারত 'ক' দ্রব্যের বিনিময়ে আমেরিকার কাছ থেকে 'খ' দ্রব্যটি নেবে। অন্যদিকে আমেরিকা 'খ' দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতের কাছ থেকে 'ক' দ্রব্যটি নেবে। এই দুটি দেশের মধ্যে অতএব বাণিজ্য হবে এবং দুটি দেশের পক্ষেই তা লাভজনক হবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের উৎপাদন কাঠামো এত সরল হয় না। যদি আলোচনা দুটি দেশ এবং দুটি দ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে এমন হতে পারে যে দুটি দেশের প্রত্যেকটিই দুটি দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম, কিন্তু হয়ত প্রথম দেশটি কোন একটি দ্রব্য কম খরচে উৎপাদন করতে পারে দ্বিতীয় দেশটির তুলনায়। আবার এমনও হতে পারে যে একটি দেশ দুটি দ্রব্যই অন্য দেশটির তুলনায় কম খরচে উৎপাদন করতে পারে, যদিও তুলনামূলকভাবে একটির উৎপাদনে বেশি কম খরচ পড়ে। এই রকম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে কি না, হলে কেন হবে তা আলোচনা করা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির স্বভাবতই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে লাভ হয় কারণ তা না হলে তারা এই বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত না। কিন্তু বিভিন্ন বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে কিভাবে দেশগুলি এই লাভ সংগ্রহ করে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের এটি আলোচনার বিষয়। এই লাভ বাণিজ্যকারী দেশগুলির মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব তাও নির্ধারণ করে। দুটি দেশের মধ্যে যদি একটি দেশ ছোট এবং অপরটি বড় হয় তাহলে দুটি দেশ সমানভাবে লাভবান নাও হতে পারে— আশ্চর্যজনকভাবে এমন হতে পারে যে ছোট দেশটিরই লাভ হল, বড়টির নয়। বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের বণ্টন কেমন হবে তা দেখা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূলত দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবামূলক কার্যাদির লেনদেন বোঝালেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধুমাত্র এই প্রকারের লেনদেনই ঘটে তা নয়। দুটি দেশের মধ্যে মূলধনের চলাচল ঘটতে পারে। একটি দেশ অন্য আর একটি দেশের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারে এবং এছাড়াও আরও নানা ধরনের লেনদেন দুটি দেশের মধ্যে ঘটতে পারে। এই বিভিন্ন ধরনের লেনদেন সংক্রান্ত হিসাব প্রত্যেকটি দেশকেই রাখতে হয়। একটি বিশেষ ধরনের হিসাব পদ্ধতির সাহায্যে এই হিসাব রাখা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের একটি শাখার লক্ষ্য হলো এই আন্তর্জাতিক লেনদেন সংক্রান্ত হিসাব কিভাবে রাখা হয় তা আলোচনা করা।

আমরা আগেই দেখেছি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে একটি বিনিময় হার স্থির হওয়া প্রয়োজন। তা নাহলে ঐ দুটি দেশের মধ্যে লেনদেন ঘটা সম্ভব নয়। এর কারণ হিসেবে আমরা

দেখেছি যে একটি দেশের মুদ্রা অন্য দেশটির কাছে সরাসরি গ্রহণযোগ্য নয়। দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের লক্ষ্য হলো সে সম্বন্ধে আলোকপাত করা।

বাণিজ্য নীতির আলোচনা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। যখন একটি দেশ অন্য আর একটি দেশের কাছ থেকে দ্রব্যসামগ্রী বা সেবামূলক কার্যাদি ক্রয় করে তখন আমরা বলি যে ঐ দেশটি আমদানি করছে। অন্যদিকে প্রথম দেশটির কাছ থেকে দ্বিতীয় দেশটি যদি দ্রব্যসামগ্রী বা সেবামূলক কার্যাদি ক্রয় করে তখন বলা হয় যে প্রথম দেশটি রপ্তানি করছে। এই আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কিছু নীতির আলোচনা করা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের লক্ষ্য। এই আলোচনা থেকে জানা যায় কোন বিশেষ বাণিজ্য নীতি কেন এবং কখন গ্রহণ করা হয় এবং তার ফল কি হয়। বাণিজ্য নীতির উদাহরণ হিসেবে আমদানি বাণিজ্যের ওপর শুল্ক আরোপের নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

১.৩.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ—বিশুদ্ধ এবং আর্থিক

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—বিশুদ্ধ এবং আর্থিক। এই দুটি শাখার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, বিশুদ্ধ তত্ত্বে কোন আর্থিক বিষয়ের প্রভাব নেই কিন্তু আর্থিক তত্ত্বে আর্থিক বিষয়গুলিই গুরুত্বপূর্ণ। বিশুদ্ধ তত্ত্বে দাম বলতে আমরা আপেক্ষিক দাম বুঝি, যেমন, এক প্যাকেট সিগারেটের দাম এক পাউন্ড রুটি। এই তত্ত্বে দামকে দেশীয় বা বিদেশী কোন মুদ্রাতেই প্রকাশ করা হয় না। অন্যদিকে আর্থিক তত্ত্বে দেশীয় এবং বিদেশী সব মুদ্রাতেই দামকে প্রকাশ করা হয়। 'বিশুদ্ধ' এই বিশেষণটি ব্যবহার করে দুটি তত্ত্বের মধ্যে এই পার্থক্যের বিষয়টিই বোঝান হয়ে থাকে। এমন নয় যে বিশুদ্ধ তত্ত্বে বাস্তব জগতের বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকা হয়। বস্তুত বিশুদ্ধ তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব জগৎ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিচার করা যায়। বিশুদ্ধ তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হল এই যে এই তত্ত্বে অর্থের ভূমিকা নিরপেক্ষ।

বিশুদ্ধ তত্ত্বকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে : (ক) বাস্তব তত্ত্ব এবং (খ) কল্যাণমূলক তত্ত্ব। এই দুটি ভাগের মধ্যে পার্থক্য বাস্তবে যা হয় এবং যা হওয়া উচিত এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য। বাস্তব তত্ত্বে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য কেন ঘটে এবং সেই বাণিজ্যের প্রকৃতি কি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়। অন্যদিকে, কল্যাণমূলক তত্ত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে লাভ, দুটি দেশের মধ্যে সেই লাভের বণ্টন এবং ফলস্বরূপ দুটি দেশের কল্যাণের উপর প্রভাব এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ প্রথমটিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাস্তবে কি ঘটে তা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং দ্বিতীয়টিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির কল্যাণের জন্য কি ঘটা উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১.৩.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের বিচার্য বিষয়সমূহ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের লক্ষ্য এবং শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যে বিষয়গুলির অবতারণা করেছি সেই বিষয়গুলির আলোচনা থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের বিচার্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে

একটি ধারণা মোটামুটিভাবে আমাদের গড়ে উঠেছে। আমরা দেখেছি যে বিশুদ্ধ এবং আর্থিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের এই দুটি শাখায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার মূল বিষয়গুলি হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কখন ঘটবে, একটি দেশের আমদানি-রপ্তানির প্রকৃতি কিভাবে নির্ধারিত হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে কি ধরনের লাভ হতে পারে, কেন হতে পারে এবং এই লাভের বণ্টন কিভাবে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিগুলি কি কি এবং তাদের অর্থনৈতিক ফলাফল কি ঘটে, লেনদেন-ব্যালেন্সে ভারসাম্য কিভাবে আসে, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার কিভাবে কাজ করে ইত্যাদি। সাধারণত দুটি দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত বিষয়গুলি তত্ত্বগতভবে আলোচনা করা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বে।

১.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব

১.৪.১ ঐতিহাসিক পটভূমি

১৭৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথের "ওয়েলথ্ অফ নেশনস্" প্রকাশিত হওয়ার পরই অর্থনীতি একটি সংগঠিত বিষয় হিসেবে গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর রচনা অবশ্য এই সময়ের আগেও প্রকাশিত হয়েছে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে একদল লেখক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর যে সমস্ত লেখা লিখেছিলেন সেগুলি "মার্কেনটাইলি শ্রম" বা বাণিজ্যবাদ নামে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক মতবাদের প্রচারে সাহায্য করেছিল। এই দুই শতাব্দীতে এই বিশেষ মতবাদটির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো এবং অন্যান্য ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে হলে বাণিজ্যবাদ সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন কারণ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারা এই মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

"বাণিজ্যবাদ" এই প্রাচীন অর্থনৈতিক মতবাদটির মূল বক্তব্য ছিল এই যে, কোন একটি দেশ যদি সোনা-রূপা এই মূল্যবান ধাতুগুলি বেশি করে সংগ্রহ করতে পারে তাহলে সেই দেশটি ধনী এবং ক্ষমতাশালী হবে। অর্থাৎ মূল্যবান ধাতুসমূহের সংগ্রহই সম্পদ এবং ক্ষমতার উৎস। যদি সেই দেশের নিজস্ব স্বর্ণখনি না থাকে তাহলে সেই দেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা কারণ এই উদ্বৃত্তের ফলস্বরূপ বিদেশ থেকে সোনা সেদেশে আসবে। অবশ্য এই বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল হতে হবে অর্থাৎ রপ্তানি আমদানি থেকে বেশি হতে হবে। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল হলে দেনার থেকে পাওনা বেশি হবে এবং ফলে বিদেশ থেকে সোনা দেশে আসবে। যে সময়ে এই মতবাদটি প্রচলিত ছিল সেই সময়ে সোনাই ছিল দেনা-পাওনা মেটানোর মাধ্যম। বাণিজ্যবাদের প্রবক্তারা আরও বিশ্বাস করতেন যে বাণিজ্য অবাধ হওয়া উচিত নয়, কারণ ব্যক্তিবিশেষের কাছে দেশের জন্য সেনা সংগ্রহের চেয়ে নিজের জন্য মসলিনের মত মূল্যবান কাপড় সংগ্রহ অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এই কারণে বাণিজ্য যদি অবাধ হয় তাহলে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত গড়ে তোলা সহজ হবে না। এই অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত গড়ে তুলতে হলে মসলিনের মত দ্রব্য ক্রয় নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। এঁরা তাই নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যের পক্ষে। এই মতবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হলো

পৃথিবীর সমস্ত দেশ একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে লাভ সংগ্রহ করতে পারে না—দুটি দেশের মধ্যে একটির লাভ হয় অন্যটির অলাভের বিনিময়ে। "মার্কেনটাইলিজম" মতবাদটি সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত ধারণা নিয়ে এবার আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বগুলি আলোচনা করব।

১.৪.২ অ্যাডাম স্মিথের পূর্ণ ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব

অ্যাডাম স্মিথ অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষায়ন যদি পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধার ভিত্তিতে হয় তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে সব দেশেরই লাভ হবে এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কাজেই যদি এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করা হয় তাহলে সব দেশের পক্ষে কাম্য অবস্থায় পৌঁছান যাবে না। নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য নয়, অবাধ বাণিজ্যই সব দেশের পক্ষে লাভজনক, এই ছিল স্মিথের বিশ্বাস। তাঁর এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি যে তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, সেই তত্ত্বটিই পূর্ণ ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব নামে পরিচিত।

পূর্ণ ব্যয়- পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্বের ভিত্তি হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষায়ন এবং শ্রমবিভাগ। একটি দেশের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি সাধারণত সেই কাজটি করেন যে কাজের জন্য তিনি নিজেকে সবচেয়ে দক্ষ ও উপযুক্ত মনে করেন। এইভাবে একটি দেশের ভিতর বিভিন্ন ব্যাক্তর মধ্যে বিশেষায়ন ঘটে। ঠিক একই রকমভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষায়ন ঘটতে পারে। কোন একটি দেশ যদি কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি দক্ষ হয়, তাহলে সেই দেশ ঐ বিশেষ দ্রব্যটির উৎপাদনে সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ নিয়োজিত করবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এই দ্রব্যটির বিনিময়ে অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করবে। সব দেশ একইভাবে চললে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষায়ন ঘটবে। স্মিথের মতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বিশেষায়ন এবং তজ্জনিত বাণিজ্য সকল দেশের পক্ষেই লাভজনক হবে। তাঁর পূর্ণ ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্বটি আলোচনা করলে তাঁর এই বক্তব্য আমরা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারব।

স্মিথের পূর্ণ ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব কতকগুলি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি হল ঃ

(ক) দুটি দেশ, দুটি দ্রব্য এবং একটি উৎপাদনের উপাদান।

(খ) শ্রমই এই একমাত্র উপাদান।

(গ) শ্রমের সব একক সমপ্রকৃতির।

(ঘ) একটি দেশের মধ্যে শ্রম সম্পূর্ণভাবে গতিশীল।

(ঙ) কোন দ্রব্যের সব একক উৎপাদন করতে এই শ্রম লাগে। অর্থাৎ দ্রব্যটির উৎপাদন ব্যয় স্থির।

এখন এই একমাত্র উপাদান শ্রমের সব একক সমপ্রকৃতির হলে এবং তা দেশের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গতিশীল হলে দেশের সর্বত্র একই মজুরির হার প্রচলিত থাকবে এবং তখন কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় ঐ দ্রব্যের এক একক উৎপাদন করতে প্রয়োজনীয় শ্রমের এককের দ্বারা নির্ধারিত হবে। কোন দ্রব্যের

মূল্য সেই দ্রব্যটির উৎপাদন ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে; কাজেই বলা যায় এক্ষেত্রে দ্রব্যটির মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে দ্রব্যটির উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা। এই মূল্যতত্ত্বকে মূল্যের শ্রমতত্ত্ব বলা হয়। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রমুখ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদগণ এই মূল্যতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

এই পটভূমিকায় আমরা এবার একটি উদাহরণের সাহায্যে অ্যাডাম স্মিথের পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্বটি বিশ্লেষণ করব। ধরা যাক দেশ দুটি হল A ও B এবং দ্রব্য দুটি হল X ও Y, এই দুটি দ্রব্যের একক প্রতি উৎপাদনের জন্য দুটি দেশে কি পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন হয় তা নিচে দেওয়া হল ঃ

	X	Y
A	4	2
B	2	4

A দেশটি 4 একক শ্রমব্যয় করে 1 একক X দ্রব্য উৎপাদন করে এবং 2 একক শ্রম ব্যয় করে 1 একক Y দ্রব্য উৎপাদন করে। অন্যদিকে B দেশটির 1 একক X দ্রব্য উৎপাদন করতে 2 একক শ্রম লাগে এবং 1 একক Y দ্রব্য উৎপাদন করতে 4 একক শ্রম লাগে। অর্থাৎ A দেশটির Y দ্রব্য উৎপাদনে এবং B দেশটির X দ্রব্য উৎপাদনে পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা আছে। এখন যদি A দেশটি Y দ্রব্যের উৎপাদনে এবং B দেশটি X দ্রব্যের উৎপাদনে সমস্ত শ্রম নিয়োজিত করে অর্থাৎ যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষায়ন হয় তাহলে দেখা যাবে উভয় দেশেরই লাভ হচ্ছে এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদন বেশি হচ্ছে। ধরা যাক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রব্য বিনিময়ের অনুপাত 1 : 1 এর অর্থ হল A দেশটি 1 একক YB দেশকে দিয়ে তার কাছ থেকে 1 একক X পেতে পারে। B দেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হওয়ার আগে A দেশটি 6 একক শ্রম ব্যয় করে 1 একক X এবং Y ভোগ করছিল এবং B দেশটিও তাই ভোগ করছিল। বাণিজ্য শুরু হওয়ার পর দুটি দেশই সেই দ্রব্য উৎপাদন করবে যে দ্রব্য উৎপাদনে তার পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা বেশি। অর্থাৎ A দেশটি 6 একক শ্রম দিয়ে শুধু Y দ্রব্য এবং B দেশটিও তাই ভোগ করছিল। বাণিজ্য শুরু হওয়ার পর দুটি দেশই সেই দ্রব্য উৎপাদন করবে যে দ্রব্য উৎপাদনে তার পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা বেশি। অর্থাৎ A দেশটি 6 একক শ্রম দিয়ে শুধু Y দ্রব্য এবং B দেশটি একই শ্রম দিয়ে শুধু X দ্রব্য উৎপাদন করবে। A ও একক Y এবং B এ একক X উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর মোট উৎপাদন 2 একক X এবং 2 একক X এবং 2 একক Y থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 3 একক X এবং 3 একক Y তে। এখন ধরা যাক A 1 একক Y B কে দিয়ে 1 একক X Bর কাছ থেকে নিচ্ছে। তাহলে বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় একই শ্রম ব্যয় করে A 2 একক Y ও 1 একক X এবং B 2 একক X ও 1 একক Y ভোগ করছে অর্থাৎ দুটি দেশেরই ভোগের মাত্রা বেড়েছে। দুটি দেশই একই শ্রমের বিনিময়ে বেশি ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে কিভাবে দুটি দেশেরই একসঙ্গে লাভ হতে পারে তা অ্যাডাম স্মিথের পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্বটি অত্যন্ত সহজভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের

সুবিধা সবক্ষেত্রে থাকবে এমন নাও হতে পারে সেহেতু এই তত্ত্বটির সাহায্যে গোটা পৃথিবীর বাণিজ্যের একটা ছোট অংশমাত্র বিশ্লেষণ করা যায়, সবটা নয়। এমন হতে পারে যে একটি দেশ দুটি দ্রব্য উৎপাদনেই বেশি দক্ষ এমন অবস্থায় বাণিজ্য কি হবে না? এই প্রশ্নের উত্তর স্মিথের তত্ত্ব দিতে পারে না। ডেভিড রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। আমরা এবার রিকার্ডোর তত্ত্বটি আলোচনা করব।

১.৪.৩ ডেভিড রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব

অ্যাডাম স্মিথের মতে দুটি দেশ ও দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য হবে যদি একটি দেশ কোন একটি দ্রব্য অন্য দেশটির তুলনায় কম খরচে উৎপাদন করতে পারে এবং অন্য দেশটি অন্য দ্রব্যটি কম খরচে উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু যদি প্রথম দেশটি দুটি দ্রব্যই অন্য দেশটির তুলনায় কম খরচে উৎপাদন করতে পারে তাহলে এই দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে কি না সে প্রশ্নের উত্তর স্মিথ দিতে পারেন নি, দিয়েছেন রিকার্ডো। ১৮১৭ সালে রিকার্ডো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "*Principles of Political Economy and Taxation*" প্রকাশ করেন এবং এই গ্রন্থে তিনি তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব নামে যে তত্ত্ব আলোচনা করেন তাতে ওপরের প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। রিকার্ডোর মতে বাণিজ্য হওয়ার জন্য পূর্ণ ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধা থাকার প্রয়োজন নেই, তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধা থাকাটাই যথেষ্ট।

ধরা যাক দুটি দেশের মধ্যে একটি দেশ দুটি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই অন্য দেশটির তুলনায় বেশি দক্ষ। কিন্তু তবু এমন তো হতেই পারে যে দক্ষতার পার্থক্যের মাত্রা এক নয়। অর্থাৎ একটি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর বেশি দক্ষতা থাকতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে যে দ্রব্যটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশটি অন্য দেশটির তুলনায় অধিকতর বেশি দক্ষ সেই দ্রব্যটির উৎপাদনে তার তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা আছে বলা হবে। দুটি দেশ এবং দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা একটি আপেক্ষিক ধারণা। অর্থাৎ যদি A দেশটির Y দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা থাকে তাহলে X দ্রব্য উৎপাদনে B দেশটির তুলনামূলক সুবিধা থাকবে।

রিকর্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব কয়েকটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অনুমানগুলি হল ঃ

(ক) দুটি দেশ, দুটি দ্রব্য এবং একটি উৎপাদনের উপাদান।

(খ) শ্রমই এই একমাত্র উপাদান।

(গ) শ্রমের সব একক সমপ্রকৃতির।

(ঘ) একটি দেশের মধ্যে শ্রম সম্পূর্ণভাবে গতিশীল।

(ঙ) বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম গতিশীল নয়।

(চ) কোন দ্রব্যের সব একক উৎপাদন করতে একই শ্রম লাগে। অর্থাৎ দ্রব্যটির উৎপাদন ব্যয় স্থির।

(ছ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কোনরকম বাধা নেই।

(জ) দুটি দেশের মধ্যে দ্রব্যের আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয়শূন্য।

দেখা যাচ্ছে যে, রিকার্ডো অ্যাডাম স্মিথের মতোই মূল্যের শ্রমতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। রিকার্ডো কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানের গতিশীলতার অভাবের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানগুলি যদি সম্পূর্ণভাবে গতিশীল হয় তাহলে সব দ্রব্য সেই দেশেই উৎপাদিত হবে যে দেশের সব দ্রব্য উৎপাদনে পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা আছে।

স্মিথের তত্ত্বের ন্যায় এই তত্ত্বেও কোন দ্রব্যের মূল্য ঐ দ্রব্যের এক একক উৎপাদন করতে যত একক শ্রম ব্যয়িত হয় তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অনুমানগুলি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দ্রব্যের সব একক উৎপাদন করতে একই পরিমাণ শ্রম লাগে অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় স্থির। এখন একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা দুটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়. পার্থক্যের সুবিধা কখন উদ্ভূত হয় এবং এরকম পরিস্থিতিতে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য লাভজনক হয় কি না দেখাব।

দুটি দেশ হল A ও B এবং দুটি দ্রব্য হল X ও Y. এই দুটি দ্রব্যের একক প্রতি উৎপাদনের জন্য দুটি দেশে কি পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন হয় তা নিচে দেওয়া হল ঃ

	X	Y
A	4	2
B	6	12

এই উদাহরণে A দেশটি X ও Y দুটি দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রেই B দেশটি অপেক্ষা বেশি সুবিধা ভোগ করছে কারণ দুটি দ্রব্যেরই একক প্রতি উৎপাদনে A দেশটির B দেশ অপেক্ষা কম শ্রম প্রয়োজন হচ্ছে। প্রশ্ন হল এরকম ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে কি না। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসরণ করে দেখান যায় যে এরকম ক্ষেত্রেও বাণিজ্য হবে এবং সেই বাণিজ্য দুটি দেশের পক্ষেই লাভজনক হবে।

দুটি দ্রব্যেরই উৎপাদনে A দেশটির চরম সুবিধা থাকলেও সুবিধার পার্থক্যের মাত্রা এক নয়। Y দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে A অধিকতর বেশি সুবিধা ভোগ করছে। এক একক Y দ্রব্য উৎপাদন করতে B দেশের যে শ্রম প্রয়োজন হয় A-র লাগে তার $^{2}/_{12}$ ভাগ বা প্রায় 17%. অন্যদিকে এক একক X দ্রব্য উৎপাদন করতে B দেশের যে শ্রম প্রয়োজন হয় A-র লাগে তার $^{4}/_{6}$ ভাগ বা প্রায় 67%. অর্থাৎ B দেশের তুলনায় A দেশের অনেক কম শ্রম Y দ্রব্য উৎপাদনে। অতএব A দেশের উচিত Y দ্রব্যের উৎপাদনে তার সমস্ত শ্রম নিযুক্ত করা। এখন দুটি দেশের ক্ষেত্রে একটি দেশের যদি Y এর উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা থাকে তাহলে অন্য দেশটির অবশ্যই X-এর উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা থাকবে। এক্ষেত্রে B দেশের তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা আছে X এর উৎপাদনে। অতএব B দেশের উচিত X দ্রব্যের উৎপাদনে

তার সমস্ত শ্রম নিযুক্ত করা। এইভাবে আন্তর্জাতিক বিশেষায়ন হলে পৃথিবীর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ওপরের উদাহরণ অনুসারে বিশেষায়নের আগে পৃথিবীর মোট উৎপাদন ছিল 2 একক X এবং 2 একক Y। বিশেষায়নের পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল 3 একক X এবং 3 একক Y. A দেশটি 6 একক শ্রম Y দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত করে 3 একক Y উৎপাদন করতে পারছে এবং অন্যদিকে B দেশটি 18 একক শ্রম X দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত করে 3 একক X উৎপাদন করতে পারছে। এখন, বাণিজ্য পূর্ববর্তী অবস্থায় দুটি দেশের ভোগের মাত্রা সমান 1 একক X এবং 1 একক Y, ধরা যাক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটি দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় হার 1X : 1Y. এবার দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হলে দেখা যাবে দুটি দেশেই বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় ভোগের মাত্রা বেশি হচ্ছে। A দেশটি যদি 1 একক Y B দেশকে দিয়ে তার কাছ থেকে 1 একক X নেয় তাহলে A এখন ভোগ করতে পারবে 2 একক Y আর 1 একক X. একইরকমভাবে বাণিজ্য পরবর্তী অবস্থায় B ভোগ করতে পারবে 2 একক X এবং 1 একক Y বাণিজ্যের ফলে দুটি দেশেরই লাভ হবে। একই শ্রম ব্যয় করে বেশি ভোগ সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধরন এক্ষেত্রে নির্ধারিত হচ্ছে শ্রমের উৎপাদনশীলতার পার্থক্য দিয়ে।

আমাদের ওপরের আলোচনায় আমরা ধরে নিয়েছি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার হচ্ছে 1X : 1Y. এটা আমাদের ধরে নিতে হয়েছে এই জন্য যে রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্বে শুধু যোগানের দিকটাই বিশ্লেষণ করা হয়েছে, চাহিদা দিক নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার দুটি দেশের চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়। রিকার্ডোর তত্ত্বে চাহিদার দিকের কোন প্রতিফলন নেই বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। দেশের অভ্যন্তরে দুটি দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্য হার নির্ধারিত হচ্ছে তুলনামূলক ব্যয়ের অনুপাত দিয়ে। A দেশটিতে এই তুলনামূলক ব্যয়ের অনুপাত হলো $^1/_2$X : 1 Y অন্যদিকে B দেশটিতে এই তুলনামূলক ব্যয়ের অনুপাত হলো $^1/_2$Y : 1X দামের অনুপাত ব্যয়ের অনুপাতের প্রতিফলন ধরে নিয়ে বলা যায় যে A দেশের অভ্যন্তরে দুটি দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্য হার হলো $^1/_2$X : 1Y এবং B দেশের অভ্যন্তরে দুটি দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্য হার হলো $^1/_2$Y : 1X. A দেশটি $^1/_2$X : 1Y এই বাণিজ্য হারে বাণিজ্যে উৎসাহিত হবে না কারণ দেশের মধ্যেই সে এই হারে বিনিময় করতে পারে। একই কারণে B দেশটি $^1/_2$Y : 1X এই বাণিজ্য হারে বাণিজ্যে উৎসাহিত হবে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার এই দুটি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হারের মধ্যে থাকলে তবেই দুটি দেশ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করবে। রিকার্ডো তাই ধরে নিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার দুটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হারের মধ্যে কোথাও থাকবে। আমাদের উদাহরণে রিকার্ডোকে অনুসরণ করে আমরা ধরে নিয়েছি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার হবে 1X : 1Y. অর্থাৎ $^1/_2$X : 1Y এবং 1X : $^1/_2$Y এর মধ্যে।

রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কিভাবে বিস্তৃতভাবে চলতে পারে তা দেখাতে সক্ষম। মূলত এই তত্ত্ব ভুল নয়। আজ দু'শ বছর পরেও এই তত্ত্বের সাধারণভাবে যে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। তবে এই তত্ত্ব নানাদিক থেকে

সমালোচিত হয়েছে। প্রথমত, বলা হয় যে, মূল্যের শ্রমতত্ত্ব কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রমই একমাত্র উপাদান নয় এবং শ্রমের সব একক সমপ্রকৃতির এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই। ডাক্তারের বেতন বৃদ্ধি পেলে একজন রাজমিস্ত্রি ডাক্তার হয়ে যেতে পারবে না। অতএব দেশের সর্বত্র একই মজুরি প্রচলিত থাকবে একথা বলা যাবে না। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যই তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের কারণ বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু শ্রমের উৎপাদনশীলতা কেন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন, তা এই তত্ত্বে বিশ্লেষণ করা হয়নি। এর অর্থ হলো তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য ধরে নেওয়া হয়েছে, ব্যাখ্যা করা হয়নি। তৃতীয়ত, এই তত্ত্বে বাণিজ্য কেন হবে তা দেখান হয়েছে, কিন্তু কি শর্তে, তা নির্ধারণ করা হয়নি। এই তত্ত্বে কেবলমাত্র যোগানের দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—চাহিদার দিক নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। এই কারণে এই তত্ত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল চাহিদার বিষয় বিবেচনা করে এই সমস্যার সমাধান করেন।

১.৪.৪ সুবিধা ব্যয়ের ধারণা ও রিকার্ডোর তত্ত্ব

রিকার্ডোর তত্ত্বটি যে সমস্ত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলির মধ্যে একটি অনুমান কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই অনুমানটি হল যে, কোন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয় সেই দ্রব্যের এক একক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণের দ্বারা। শ্রমের সব একক সমপ্রকৃতির নয় এবং শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান নয়। এখন প্রশ্ন হল মূল্যের শ্রম যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্বটি কি বর্জনীয়? উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল রিকার্ডোর তত্ত্বটির ব্যাখ্যার জন্য মূল্যের শ্রমতত্ত্ব একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয়; সুবিধাব্যয়ের ধারণার সাহায্যে রিকার্ডোর তত্ত্বের ব্যাখ্যা সম্ভব। ১৯৩৬ সালে অধ্যাপক হ্যাবারলার এই সুবিধাব্যয়ের ধারণাটির প্রচলন করেন।

সুবিধাব্যয়ের ধারণাটির ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানের সংখ্যার উপর কোন বিধিনিষেধ নেই। একটি, দুটি অথবা দুটির অধিক, এমনকি দেশে লভ্য সমস্ত উপাদান নিয়ে সুবিধাব্যয়ের আলোচনা করা যেতে পারে। X এবং Y দুটি দ্রব্য বিবেচনা করলে X দ্রব্যের সুবিধাব্যয় এক একক অতিরিক্ত X দ্রব্য উৎপাদন করবার জন্য যে পরিমাণ Y দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হয় তা দিয়ে পরিমাপ করা হয়। Y দ্রব্যের উৎপাদন কমালে উৎপাদনের উপাদান, তা সে যত সংখ্যকই হোক, মুক্ত হয় এবং তখন তা দিয়ে অতিরিক্ত X দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। যে দেশের যে দ্রব্যের উৎপাদনে সুবিধাব্যয় কম সেই দেশের সেই দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা আছে বলা যায়।

ধরা যাক A এবং B দুটি দেশ। X এবং Y দুটি দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। আরও ধরা যাক A দেশটির ক্ষেত্রে এক একক অতিরিক্ত X দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য এক একক Y দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হয় অর্থাৎ A দেশটিতে IX : 1Y অন্যদিকে B দেশটির ক্ষেত্রে ধরা যাক এক একক অতিরিক্ত X দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য দুই একক Y দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হয় অর্থাৎ B দেশটিতে IX : 2Y দেখা যাচ্ছে যে A দেশটিতে X দ্রব্যের উৎপাদনে সুবিধাব্যয় কম এবং B দেশটিতে Y দ্রব্যের উৎপাদনে সুবিধাব্যয় কম। অতএব A

দেশটির X দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে এবং B দেশটির Y দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামলূক সুবিধা রয়েছে।

সুবিধাব্যয়ের ধারণাটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়। কারিগরী জ্ঞানের সম্যক ব্যবহার ঘটিয়ে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ পূর্ণভাবে কাজে লাগালে দুটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন সম্মিলন উৎপাদন করা যায় উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার বিভিন্ন বিন্দু তা দেখায়। অর্থাৎ উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার বিভিন্ন বিন্দু দুটি দ্রব্যের উৎপাদনের বিভিন্ন সম্মিলন নির্দেশ করে। সুবিধাব্যয় যদি স্থির বলে ধরা হয় তাহলে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখাটি একটি সরলরেখা হবে। স্থির সুবিধাব্যয়ের ক্ষেত্রে A এবং B এই দুটি দেশের উৎপাদন। সম্ভাবনা রেখা নিচের চিত্রে দেখান হল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার জন্য সরলরৈখিক উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার ব্যবহার প্রয়োজন কারণ রিকার্ডোর তত্ত্বে উৎপাদন ব্যয় স্থির বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

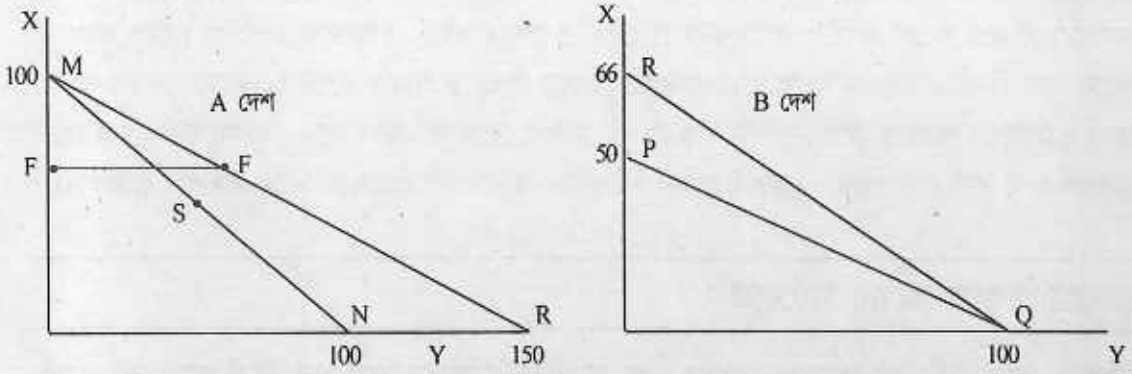

চিত্র ঃ ১(খ) ১

এখন একটি দেশ অন্য কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত না থাকলে সে নিজে যা উৎপাদন করতে পারে তার বেশি সে ভোগ করতে পারে না। কাজেই বাণিজ্য-পূর্ববর্তী অবস্থায় কোন দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখাই তার ভোগ-সম্ভাবনা রেখা। আমাদের উদাহরণে A দেশ বাণিজ্য পূর্ববর্তী-অবস্থায় দুটি দ্রব্য X ও Y কি পরিমাণ উৎপাদন এবং ভোগ করবে তা MN রেখার উপর কোন একটি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হবে। ধরা যাক 'S' হল সেই বিন্দু। অর্থাৎ বাণিজ্যে নামার আগে A দেশ 'S' বিন্দুতে উৎপাদন এবং ভোগ করবে। এবার A এবং B দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হলে তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে দুটি দেশেই বিশেষায়ন ঘটবে। A দেশ X দ্রব্যের উৎপাদনে এবং B দেশ Y দ্রব্যের উৎপাদনে মনোনিবেশ করবে। স্থির ব্যয়ের ক্ষেত্রে দুটি দেশেই সম্পূর্ণভাবে বিশেষায়ন ঘটবে। অর্থাৎ A দেশ উৎপাদন করবে M বিন্দুতে এবং B দেশ Q বিন্দুতে। অতঃপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারে দুটি দেশ নিজেদের মধ্যে দ্রব্যের আদান প্রদান করে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করবে। দ্রব্যের বাজারের চাহিদার দিক বিবেচনা না করলে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার

নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এখানে রিকার্ডোকে অনুসরণ করে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই বাণিজ্য হার দুটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের অনুপাতের মধ্যে কোথাও অবস্থান করবে। ধরা যাক IX : $1^1/_2$Y হল এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার। উপরের চিত্রে A দেশের ক্ষেত্রে MR রেখাটি এবং B দেশের ক্ষেত্রে QR' রেখাটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার নির্দেশ করছে। কোনও পরিবহন ব্যয় নেই ধরে নিলে দুটি দেশই একই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারের সম্মুখীন হবে। MR এবং QR' রেখা দুটির ঢাল সমান। এবার A দেশ যদি ME পরিমাণ X দ্রব্যের বিনিময়ে EF পরিমাণ Y দ্রব্য B দেশের কাছ থেকে নেয় তাহলে বাণিজ্য পরবর্তী অবস্থায় সে F বিন্দুতে অবস্থান করবে। S বিন্দু অপেক্ষা F বিন্দুতে দুটি দ্রব্যই বেশি পাওয়া যাচ্ছে। অতএব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য A দেশের লাভ হচ্ছে। তবে এমনও হতে পারে যে বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় A দেশ এমন একটি বিন্দুতে অবস্থান করছে যেখানে S বিন্দুর সঙ্গে তুলনায় সে একটি দ্রব্য বেশি কিন্তু আর একটি দ্রব্য কম ভোগ করতে পারছে। এই অবস্থায় তার লাভ হচ্ছে কি না তা বুঝতে হলে সামাজিক নিরপেক্ষ রেখা বিবেচনা করতে হবে। যদি বাণিজ্য—পরবর্তী অবস্থায় দেশটির অবস্থান উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় হয় তাহলে দেশটি লাভবান হবে বলা যাবে। উপরের আলোচনা B দেশটির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সুবিধা ব্যয়ের ধারণাটি ব্যবহার করে রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্বের সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হলাম। দেখা গেল যে মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে পরিহার করেও দেখান যায় যে যে দেশের যে দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা আছে সেই দেশ সেই দ্রব্যের উৎপাদনে সমস্ত উপাদান নিয়োজিত করে বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে লাভবান হতে পারে।

১.৫ ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের সংযোজন

ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে কিছু কিছু সংযোজন ঘটেছে। আমরা তিনটি বিষয়ের সংযোজন নিয়ে আলোচনা করব। ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে উৎপাদন ব্যয় স্থির—উৎপাদন যে পরিমাণই হোক না কেন এক একক দ্রব্য উৎপাদন করতে ব্যয় একই হবে। বাস্তবে পরিবর্তনীয় ব্যয়ের চিত্রই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। স্থির ব্যয়ের পরিবর্তে পরিবর্তনীয় ব্যয় বিবেচনা করে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের আলোচনা করে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের সংযোজন দেখান যায়। ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে দুটি দেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দুটির বেশি দেশ নিয়ে আলোচনা করে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের সংযোজন দেখাতে পারি। সবশেষে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে দুটি দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দুটির বেশি দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করে আমরা ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের সংযোজন দেখাতে পারি। ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব বলতে অবশ্য আমরা তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্বকে বোঝাচ্ছি।

১.৫.১ পরিবর্তনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব

বাস্তবক্ষেত্রে স্থির ব্যয় অপেক্ষা পরিবর্তনীয় ব্যয়ের চিত্র বেশি দেখতে পাওয়া যায়। পরিবর্তনীয় ব্যয় বলতে আমরা ক্রমবর্ধমান ব্যয়কে বোঝাচ্ছি। স্থির ব্যয়ের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে উৎপাদনের উপকরণগুলি সব

দ্রব্যের উৎপাদনে সমান দক্ষ। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের উপকরণগুলির মধ্যে একেকটা এক একটি দ্রব্য উৎপাদনে বেশি দক্ষ। কাজেই যখন X দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে Y দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ান হবে তখন ক্রমে ক্রমে যে উপকরণগুলি Y দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োগ করা হবে সেগুলি X দ্রব্যের উৎপাদনে বেশি দক্ষ। অতিরিক্ত Y দ্রব্যের উৎপাদন করতে ক্রমশ বেশি করে X দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হবে অর্থাৎ Y দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয় হবে ক্রমবর্ধমান। ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা মূল বিন্দুর দিকে অবতল হবে। নিচের চিত্রে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ক্ষেত্রে A এবং B দুটি দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা দেখান হল।

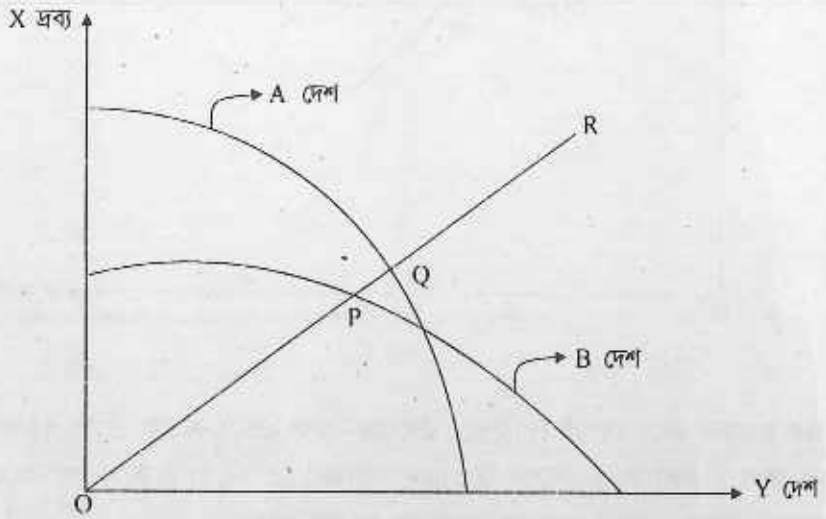

চিত্র ঃ ১(খ) ২

A দেশের X দ্রব্য উৎপাদনে এবং B দেশের Y দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা আছে। তুলনামূলক সুবিধার বিষয়টি বোঝানোর জন্য মূল বিন্দু থেকে একটি সরলরেখা অঙ্কন করলাম যেটি দুটি দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখাকে P এবং Q এই দুটি বিন্দুতে ছেদ করল। এই দুটি বিন্দুতে দুটি দেশে দুটি দ্রব্য একই অনুপাতে উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার কোন একটি বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল Y দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় এবং X দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত অর্থাৎ $^{C}y/C_{x}$ নির্দেশ করে। উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে P বিন্দুতে B দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার ঢাল, Q বিন্দুতে A দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢালের থেকে কম। অর্থাৎ A দেশে $^{C}y/C_{x}$ B দেশের $^{C}y/C_{x}$ থেকে বেশি এবং এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে A দেশে X দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা আছে এবং B দেশের Y দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা আছে।

ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখাই দাম রেখা নয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল বিভিন্ন হওয়ার দুটি দ্রব্যের ব্যয়ের অনুপাত বিভিন্ন হবে এবং দাম উৎপাদন

ব্যয়ের প্রতিফলন বলে ধরে নিলে দামের অনুপাতও বিভিন্ন হবে। নিচের চিত্রে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ক্ষেত্রে A দেশের বাণিজ্য-পূর্ববর্তী এবং বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থা দেখান হল।

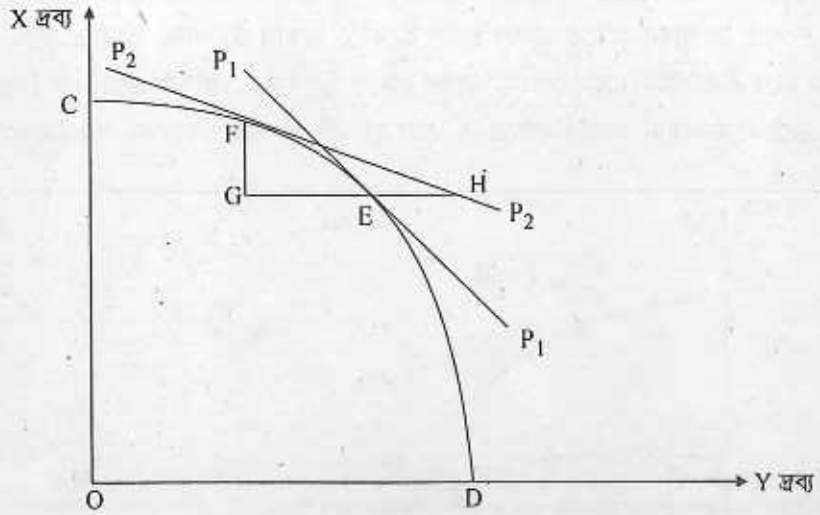

চিত্র ঃ

বাণিজ্য শুরু হওয়ার আগে দেশটি E বিন্দুতে উৎপাদন এবং ভোগ করবে। P_1P_1 রেখা অভ্যন্তরীণ দাম রেখা। এই দাম রেখা E বিন্দুতে A দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা CD-র সঙ্গে স্পর্শক হয়েছে এবং এই কারণে E বিন্দুতে বাণিজ্য-পূর্ববর্তী অবস্থায় ভারসাম্য স্থাপিত হবে।

এবার ধরা যাক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার P_2P_2 রেখার ঢাল দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে P_2P_2 রেখার ঢাল P_1P_1 রেখার ঢালের থেকে কম; অর্থাৎ আন্তর্জাতিক $^{P}y/P_x$ অভ্যন্তরীণ $^{P}y/P_x$ এর থেকে কম। A দেশটি এই পরিস্থিতিতে X দ্রব্যের উৎপাদনে মনোনিবেশ করবে কারণ এই দেশে দ্রব্যের দাম তথা উৎপাদন-ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ক্ষেত্রে X দ্রব্যের উৎপাদনে A দেশটি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবে না কারণ অতিরিক্ত উৎপাদনের সঙ্গে উৎপাদনব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে বলে সম্পূর্ণভাবে বিশেষায়ন ঘটার আগেই দুটি দেশের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত তথা দামের অনুপাত সমান হয়ে যাবে। আমাদের চিত্রে বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় A দেশ উৎপাদন করছে F বিন্দুতে। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী A দেশ যে দ্রব্যের উৎপাদনে তার তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা আছে সেই দ্রব্যের উৎপাদনে মনোনিবেশ করছে। এবার এই দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারে FG পরিমাণ X অন্য দেশটিকে দিয়ে তার কাছ থেকে GH পরিমাণ Y নিয়ে আন্তর্জাতিক দাম রেখা P_2P_2-র উপর H বিন্দুতে যাবে এবং এই H বিন্দুতে সে বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থান করবে। দেখা যাচ্ছে যে H বিন্দুতে E বিন্দুর তুলনায় দেশটি দুটি দ্রব্যই বেশি পাচ্ছে, অতএব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে দেশটি লাভবান হচ্ছে। কিন্তু এমন হতে পারে যে বাণিজ্য পরবর্তী অবস্থায় দেশটি একটি দ্রব্য বেশি এবং অন্যটি কম পেতে পারে। এতে তার

লাভ হবে কি না বুঝতে হলে নিরপেক্ষ মানচিত্র বিবেচনা করতে হবে। যদি বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় দেশটি উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থান করে তাহলে দেশটির অবশ্যই লাভ হবে।

১.৫.২ দুই এর অধিক দেশের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব

আমরা দুটি দেশ এবং দুটি দ্রব্য নিয়ে রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব আলোচনা করেছি। এখন আমরা দুটি দ্রব্য কিন্তু দুই এর অধিক দেশ নিয়ে আলোচনা করব। ধরা যাক গম এবং কাপড় এই দুটি দ্রব্য আছে এবং A, B, C, D ও E এই পাঁচটি দেশ আছে। নিচের সারণীতে গম এবং কাপড়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দামের অনুপাতের ক্রম অনুসারে পাঁচটি দেশকে সাজানো হয়েছে। সর্বাপেক্ষা কম $^{P}w/P_c$ যে দেশের তাকে প্রথম ধরে দেশগুলিকে সাজানো হয়েছে। বাণিজ্য হলে ভারসাম্য $^{P}w/P_c$ 1 এবং 5 এর মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ $1 < {}^{P}w/P_c < 5$ হবে।

সারণী ৬৬.১

অভ্যন্তরীণ $^{P}w/P_c$ অনুযায়ী দেশগুলির ক্রম

দেশ	A	B	C	D	E
$^{P}w/P_c$	1	2	3	4	5

যদি বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় ভারসাম্য $^{P}w/Pc = 3$ হয়, A এবং B এই দুটি দেশ D এবং E এই দুটি দেশে গম রপ্তানি করবে এবং পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে কাপড় আমদানি করবে। C দেশটি এই ভারসাম্য $^{P}w/Pc$ তে বাণিজ্য করবে না কারণ এই দেশের অভ্যন্তরীণ $^{P}w/Pc$ বাণিজ্য-পরবর্তী আন্তর্জাতিক ভারসাম্য দামের অনুপাতের সমান। আবার যদি বাণিজ্য-পরবর্তী ভারসাম্য $^{P}w/Pc = 4$ হয়, তাহলে A, B এবং C এই তিনটি দেশ E দেশে গম রপ্তানি করবে এবং পরিবর্তে E দেশ থেকে কাপড় আমদানি করবে। D দেশটি এক্ষেত্রে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করবে না কারণ তার অভ্যন্তরীণ $^{P}w/Pc$ আন্তর্জাতিক বাজারে ভারসাম্য $^{P}w/P_c$-র সমান। ঠিক একইরকম ভাবে যদি বাণিজ্য-পরবর্তী ভারসাম্য $^{P}w/P_c = 2$ হয় তাহলে A দেশ ব্যতীত আর সব দেশে গম রপ্তানি করবে এবং সেই সব দেশ থেকে কাপড় আমদানি করবে।

এই আলোচনা যে কোন সংখ্যক দেশ নিয়েই করা যেতে পারে। তবে একই সঙ্গে অনেক দেশ এবং অনেক দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করলে আলোচনা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়বে এবং এই জটিলতার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের পক্ষে এটাই কেবলমাত্র জানা প্রয়োজন যে দুটি দেশ এবং দুটি দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম সেই সিদ্ধান্তেই আমরা অনেক দেশ এবং অনেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে পৌঁছতে পারি কি না। আমরা দেখলাম যে অনেক দেশ এবং দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেও আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি অর্থাৎ আমরা দেখাতে পারছি যে একটি দেশ সেইসব দ্রব্য রপ্তানি করবে যেসব দ্রব্যের উৎপাদনে তার তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে।

১.৫.৩ দুই এর অধিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব

ধরা যাক আমেরিকা এবং ব্রিটেন দুটি দেশ আছে এবং A, B, C, D এবং E পাঁচটি দ্রব্য আছে। নিচের সারণীতে আমরা আমেরিকা এবং ব্রিটেনে এই পাঁচটি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বা দাম তাদের নিজ নিজ মুদ্রার অঙ্কে দেখালাম। এখানে মনে রাখতে হবে যে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত, কাজেই উৎপাদন ব্যয় এবং দাম একই, একথা বলা যেতে পারে।

সারণী ৬৬.২
আমেরিকা এবং ব্রিটেনে দ্রব্যের দাম

দ্রব্য	আমেরিকায় দাম (ডলারে)	ব্রিটেনে দাম (ডলারে)
A	2	6
B	4	4
C	6	3
D	8	2
E	10	1

এখন কোন্ দেশ কি দ্রব্য রপ্তানি করবে এবং কি দ্রব্য আমদানি করবে তা নির্ধারণ করতে হলে প্রথমেই আমাদের সমস্ত দ্রব্যের দামকে দুটি দেশে একই মুদ্রার অঙ্কে প্রকাশ করতে হবে। দুটি দেশের দাম তুলনা করতে হলে এটি প্রয়োজন। এখন ধরা যাক ডলার এবং পাউন্ডের মধ্যে বিনিময় হার £1 = $2, এই বিনিময় হারে ব্রিটেনে দ্রব্যগুলির ডলার দাম কি হবে নিচের সারণীতে দেখান হল ঃ

সারণী ৬৬.৩
ব্রিটেনে দ্রব্যসমূহের ডলার দাম, যখন £1 = $2

দেশ	A	B	C	D	E
ব্রিটেনে ডলার দাম	12	8	6	4	2

উপরিউক্ত বিনিময় হারে আমেরিকায় A এবং B দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় তথা দাম কম, C দ্রব্যের দাম দুটি দেশেই সমান এবং D ও E দ্রব্যের দাম ব্রিটেনে কম। অতএব আমেরিকা A এবং B দ্রব্য ব্রিটেনে রপ্তানি করবে এবং ব্রিটেন থেকে আমদানি করবে D এবং E দ্রব্য। C দ্রব্য কোন দেশই আমদানি অথবা রপ্তানি করবে না অর্থাৎ C দ্রব্যে বাণিজ্য হবে না।

আবার ডলার এবং পাউন্ডের মধ্যে বিনিময় হার যদি £1 = $3 হয় তাহলে ব্রিটেনে দ্রব্যগুলির ডলার দাম হবে নিম্নরূপ ঃ

সারণী ৬৬.৪
ব্রিটেনে দ্রব্যসমূহের ডলার দাম, যখন £1 = $3

দ্রব্য	A	B	C	D	E
ব্রিটেনে ডলার দাম	18	12	9	6	3

এই উচ্চতর বিনিময় হারে A, B এবং C দ্রব্যের দাম আমেরিকায় কম এবং D ও E দ্রব্যের দাম ব্রিটেনে কম। অতএব এক্ষেত্রে আমেরিকা A, B এবং C ব্রিটেনে রপ্তানি করবে এবং D ও E ব্রিটেন থেকে আমদানি করবে। লক্ষ্য করতে হবে যে £1 = $2 এই বিনিময় হারে C দ্রব্যে কোন বাণিজ্য হয়নি, কিন্তু £1 = $3 এই বিনিময় হারে কিন্তু C দ্রব্যে বাণিজ্য হচ্ছে।

এইভাবে বিভিন্ন বিনিময় হারে আমরা ব্রিটেনে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের দাম ডলারে প্রকাশ করতে পারি এবং তারপর দুটি দেশে দ্রব্যসমূহের দাম তুলনা করে বলতে পারি কোন্ দেশের কোন্ কোন্ দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা আছে।

এখন ডলার এবং পাউন্ডের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিনিময় হার নির্ধারিত হবে সেই স্তরে যেখানে আমেরিকার রপ্তানির মূল্য ব্রিটেনের আমদানির মূল্যের সমান হবে। এই ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারিত হয়ে গেলে আমরা যথার্থভাবে বলতে পারব ঠিক কোন্ কোন্ দ্রব্য আমেরিকা রপ্তানি করবে এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য সে আমদানি করবে। এই নির্ধারিত বিনিময় হারে যে দ্রব্যগুলি আমেরিকাকে রপ্তানি করতে দেখা যাবে বুঝতে হবে যে সেই দ্রব্যগুলিতেই তার তুলনামূলক সুবিধা আছে।

১.৬ সারাংশ

একটি দেশে সব পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন করা লাভজনক নয়, এক দেশের মুদ্রা অন্যত্র গ্রহণযোগ্যও নয়। এখান থেকেই যাত্রা শুরু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের। লাভজনক বলেই যে কোনও দুটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নেয়। কারণ, কোন একটি দেশে একটি দ্রব্যের উৎপাদন খরচ অপর দেশের তুলনায় সাধারণত কম বা বেশি হয়ে থাকে। এই লাভ সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে কি ভাবে বণ্টিত হয়, সেটাই বাণিজ্য তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়। দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হারের ভিত্তিতেই শুরু হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে বোঝায়, আমদানি ও রপ্তানি। তা আবার দুটি ভাগে বিভক্ত—বিশুদ্ধ ও আর্থিক। বিশুদ্ধ তত্ত্বে অর্থের ভূমিকা নিরপেক্ষ। বিশুদ্ধ তত্ত্বের দুটি ভাগ—বাস্তব তত্ত্ব এবং কল্যাণমূলক

তত্ত্ব। প্রথমটিতে বাস্তবে কী ঘটে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয়টিতে বাণিজ্যকারী দেশগুলির কল্যাণের জন্য কী করণীয়, সেটাই আলোচিত হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের মূল বিচার্য বিষয় হল ঃ এই বাণিজ্য কখন ঘটবে, আমদানি-রপ্তানির প্রকৃতি নির্ণয়, বাণিজ্যের লাভ, তার বণ্টন, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য কীভাবে আসে এবং মুদ্রা বাজারে কীভাবে কাজ করে।

তবে অবাধ বাণিজ্যই যে সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষে এবং পরিণামে সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে লাভজনক, সেটাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো। তাঁদের এই ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল পথনির্দেশ।

দুটি দেশ, দুটি দ্রব্য এবং একটি উপাদান শ্রমকে নিয়ে অ্যাডাম স্মিথ প্রতিষ্ঠা করেছেন পূর্ণ ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব। তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষায়নের সাহায্যে দেখিয়েছেন, এতে লাভ হবে দুটি দেশের, বাড়বে পৃথিবীর মোট উৎপাদন। তবে এই সরল তত্ত্বটি বিশ্ব বাণিজ্যের মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ বিশ্লেষণ করতে পারে। কারণ, পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা সব দেশের থাকে না।

যদি একটি দেশ দুটি দ্রব্য উৎপাদনেই তুলনায় বেশি দক্ষ হয়, তাহলে তাদের বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি জানা যাবে ডেভিড রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব থেকে।

দুটি দেশ, দুটি দ্রব্য, স্থির উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদনের একমাত্র উপাদান শ্রমকে ধরে রিকার্ডো দেখিয়েছেন বাণিজ্য পরবর্তী পর্যায়ে দুটি দেশেরই ভোগ বাড়বে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধরন এখানে নির্ধারিত হবে শ্রমের উৎপাদনশীলতার পার্থক্য দিয়ে। তবে এই তত্ত্বে চাহিদার কোন প্রতিফলন নেই বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু দুশো বছর পরে আজও এই তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য।

রিকার্ডোর তত্ত্বের মূল অনুমানগুলি শিথিল করেও আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লাভজনক হবে। যেমন, পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশেষায়ন হবে না। দুটির অধিক দেশ বা পণ্য থাকলে সব দেশ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করবে না।

১.৭ অনুশীলনী

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের লক্ষ্য আলোচনা করুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কি বোঝায়?

(খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বকে কি কি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?

(গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের বিচার্য বিষয়গুলি কি কি?

(ঘ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে অ্যাডাম স্মিথের চরম ব্যয় পার্থক্যের নীতিটি ব্যাখ্যা করুন।

৪। একটি দেশ যদি উভয় দ্রব্যই অপর দেশ অপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন করতে পারে, তাহলে কি দেশ দুটির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হবে? রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব অনুসরণ করে আলোচনা করুন।

৫। সুবিধাব্যয় বলতে কি বোঝায়? সুবিধাব্যয়ের ধারণার সাহায্যে রিকার্ডোর তত্ত্বকে কিভাবে পুনঃস্থাপিত করা যায় দেখান।

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) রিকার্ডোর তত্ত্বের ত্রুটিগুলি কি কি?

(খ) ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা কেমন হবে এবং কেন হবে?

(গ) দুই-এর অধিক দেশের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব কিভাবে প্রযোজ্য?

(ঘ) দুই এর অধিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব কিভাবে প্রযোজ্য?

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Salvatore : International Economics, Prentice Hall

(২) Chacholiades : International Economics, MC Graw—Hill International Editions.

(৩) Chacholiades : International Trade—Theory and Policy, International Student Edition.

(৪) Caves and Jones : World Trade and Payments—An Introduction, Addison—Wedey.

(৫) Sodersten and Reed : International Economics, Macmillan.

একক ২ ☐ হেক্‌শ্চার-ওলীন-স্যামুয়েলসন তত্ত্ব

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ হেক্‌শ্চার-ওলীন-স্যামুয়েলসন বাণিজ্য-তত্ত্ব

২.২.১ তত্ত্বের অনুমানসমূহ

২.২.২ উৎপাদনের উপকরণের আধিক্যের বিবিধ সংজ্ঞা

২.২.৩ উৎপাদনের উপকরণের আধিক্যের দাম ভিত্তিক সংজ্ঞার সাহায্যে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বের প্রমাণ

২.২.৪ উৎপাদনের উপকরণের আধিক্যের পরিমাণ-ভিত্তিক সংজ্ঞার সাহায্যে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বের প্রমাণ।

২.৩ উৎপাদনের উপকরণের দামের সমতা তত্ত্ব

২.৪ রিকার্ডোর তত্ত্ব এবং হেক্‌শ্চার-ওলীন স্যামুয়েলসন তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা

২.৫ সারাংশ

২.৬ অনুশীলনী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে ঃ

- বিভিন্ন দেশের মধ্যে দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাতে পার্থক্য কেন হয়।
- তুলনামূলক সুবিধার প্রকৃতি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলি সচল না হলেও তাদের দামের সমতা কিভাবে আসতে পারে।

২.২ প্রস্তাবনা

দুটি দেশের মধ্যে দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাতে বিভিন্নতার জন্য তুলনামূলক সুবিধার ধরন দুটি দেশে দুই প্রকার হয়ে থাকে এবং এর ফলে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘটে। কিন্তু এই দামের অনুপাতে বিভিন্নতা কেন ঘটে? অথবা তুলনামূলক সুবিধার ধরন কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, মিল এই ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদগণ এইসব প্রশ্নের উত্তর দেননি। এঁরা শ্রমকেই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমের উৎপাদনশীলতার মধ্যে পার্থক্যের ফলেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা থাকতে দেখা যায়। কিন্তু ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদগণ শ্রমের উৎপাদনশীলতার পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করেননি। আবহাওয়ার পার্থক্যের জন্য হলেও হতে পারে এরকম একটা ধারণা তাঁরা পোষণ করতেন। হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব সক্রিয়ভাবে তুলনামূলক সুবিধার ধরনের বিভিন্নতা ব্যাখ্যা করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণের বিভিন্নতা তুলনামূলক সুবিধার ধরন ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বের একটি অনুসিদ্ধান্ত আছে। এই অনুসিদ্ধান্তটি হেক্‌শ্চার এবং ওলীন দুজনের ভাবনায় থাকলেও অধ্যাপক স্যামুয়েলসনই এই অনুসিদ্ধান্তটির মূল প্রবক্তা এবং এই কারণেই আমরা স্যামুয়েলসনের নামকে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে থাকি। এই অনুসিদ্ধান্তটির বক্তব্য হল বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলি সচল না হলেও অবাধ বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপকরণগুলির দামে সমতা আসবে। অবাধ বাণিজ্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপকরণগুলির সচলতার পরিবর্ত হিসেবে কাজ করে।

আমরা প্রথমে হেকশ্চার-ওলীন তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্তটি এবং পরে এই তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করব। অর্থাৎ প্রথমে আমরা হেকশ্চার-ওলীন তত্ত্ব অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব একটি দেশের একটি বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদনে কেন তুলনামূলক সুবিধা থাকতে দেখা যায়। পরে আমরা মূলত স্যামুয়েলসনের আলোচনা অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলির দামে সমতা কিভাবে আসতে পারে তা দেখাব।

২.২ হেকশ্চার-ওলীন স্যামুয়েলসন বাণিজ্য তত্ত্ব

১৯১৯ সালে সুইডিশ অর্থনীতিবিদ এলি হেক্‌শ্চার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যে প্রবন্ধটিতে লেখক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে আধুনিক মতবাদের সূত্রপাত ঘটে তাঁর লেখায়। কিন্তু এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর দশ বছর পর্যন্ত অলক্ষিত থেকে যায়। ১৯৩৩ সালে এলি হেক্‌শ্চারের ছাত্র অপর একজন সুইডিশ অর্থনীতিবিদ বার্টিল ওলীন হেকশ্চারের চিন্তাধারা অনুসরণ করে একটি যথাযথ তত্ত্ব গড়ে তোলেন। এই তত্ত্বই হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব নামে পরিচিত।

১৯৪৮ সালে পল স্যামুয়েলসন হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসেন ও এমন একটি অনুসিদ্ধান্ত প্রমাণ করে দেখাবার চেষ্টা করেন যে যদি হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব কার্যকরী হয় তাহলে অবাধ বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন উপকরণের দামে সমতা আসবে। হেক্‌শ্চার, ওলীন এবং স্যামুয়েলসনের অবদানে গঠিত মূল তত্ত্ব এবং তার অনুসিদ্ধান্তসহ সম্পূর্ণ তত্ত্বটিকে হেক্‌শ্চার-ওলীন-স্যামুয়েলসন তত্ত্ব বলা হয়। মূল তত্ত্বটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা অবশ্য তত্ত্বটিকে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব নামে উল্লেখ করব।

২.২.১ হেকশ্চার-ওলীন তত্ত্বের অনুমানসমূহ

হেকশ্চার-ওলীন তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো একটি দেশ সেই দ্রব্য রপ্তানি করবে যে দ্রব্যের উৎপাদনে সেই দেশে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে যে উৎপাদনের উপকরণটি পাওয়া যায় সেই উপকরণটি তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যদি A দেশে শ্রম তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। একইরকমভাবে A দেশ আমদানি করবে সেই দ্রব্য যে দ্রব্যের উৎপাদনে এই দেশে তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণে পাওয়া যায় এমন উপকরণ তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই হেক্‌শ্চার ওলীন তত্ত্ব কতকগুলি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। এই অনুমানগুলি হলো ঃ

(ক) দুটি দেশ প্রত্যেকে দুটি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং দুটি দ্রব্যের উৎপাদনেই দুটি উপকরণ ব্যবহৃত হয়।

(খ) দুটি দেশেরই দ্রব্য এবং উৎপাদনের উপকরণের বাজারে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বর্তমান।

(গ) বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে উৎপাদন অপেক্ষক বিভিন্ন। কিন্তু একই দ্রব্যের উৎপাদনে দুটি দেশে উৎপাদন অপেক্ষক অভিন্ন। দুটি দেশ কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনে একই কারিগরি জ্ঞান ব্যবহৃত করে। দুটি দেশই পৃথিবীর সর্বাধিক উন্নত কৃৎ-কৌশল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

(ঘ) দুটি দেশে দুটি দ্রব্যের উৎপাদনেই সমাহার প্রতিদানের নিয়ম কাজ করে।

(ঙ) উৎপাদন অপেক্ষকগুলি এমন যে, উৎপাদনের উপকরণের ব্যবহারের নিবিড়তা অনুসারে দুটি দ্রব্যকে পৃথক করা যায়। বলা যায় যে, উপকরণগুলির দামের সমস্ত অনুপাতে একটি দ্রব্য সবসময়েই মূলধন বেশি নিবিড়ভাবে ব্যবহার করছে এবং অন্য দ্রব্যটি বেশি নিবিড়ভাবে ব্যবহার করছে শ্রম। অর্থাৎ একটি দ্রব্য সবসময়েই মূলধন-নিবিড় এবং অন্যটি শ্রম-নিবিড়। এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এই উপকরণ-নিবিড়ভাবে প্রকৃতি বিপরীতমুখী হবে না।

(চ) কোন পরিবহন ব্যয় নেই এবং বাণিজ্যের উপর কোনপ্রকার বিধিনিষেধ নেই।

(ছ) প্রতিটি দেশের ভিতর উৎপাদনের উপকরণগুলি সম্পূর্ণ সচল কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে সচল নয়।

(জ) রুচি-পছন্দ দুটি দেশে একই প্রকার।

(ঝ) দুটি দেশের উৎপাদনেই বিশেষায়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নয়।

উপরিলিখিত অনুমানগুলির ভিত্তিতে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব বলে যে মূলধনের প্রাচুর্য আছে যে দেশে সেই দেশ মূলধন-নিবিড় দ্রব্য রপ্তানি করবে এবং আমদানি করবে শ্রম-নিবিড় দ্রব্য। এই তত্ত্ব অনুসারে বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় উপকরণগুলির আপেক্ষিক প্রাচুর্যতা দিয়ে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপাদানের প্রাচুর্যের পার্থক্যের ভিত্তিতেই তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা গড়ে ওঠে।

২.২.২ উৎপাদনের উপকরণের আধিক্যের বিবিধ সংজ্ঞা

উৎপাদনের উপকরণের আধিক্যের প্রধানত দুটি সংজ্ঞা হেকশ্চার-ওলীন তত্ত্বে পাওয়া যায়। একটি দাম ভিত্তিক সংজ্ঞা এবং অন্যটি পরিমাণ-ভিত্তিক সংজ্ঞা। এছাড়া অর্থনীতিবিদ ল্যানকাস্টার প্রদত্ত তৃতীয় একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়, কিন্তু এই সংজ্ঞাটি হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বকে একটি ধ্রুব সত্যতে পরিণত করে বলে ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এখন দামভিত্তিক সংজ্ঞা এবং পরিমাণ-ভিত্তিক সংজ্ঞা এই দুটি সংজ্ঞা অনুসারে উপকরণের আধিক্য বলতে কি বোঝায় দেখব।

দাম ভিত্তিক সংজ্ঞা—এই সংজ্ঞা অনুসারে A দেশ মূলধন-প্রগাঢ় হবে B দেশের তুলনায় যদি A দেশে মূলধনের দাম আপেক্ষিকভাবে কম হয়। অর্থাৎ যদি,

$$\left(\frac{P_k}{P_L}\right)_A < \left(\frac{P_k}{P_L}\right)_B \text{ হয়,}$$

তাহলে A দেশ মূলধন-প্রগাঢ় হবে। এখানে P_k হল মূলধনের দাম এবং P_L হল শ্রমের দাম।

পরিমাণ-ভিত্তিক সংজ্ঞা—এই সংজ্ঞায় দুটি দেশে মূলধন এবং শ্রমের পরিমাণ বাস্তবে যা পাওয়া যায় তার তুলনা করা হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে A দেশ মূলধন—প্রগাঢ় হবে B দেশের তুলনায় যদি মূলধনের মোট পরিমাণ এবং শ্রমের মোট পরিমাণের অনুপাত A দেশে B দেশ অপেক্ষা বেশি হয়। অর্থাৎ যদি,

$$\left(\frac{K}{L}\right)_A > \left(\frac{K}{L}\right)_B \text{ হয়, তাহলে}$$

A দেশ মূলধন প্রগাঢ় হবে। এখানে K হল মূলধনের মোট পরিমাণ এবং l. হল শ্রমের মোট পরিমাণ।

উৎপাদন উপাদানের আধিক্যের এই দুটি বিকল্প সংজ্ঞা কিন্তু সমার্থক নয়। দাম-ভিত্তিক সংজ্ঞা চাহিদা এবং যোগান এই দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু পরিমাণ-ভিত্তিক সংজ্ঞা কেবলমাত্র যোগানের ওপর নির্ভরশীল। চাহিদার প্রভাব যদি শক্তিশালী হয় তাহলে এমন হতে পারে যে দুটি সংজ্ঞা অনুসারে দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ দুরকমের হচ্ছে। ধরা যাক A দেশ পরিমাণভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে মূলধন-প্রগাঢ়। এবার ধরা যাক A দেশের ভোগকারীদের মূলধন নিবিড় দ্রব্যের জন্য চাহিদা খুব শক্তিশালী। এই পরিস্থিতিতে A দেশে মূলধনের দাম আপেক্ষিকভাবে বেশি হতে পারে যার ফলে দাম-ভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে A দেশ শ্রম-প্রগাঢ়

হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ পরিমাণ-ভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে A দেশ মূলধন-প্রগাঢ় আর দাম-ভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে A দেশ শ্রম-প্রগাঢ় এমন হওয়াটা অসম্ভব নয়। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে উৎপাদনের উপাদানের জন্য চাহিদা সেই উপাদান সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের জন্য চাহিদা থেকে উদ্ভূত হয়।

হেক্‌শ্চার এবং ওলীন দাম-ভিত্তিক সংজ্ঞা ব্যবহার করেছিলেন। অধ্যাপক লিওনটিয়েফ পরিমাণ-ভিত্তিক সংজ্ঞা ব্যবহার করে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব আলোচনা করেন।

২.২.৩ উৎপাদনের উপকরণের আধিক্যের দাম-ভিত্তিক সংজ্ঞার সাহায্যে হেকশ্চার-ওলীন তত্ত্বের প্রমাণ

ধরা যাক A এবং B দুটি দেশে X এবং Y দুটি দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং এই দুটি দ্রব্যের উৎপাদনে শ্রম এবং মূলধন এই দুটি উপাদানই ব্যবহৃত হয়। তবে X দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে বেশি শ্রম ব্যবহৃত হয়। দুটি দ্রব্যের দাম ধরা যাক P_x এবং P_y এবং দুটি উপাদানের দাম w এবং r এখানে মনে রাখতে হবে যে কোন উপাদানের দাম বলতে সেই উপাদানের ব্যবহারগত দাম বোঝায়। অর্থাৎ সেই উপাদান থেকে যে সেবা পাওয়া যায় তার দাম বোঝায়। w হল শ্রমের দাম এবং r হল মূলধনের দাম। এখন আমরা জানি যে যদি

$\left(\frac{w}{r}\right)_A < \left(\frac{w}{r}\right)_B$ হয় তাহলে উৎপাদনের উপাদানের আধিক্যের দামভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে A দেশ হবে শ্রম-প্রগাঢ় এবং B দেশ হবে মূলধন-প্রগাঢ়। এবার যদি হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বের সব অনুমানগুলি বজায় থাকে, বিশেষত উপাদান-নিবিড়তার ভিত্তিতে যদি দুটি দ্রব্য সবসময়ে একইভাবে বর্ণনা করা যায় তাহলে P_x/P_y এবং w/r এই দুটি অনুপাতের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে দেখান যায়। নিচের চিত্রে এই সম্পর্কটি দেখান হল।

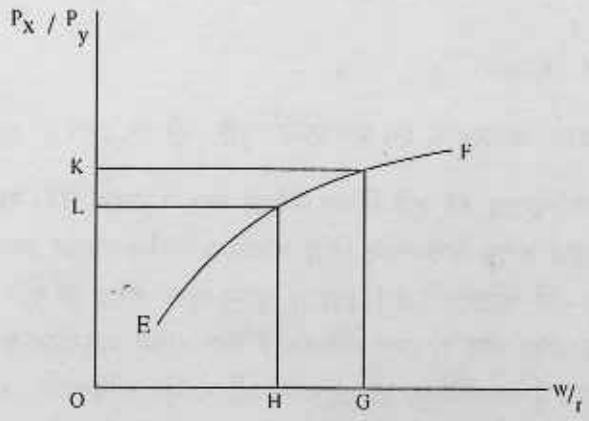

চিত্র ঃ ২.১

চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে $^{w}/_{r}$, OG থেকে OH এ কমে গেলে, X-এর আপেক্ষিক দাম অর্থাৎ $^{P}x/Py$, OK থেকে OL এ নেমে যাচ্ছে। অর্থাৎ $^{w}/_{r}$ এবং $^{P}x/Py$ এর মধ্যে সম্পর্কটি একমুখী।

ওপরে বর্ণিত সম্পর্কটি প্রচলিত কারিগরি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এখন যেহেতু দুটি দেশে একই দ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কিত উৎপাদন অপেক্ষক অভিন্ন, সেহেতু দুটি দেশে $^{w}/_{r}$ এবং $^{P}x/Py$ এর মধ্যে সম্পর্কটিও অভিন্ন। ওপরের চিত্রে প্রদর্শিত EF রেখা দুটি দেশের ক্ষেত্রেই $^{w}/_{r}$ এবং $^{P}x/Py$ এর মধ্যে সম্পর্কটি প্রকাশ করছে।

এখন আমরা শুরু করেছি এই বলে যে দাম-ভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে A দেশ শ্রম-প্রগাঢ় এবং B দেশ মূলধন-প্রগাঢ়, অর্থাৎ

$$\left(\frac{w}{r}\right)_A < \left(\frac{w}{r}\right)_B$$

নিচের চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে A দেশের অবস্থান দেখান হয়েছে OS এ এবং B দেশের OT তে।

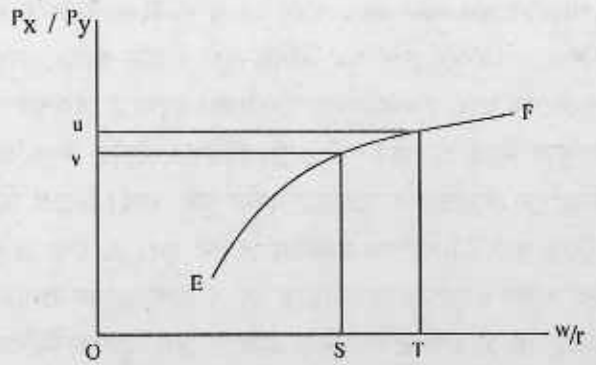

চিত্র ঃ ২.২

অনুভূমিক অক্ষে অবস্থান জানা আছে বলে EF রেখা থেকে এবার উল্লম্ব অক্ষে দুই দেশের অবস্থান নিরূপণ করা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে উল্লম্ব অক্ষে A দেশের অবস্থান OV তে আর B দেশের অবস্থান Ou তে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে,

$$\left(\frac{P_x}{P_y}\right)_A < \left(\frac{P_x}{P_y}\right)_B$$

অর্থাৎ শ্রম-প্রগাঢ় A দেশে শ্রম-নিবিড় X দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম কম, অতএব A দেশের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে X দ্রব্যের উৎপাদনে। A দেশ X দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং রপ্তানি করবে এবং B দেশ Y

দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং রপ্তানি করবে। হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব অনুযায়ী যে দেশে যে দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক ভাবে বেশি পরিমাণে সেই উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে যে উপাদানের সেই দেশে প্রাচুর্যতা আছে, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন এবং রপ্তানি করছে। এটা উপাদানের প্রাচুর্যতার দাম-ভিত্তিক সংজ্ঞা ব্যবহার করে আমরা প্রমাণ করলাম।

২.২.৪ উৎপাদনের উপকরণের আধিক্যের পরিমাণ-ভিত্তিক সংজ্ঞার সাহায্যে হেকশ্চার-ওলীন তত্ত্বের প্রমাণ

আমরা জানি যে উৎপাদনের উপকরণের আধিক্যের পরিমাণ-ভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে A দেশ মূলধন প্রগাঢ় এবং B দেশ শ্রম-প্রগাঢ় হবে যদি

$$\left(\frac{K}{L}\right)_A > \left(\frac{K}{L}\right)_B$$

এই সংজ্ঞার সাহায্যে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য চাহিদা সম্পর্কে আরও কিন্তু বাড়তি অনুমানের প্রয়োজন হয়। কোন দেশের উৎপাদনে কোন দ্রব্যের দিকে ঝোঁক থাকলেই যে সেই দেশ সেই দ্রব্য রপ্তানি করবে তা নাও হতে পারে। দেশের লোকের চাহিদা এমন হতে পারে যে সেই দ্রব্যটি দেশের মধ্যে সস্তা নাও থাকতে পারে। তখন এমন হতে পারে যে উপকরণের আধিক্যের পরিমাণ-ভিত্তিক সংজ্ঞার ভিত্তিতে মূলধন প্রগাঢ় দেশ হয়েও কোন দেশ শ্রম-নিবিড় দ্রব্য রপ্তানি করছে, কারণ চাহিদার প্রভাবের ফলে শ্রম-নিবিড় দ্রব্যটিই হয়ত দেশের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সস্তা। এক্ষেত্রে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব কার্যকরী হচ্ছে না। এই কারণে আমাদের ধরে নিতে হবে যে দুটি দেশে চাহিদার প্রকৃতি সদৃশ অর্থাৎ চাহিদার বিষয়টি দুটি দেশে একই সামাজিক নিরপেক্ষ মানচিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়। নিচের চিত্রে দুটি দেশের জন্য দুটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কিন্তু একটি নিরপেক্ষ মানচিত্র দেখান হল। A এবং B দুটি দেশ এবং X এবং Y দুটি দ্রব্য। পরিমাণ ভিত্তিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ধরা হয়েছে যে A দেশ মূলধন-প্রগাঢ় এবং B দেশ শ্রম-প্রগাঢ়। অন্যদিকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে X দ্রব্য শ্রম-নিবিড় এবং Y দ্রব্য মূলধন-নিবিড়।

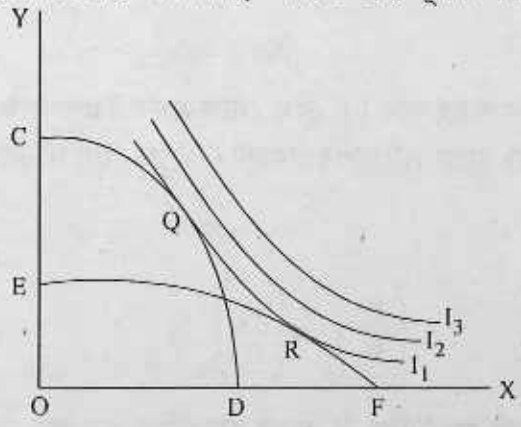

চিত্র ঃ ২.৩

বাণিজ্য শুরু হওয়ার আগে A দেশ Q বিন্দুতে উৎপাদন এবং ভোগ করছে। অন্যদিকে B দেশ R বিন্দুতে উৎপাদন এবং ভোগ করছে। এখন দুটি দ্রব্যের মধ্যে পরিবর্ততার প্রান্তিক হার ক্রমহ্রাসমান বলে R বিন্দুতে I_1 নিরপেক্ষ রেখার ঢাল Q বিন্দুতে রেখাটির ঢালের থেকে কম। Q এবং R বিন্দুতে নিরপেক্ষ রেখা এবং উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাধারণ স্পর্শকের ঢাল যথাক্রমে A এবং B দেশে দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত অর্থাৎ $^{P}x/Py$ নির্দেশ ...। দেখা যাচ্ছে যে বাণিজ্য-পূর্ববর্তী অবস্থায় A দেশের $^{P}x/Py$ B দেশের $^{P}x/Py$ অপেক্ষা বেশি। অর্থাৎ A দেশে X দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম বেশি এবং B দেশে Y দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম বেশি। এই পরিস্থিতিতে A দেশ Y দ্রব্য রপ্তানি করবে এবং B দেশ X দ্রব্য রপ্তানি করবে। দেখা যাচ্ছে যে মূলধন-প্রগাঢ় দেশ A মূলধন-নিবিড় দ্রব্য Y রপ্তানি করছে এবং শ্রম-প্রগাঢ় দেশ B শ্রম-নিবিড় দ্রব্য X রপ্তানি করছে। অর্থাৎ হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব অনুযায়ীই দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হচ্ছে।

দুটি দেশের সদৃশ নিরপেক্ষ মানচিত্রের সাহায্যে অতএব দেখান যায় যে উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব বৈধ।

২.৩ উৎপাদন-উপকরণের দামের সমতা তত্ত্ব

উৎপাদন-উপাদানের দামের সমতা তত্ত্ব হেকশ্চার-ওলীন তত্ত্বের একটি অনুসিদ্ধান্ত। ১৯১৯ সালে হেক্‌শ্চার বলেছিলেন যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন উপাদানের দামে পূর্ণ সমতা স্থাপিত হয়। ১৯৩৩ সালে ওলীন নানা কারণ দেখিয়ে বলেছিলেন যে পূর্ণ সমতা-বাস্তবে স্থাপিত হয় না; অবাধ বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন-উপাদানের দামে সমতা আসার একটা প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন পূর্ণ সমতার ধারণাটিকে সমর্থন করেন এবং তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। আমরা এখানে স্যামুয়েলসনের বক্তব্য অনুসরণ করে দেখাব কিভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন-উপাদানের দামে পূর্ণ সমতা স্থাপিত হয়। এখানে উপাদানের দাম বলতে কোন উপাদান থেকে যে সেবা পাওয়া যায় তার দামকে বোঝান হচ্ছে—উপাদানটি বিক্রয় করে যে দাম পাওয়া যেতে পারে সেই দামকে নয়।

উপাদানের দামের সমতা তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপাদানগুলি সচল না হলেও সেগুলির দাম বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমান হতে পারে। এই সমতা আসতে পারে দ্রব্যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে। অর্থাৎ দ্রব্যে অবাধ বাণিজ্য উপাদান-সচলতার পরিবর্ত হিসেবে দেখা দিতে পারে।

এই তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য দ্রব্যের দামের অনুপাত এবং উপাদানের দামের অনুপাত এই দুই অনুপাতের মধ্যে যে একমুখী সম্পর্ক রয়েছে বলে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সেই সম্পর্কটি ব্যবহার করতে হবে। X এবং Y দুটি দ্রব্য এবং শ্রম এবং মূলধন দুটি উপাদান আছে ধরে নিলে $^{P}x/Py$ এবং $^{w}/r$ এই দুটি অনুপাতের মধ্যে সম্পর্কটি হবে ঃ

$$^{w}/r = f(^{P}x/Py) \; ; \; f' > 0$$

নিচের চিত্রে $^{w}/_{r}$ এবং $^{P}x/Py$ এর মধ্যে এই সম্পর্কটি পুনরায় দেখান হল ঃ

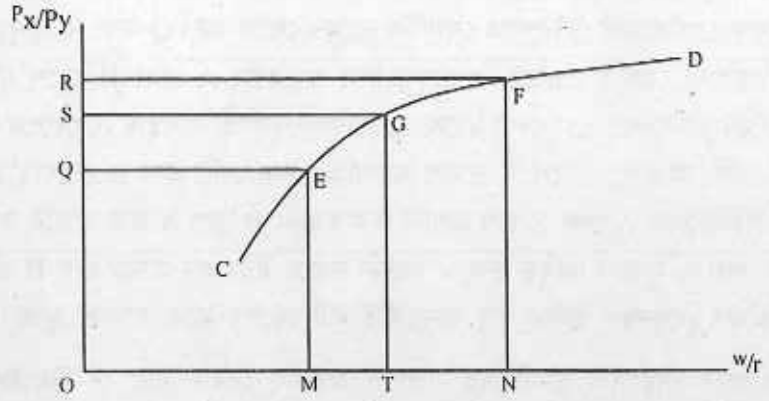

চিত্র ঃ ২.৪

হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বে দুটি দেশের মধ্যে একই দ্রব্যের উৎপাদনে উৎপাদন অপেক্ষক অভিন্ন ধরে নেওয়া হয়েছে বলে $^{w}/_{r}$ এবং $^{P}x/Py$ এর মধ্যে সম্পর্কটি দুটি দেশে একই CD রেখা দ্বারা প্রকাশিত হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে উপাদানের দামের সমতা তত্ত্ব হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বের একটি-অনুসিদ্ধান্ত ; অতএব হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বের অনুমানগুলি এই তত্ত্বেরও অনুমান। এখন দুটি দেশে উৎপাদনের উপাদান একই পরিমাণে পাওয়া যায় এমন নয়। উপাদানের পরিমাণে বিভিন্নতার জন্য CD রেখার উপর দুটি-দেশের অবস্থান বিভিন্ন বিন্দুতে হবে। ধরা যাক A এবং B এই দুটি দেশের মধ্যে A দেশ E বিন্দুতে এবং B দেশ F বিন্দুতে অবস্থান করে। বাণিজ্য-পূর্ববর্তী অবস্থান A দেশে X দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম OQ দ্বারা এবং B দেশে OR দ্বারা সূচিত হচ্ছে। অন্যদিকে উপাদানের দামের অনুপাত $^{w}/_{r}$ A দেশে OM দ্বারা এবং B দেশে ON দ্বারা সূচিত হচ্ছে। A দেশে $^{w}/_{r}$ B দেশের তুলনায় কম হওয়ার অর্থ A দেশে শ্রম B দেশের তুলনায় অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। উপাদানের আধিক্যের দাম ভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে A দেশ শ্রম-প্রগাঢ় এবং B দেশ মূলধন-প্রগাঢ়। আবার দেখা যাচ্ছে A দেশে X দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা আছে।

এবার দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হলে A দেশ X দ্রব্য রপ্তানি করবে এবং B দেশ Y দ্রব্য রপ্তানি করবে। A দেশে X দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম বাড়তে থাকবে এবং B দেশে কমতে থাকবে। এভাবে বাণিজ্য চলতে চলতে দুটি দেশে দ্রব্যের দামের একই অনুপাত দেখা দেবে। ধরা যাক OS হল সেই অনুপাত। এখন দুটি দেশে দ্রব্যের দামের অনুপাত যদি একই হয় তাহলে CD রেখা থেকে দেখা যাবে যে দুটি দেশে উপাদানের দামের অনুপাতও একই হবে। চিত্রে OT হল উপাদানের দামের সেই অনুপাত যেটি বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় দুটি দেশই CD রেখার ওপর G বিন্দুতে অবস্থান করছে এবং উৎপাদনের উপাদানের দামের অনুপাত দুটি দেশেই OT দ্বারা সূচিত হচ্ছে। দ্রব্যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে দুটি দেশে উপাদানের দামের অনুপাত সমান হচ্ছে।

এখন একটা প্রশ্ন হল দুটি দেশের মধ্যে উপাদানের দামের অনুপাত সমান হলে অর্থাৎ $^{w}/_{r}$ সমান হলে কি শ্রমের দাম w এবং মূলধনের দাম r পৃথকভাবে সমান হবে? অর্থাৎ আপেক্ষিক দাম সমান হলে কি চরম দামও সমান হবে? উত্তর হল, হ্যাঁ; অর্থাৎ $^{w}/_{r}$ দুটি দেশের মধ্যে সমান হলে w এবং r পৃথকভাবে সমান হবে। দেখা যাক কিভাবে এটা হতে পারে।

আমরা জানি যে,

$w = MP_l$ এবং

$r = MP_K$ এখানে

MP_L হল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা এবং MP_k হল মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা। এমন সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকলে প্রত্যেকটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মূলধন এবং শ্রম দুটি দ্রব্যের উৎপাদনে যে অনুপাতে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে, কেবলমাত্র শ্রমের পরিমাণ বা কেবলমাত্র মূলধনের পরিমাণের ওপর নয়, অর্থাৎ

$$MP_{l,} = f\left(\frac{K}{L}\right) \text{ এবং } MP_k = g\left(\frac{K}{L}\right)$$

আমরা জানি যে $^{w}/_{r}$ দেওয়া থাকলে সমোৎপাদন রেখা থেকে কোন দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত মূলধন ও শ্রমের অনুপাত জানা যায়। এখানে দুই দেশে একই দ্রব্যের উৎপাদনে উৎপাদন অপেক্ষক অভিন্ন ধরে নেওয়া হয়েছে বলে দুটি দেশে যদি $^{w}/_{r}$ অভিন্ন হয়, তাহলে উৎপাদন অপেক্ষকের জ্যামিতিক রূপ একই সমোৎপাদন রেখা থেকে $^{K}/_{L}$ ও অভিন্ন পাওয়া যাবে। ফলে MP_l এবং MP_k দুটি দেশে এক হবে এবং যেহেতু $w = MP_L$ এবং $r = MP_k$, w এবং r দুটি দেশে এক হবে।

উৎপাদনের উপাদানের দামের সমতা তত্ত্বে দুটি বিশেষ অবস্থা বজায় থাকাটা জরুরী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। (ক) দুটি দেশের উৎপাদনে যে বিশেষায়ন ঘটে তা সম্পূর্ণ বিশেষায়ন নয় এবং (খ) দুটি দেশের উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদান-নিবিড়তা দুটি উপাদানের দামের সব অনুপাতে একই থাকে, উল্টে যায় না। এই দুটি বিশেষ অবস্থা বজায় না থাকলে কি হতে পারে তা আরও বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। আমরা এখানে আর সে আলোচনায় যাব না।

২.৪ রিকার্ডোর তত্ত্ব এবং হেক্‌শ্চার-ওলীন-স্যামুয়েলসন তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা

রিকার্ডোর তত্ত্বে আমরা যে তুলনামূলক সুবিধার ধারণা পাই হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বে সেই তুলনামূলক সুবিধার ধারণাটির ব্যাখ্যা পাই। দুটি তত্ত্বের মধ্যে আপাতভাবে কোন বিরোধ নেই। দুটি তত্ত্বেরই মূল কথা

হল তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলি যদি উৎপাদনে বিশেষায়ন ঘটায় এবং এই বিশেষায়নের ভিত্তিতে বাণিজ্য করে তাহলে বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী সব দেশেরই লাভ হবে। দুটি তত্ত্ব মূলত এক কথা বললেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) রিকার্ডোর তত্ত্ব মূল্যের শ্রমতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত। হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বে কমপক্ষে দুটি উৎপাদনের উপাদান বিবেচনা করা হয়েছে। মূল্যের শ্রমতত্ত্বের যে সীমাবদ্ধতা রিকার্ডোর তত্ত্বের ত্রুটির কারণ, হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বে একের অধিক উপাদানের ব্যবহার এই সীমাবদ্ধতা ঘটতে দেয়নি।

(খ) রিকার্ডোর তত্ত্বে বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভের আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। হেক্‌শ্চার ওলীন তত্ত্বে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা কেন ঘটছে তার আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে।

(গ) রিকার্ডোর তত্ত্বে চাহিদার দিকের আলোচনা করা হয়নি তবে পরোক্ষভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে দুটি দেশেই দুটি দ্রব্যের জন্য চাহিদা আছে; কাজেই দুটি দেশেই বাণিজ্য-পূর্ববর্তী অবস্থায় দুটি দ্রব্য উৎপাদন করা হচ্ছে এবং ভোগ করা হচ্ছে। হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বে চাহিদা সম্পর্কে আর একটু জোরালো অনুমান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে যে দুটি দেশে চাহিদা সমপ্রকৃতির মোটামুটিভাবে একইরকম চাহিদা দুটি দেশে বর্তমান।

(ঘ) রিকার্ডোর তত্ত্বে বাণিজ্যের আগে এবং পরে আয়ের বণ্টন একই প্রকার থাকে কারণ এই তত্ত্বে একটি মাত্র উৎপাদনের উপাদান বিবেচনা করা হয়েছে। বাণিজ্যের ফলে কারুর আয় বাড়ল এবং কারুর আয় কমল এভাবে এক্ষেত্রে বলা যাবে না। হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বে একের অধিক উৎপাদনের উপাদান বিবেচনা করা হয়েছে বলে আয় বণ্টন ব্যবস্থা বাণিজ্য পরবর্তী অবস্থায় একই থাকবে তা হবে না। দুটি তত্ত্বের মধ্যে।

(ঙ) দুটি তত্ত্বের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল এই যে রিকার্ডোর তত্ত্বে উৎপাদন অপেক্ষকে পার্থক্যের ফলে দুটি দেশে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য ঘটে বলে মনে করা হয়; হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বে দুটি দেশের মধ্যে উৎপাদন অপেক্ষকে কোন পার্থক্য নেই বলে অনুমান করে নিয়ে উৎপাদন-উপাদানের পরিমাণের পার্থক্যের ফলে দুটি দেশে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য ঘটে এই দেখান হয়।

২.৫ সারাংশ

তুলনামূলক সুবিধার ধরনে কেন দুটি দেশের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বে। এই তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণের বিভিন্নতাই তুলনামূলক সুবিধার ধরন ব্যাখ্যা করে। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, একটি দেশ সেই দ্রব্যই রপ্তানি করবে, যেটি তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত উপকরণটির অধিক ব্যবহারে তৈরি করা যায়। আমদানির ক্ষেত্রে ঠিক এর

বিপরীতটিই করা হবে। এখানে মূলত অনুমান করে নেওয়া হয়েছে, দুটি দেশ দুটি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং দুটির ক্ষেত্রেই দুটি করে উপকরণ ব্যবহৃত হয়। দুটি দেশেই দ্রব্য ও উপকরণের বাজারে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বর্তমান। একটি দ্রব্য সবসময়েই মূলধন-নিবিড়, অন্যটি শ্রম-নিবিড় এবং উৎপাদনের উপকরণগুলি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সচল নয়। দুটি দেশেই একই দ্রব্য উৎপাদনে উৎপাদন অপেক্ষক অভিন্ন। উপকরণের আধিক্যের একটি দাম ভিত্তিক ও অপর একটি পরিমাণ ভিত্তিক সংজ্ঞা মিলবে হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বে। দুটি দেশ A এবং B হলে, এবং w শ্রমের দাম ও r মূলধনের দাম হলে যদি $\left(\frac{w}{r}\right)_A < \left(\frac{w}{r}\right)_B$ হয়, তাহলে উৎপাদনের উপকরণের দাম ভিত্তিক সংজ্ঞা অনুসারে A হবে শ্রম-প্রগাঢ় দেশ, B মূলধন-প্রগাঢ়। দুটি দ্রব্য X ও Y। এগুলির দাম P_x এবং P_y ধরা হলে এবং X দ্রব্য উৎপাদনে শ্রম তুলনায় বেশি ব্যবহৃত হলে $\left(\frac{w}{r}\right)$ এবং $\left(\frac{P_x}{P_y}\right)$-এর মধ্যে সম্পর্ক হবে একমুখী। হেক্‌শ্চার-ওলীন দেখিয়েছেন $\left(\frac{P_x}{P_y}\right)_A < \left(\frac{P_x}{P_y}\right)_B$ অর্থাৎ শ্রম-প্রগাঢ় A দেশের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে X দ্রব্যের উৎপাদনে। B দেশের জন্য উল্টোটা সত্যি। সেই কারণে A দেশে X উৎপাদন ও রপ্তানি করবে এবং B দেশ Y দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করবে। এখানে দাম ভিত্তিক সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে।

উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণ ভিত্তিক সংজ্ঞার সাহায্যেও দেখান যায় যে, হেকশ্চার-ওলীন তত্ত্ব বৈধ।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন এই হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন-উপকরণের দামে পূর্ণ সমতা স্থাপিত হয়। এই সমতা তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল ঃ বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপকরণ বা উপাদানগুলি সচল না হলেও অবাধ বাণিজ্য সেগুলির দামে সমতা আনতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, দ্রব্যে অবাধ বাণিজ্য উৎপাদন-সচলতার পরিবর্ত হিসাবে কাজ করে।

রিকার্ডোর তত্ত্বের সঙ্গে হেক্‌শ্চার-ওলীন স্যামুয়েলসন তত্ত্বের মূল পার্থক্য হল, দ্বিতীয় তত্ত্বে উৎপাদন অপেক্ষক দুটি দেশে অভিন্ন। উপাদানের পরিমাণের পার্থক্যের জন্যই তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য ঘটে। কিন্তু রিকার্ডোর তত্ত্বে অপেক্ষকের ভিন্নতার জন্যই দুটি দেশে তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য ঘটে। এছাড়া রিকার্ডোর তত্ত্বে একটিই উৎপাদনের উপাদান (শ্রম) রয়েছে বলে বাণিজ্যের পরে এবং আগে আয়ের বণ্টন একই থাকে। হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বে তা বদলে যাবে।

২.৬ অনুশীলনী

১। দুটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য কেন দেখা দেয় তা হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্ব অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করুন।

২। রিকার্ডোর তত্ত্ব এবং হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩। অবাধ বাণিজ্য কিভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণের দামে সমতা আনতে পারে দেখান।

৪। (ক) উপকরণের আধিক্যের দাম ভিত্তিক সংজ্ঞা কি?

(খ) উপকরণের আধিক্যের পরিমাণ ভিত্তিক সংজ্ঞা কি?

(গ) দুটি সংজ্ঞা কি সমার্থক?

(ঘ) হেক্‌শ্চার-ওলীন তত্ত্বের পরিকাঠামোয় দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত এবং দুটি উপকরণের দামের অনুপাতের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়?

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Salvatore : International Economics, Prentice Hall

২। Chacholiades : International Economics, MC Grow—Hill International Editions

৩। Caves and Jones : World Trade and Payments—An Introduction, Addison—Wesley.

৪। Sodersten and Reed : International Economics, Macmillan.

৫। International Trade : Edited by Jagdish Bhagwati, Penguin Modern Economics Readings.

৬। H. Robert Heller : International Trade Theory and Empirical Evidence, Prentice Hall. Englewood Cliffo.

৭। Mia Mikic : International Trade, Macmillan.

একক ৩ ❐ বাণিজ্য-নীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ আমদানি-রপ্তানি শুল্ক (Tariffs)

৩.২.১ আমদানি শুল্ক ও তার অর্থনৈতিক ফলাফল

৩.৩ স্টল্‌পার—স্যামুয়েলসন তত্ত্ব

৩.৪ মেটজ্‌লার কূটাভাস (Metzler Paradox)

৩.৫ পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ—কোটা (Quota)

৩.৬ আমদানি-রপ্তানি শুল্ক এবং কোটার তুল্যতা (Equivalence)

৩.৭ সারাংশ

৩.৮ অনুশীলনী

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে ঃ
- কিভাবে কোন একটি দেশ তার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে?
- এই নিয়ন্ত্রণের অর্থনৈতিক ফলাফল কি?
- নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্কটা কি?

৩.১ প্রস্তাবনা

আমরা আগে দেখেছি যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর মোট উৎপাদন বাড়ে এবং বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী

সব দেশ লাভবান হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রায় সব দেশই অবাধ বাণিজ্যের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে। যেহেতু এই বিধিনিষেধগুলি দেশের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সেহেতু এই বিধিনিষেধগুলি যে নীতির ভিত্তিতে আরোপিত হয় সেই নীতিকে বাণিজ্য-নীতি বলা হয়। যদিও আমদানি ও রপ্তানি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই দুই ধারার ওপরই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে তবু সাধারণত দেখা যায় যে কোন দেশ তার অর্থনৈতিক স্বার্থে বিশেষ করে তার দেশীয় শিল্পগুলিকে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেশের আমদানি বাণিজ্যের উপর প্রধানত নানারূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি হল বাণিজ্যের ওপর শুল্ক-আরোপ করা। আমদানি এবং রপ্তানি উভয়ের ওপরই শুল্ক আরোপিত হতে পারে। আমদানি-কৃত দ্রব্যের ওপর শুল্ক আরোপিত হলে তাকে আমদানি-শুল্ক এবং রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর শুল্ক আরোপিত হলে তাকে রপ্তানিশুল্ক বলা হয়। আমদানি শুল্ক রপ্তানি শুল্ক অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সহজেই রাজস্ব আদায় করা যায় এই কারণে উন্নতিশীল দেশগুলি অনেক সময় রপ্তানি শুল্ক আরোপ করে থাকে। আমাদের আলোচনা মূলত আমদানি-শুল্ককে কেন্দ্র করেই এগোবে।

শুল্ক ছাড়াও বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ পরিমাণগত বিধিনিষেধ আরোপ করে করা যেতে পারে। এই পরিমাণগত বিধিনিষেধ 'কোটা' নামে পরিচিত। এই কোটার সাহায্য কিভাবে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে এবং কোটা ও শুল্কের মধ্যে কি ধরণের সম্পর্ক রয়েছে আমরা জানবার চেষ্টা করব।

বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করে উদারীকরণের পথে চলেছে। ইতিহাসে দেখা গেছে নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য এবং অবাধ বাণিজ্য ঘুরে ফিরে এসেছে। কাজেই তত্ত্বগতভাবে বাণিজ্য-নীতির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

৩.২ আমদানি-রপ্তানি শুল্ক (Tariffs)

আমরা আগেই জেনেছি যে আমদানি-কৃত দ্রব্য এবং রপ্তানিকৃত দ্রব্য উভয়ের ওপরেই শুল্ক আরোপ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, তবে আমদানি শুল্কের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা এখন এই আমদানি শুল্ক নিয়েই আলোচনা করব।

৩.২.১ আমদানি শুল্ক ও তার অর্থনৈতিক ফলাফল

কোন দ্রব্যের আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করলে কতকগুলি অর্থনৈতিক ফলাফল পাওয়া যায়। এই ফলাফলগুলি হল ঃ (ক) উৎপাদন-সংক্রান্ত ফলাফল, (খ) ভোগ-সংক্রান্ত ফলাফল, (গ) রাজস্ব-সংক্রান্ত

ফলাফল, (ঘ) বাণিজ্য-সংক্রান্ত ফলাফল, (ঙ) পুনর্বণ্টন-সংক্রান্ত ফলাফল, (চ) আয়-সংক্রান্ত ফলাফল এবং (ছ) বৈদেশিক লেনদেন সংক্রান্ত ফলাফল। এই বিভিন্ন ফলাফলকে আমরা বিভিন্ন প্রভাব হিসেবে ভাবতে পারি এবং সেভাবে উল্লেখ করতে পারি, যেমন, উৎপাদন-প্রভাব, ভোগ-প্রভাব ইত্যাদি।

আমদানি-শুল্ক বসানো হলে আমদানিকারী দেশের অভ্যন্তরে আমদানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত দামে দ্রব্যটির উৎপাদন এবং যোগান বৃদ্ধি পায়। একে উৎপাদন প্রভাব বলা হয়। দাম বৃদ্ধির ফলে ভোগকারীরা আমদানি দ্রব্য কম ভোগ করে। একে ভোগ প্রভাব বলা হয়। আমদানি-শুল্ক থেকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়—একে রাজস্ব প্রভাব বলে। আমদানি-শুল্ক আরোপের ফলে দ্রব্যটির দাম-বৃদ্ধি ঘটলে ক্রেতাদের ভোগোদ্বৃত্ত হ্রাস পায় কিন্তু উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত বা মুনাফা বৃদ্ধি পায়। একে পুনর্বণ্টন প্রভাব বলা হয়। আমদানি কমে যাওয়ার ফলে বাণিজ্যের ওপর যে প্রভাব পড়ে তাকে বাণিজ্য-প্রভাব বলা হয়। আমদানি শুল্ক আরোপ করার ফলে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেতে পারে—একে আয়-প্রভাব বলা হয়। আমদানি-শুল্ক আরোপ করার ফলে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের বা ব্যালেন্সের ওপর যে প্রভাব পড়ে তাকে লেনদেন-ব্যালেন্স-প্রভাব বলা যেতে পারে।

আমদানি শুল্ক আরোপ করার ফলে যে অর্থনৈতিক ফলাফল পাওয়া যায় একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে সেগুলি ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক 'X' দ্রব্যটির আমদানির ওপর শুল্ক বসানো হয়েছে। নিচের চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আমরা X দ্রব্যের চাহিদা এবং যোগান এবং উল্লম্ব অক্ষে তার দাম পরিমাপ করছি। DD রেখা দ্রব্যটির চাহিদা রেখা এবং SS রেখা দ্রব্যটির যোগান রেখা। আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি, যে দেশের আমদানির ওপর আমদানি-শুল্ক বসানো হচ্ছে সেই দেশটি একটি ছোট দেশ। দেশটি ছোট বলে তার আমদানির ওপর শুল্ক বসালে আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যটির দামের ওপর কোন প্রভাব পড়ে না।

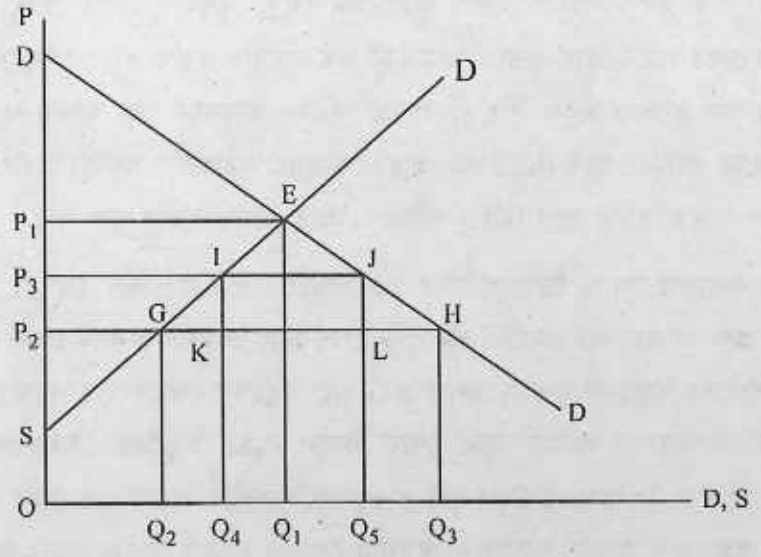

চিত্র ঃ ৩.১

বাণিজ্য-পূর্ববর্তী অবস্থায় দ্রব্যটির বাজার দর হবে OP_1, কারণ এই দামেই দ্রব্যটির চাহিদা এবং যোগান পরস্পর সমান হচ্ছে। OP_1 দামে দ্রব্যটির উৎপাদন এবং যোগান দেখা যাচ্ছে OQ_1. দেশের ভোগকারীরা OQ_1 পরিমাণ 'X' দ্রব্য ভোগ করতে পারছে। বাণিজ্যবিহীন অবস্থায় E বিন্দু দ্রব্যটির বাজারে ভারসাম্য অবস্থা নির্দেশ করছে।

এবার ধরা যাক দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে দ্রব্যটি বিদেশ থেকে আমদানি করা হবে এবং এর ফলে দ্রব্যটির দাম কমে যাবে। ধরা যাক দ্রব্যটির দাম কমে OP_2 হল। এই দামে দ্রব্যটির অভ্যন্তরীণ যোগান দেখা যাচ্ছে OQ_2 এবং চাহিদা OQ_3। চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাবার জন্য Q_2Q_3 পরিমাণে দ্রব্যটি আমদানি করতে হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ যোগান এবং আমদানি মিলিয়ে দ্রব্যটি মোট পাওয়া যাচ্ছে OQ_3 পরিমাণ যা OP_2 দামে দ্রব্যটির চাহিদার সমান। এখন ধরা যাক দ্রব্যটির আমদানির উপর একক পিছু t_1 করে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হল। এই আমদানি শুল্ক, আমরা ধরে নিচ্ছি, সবটাই ক্রেতাদের ওপর বর্ধিত দামের আকারে চাপানো হচ্ছে। কাজেই আমদানি-শুল্ক আরোপ করার ফলে দ্রব্যটির দাম OP_2 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OP_3 হল। OP_3 দামে দ্রব্যটির অভ্যন্তরীণ যোগান হবে OQ_4 অর্থাৎ আমদানি শুল্ক আরোপ করার ফলে দ্রব্যটির যোগান OQ_2 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OQ_4 হল। একেই বলা হয় আমদানি শুল্কের উৎপাদন প্রভাব। আবার OP_3 দামে দ্রব্যের চাহিদা OQ_5। যেহেতু OP_2 দামে দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ যোগান OQ_4। অতএব Q_4Q_5 এই পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করে চাহিদা তৃপ্ত করা হচ্ছে। কিন্তু আমদানি-শুল্ক বসাবার আগে দেশের ভোগকারীরা যতটা ভোগ করতে পারছিলেন এখন তার থেকে কম পাচ্ছেন। শুল্ক বসাবার আগে ভোগ করছিলেন OQ_3 পরিমাণ, এখন ভোগ করছেন OQ_5 পরিমাণ। একে বলা যেতে পারে ভোগ-প্রভাব। আমদানি শুল্ক আরোপ করার পর যে Q_4Q_5 পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করা হচ্ছে তার প্রত্যেক একক পিছু t_1 বা IK পরিমাণ আমদানি শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। মোট আমদানি শুল্ক আদায়ের পরিমাণ হবে IKLJ এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। অর্থাৎ আমদানি-শুল্ক আরোপ করার ফলে রাজস্ব আদায় হবে IKLJ পরিমাণ। একে রাজস্ব-প্রভাব বলা যায়।

আমদানি শুল্ক বসানোর আগে ভোগকারীদের ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল DP_2H. এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান। শুল্ক বসাবার পর দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পেল এবং ভোগোদ্বৃত্ত কমে গেল। অন্যদিকে শুল্ক বসাবার আগে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা মুনাফা ছিল P_2SG এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান। আমদানি-শুল্ক আরোপ করার পর এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল P_3SI ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান। এই ভোগোদ্বৃত্ত হ্রাস পাওয়া এবং উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাওয়াকে, পুনর্বণ্টন-প্রভাব বলা যেতে পারে। ওপরের চিত্রের সাহায্যে যে প্রভাবগুলি আমরা আলোচনা করলাম সেগুলি ছাড়াও আরও প্রভাব আছে। আমদানি শুল্ক বসাবার ফলে দেশের আয়স্তরও প্রভাবিত হতে পারে। আমদানি শুল্ক বসালে আমদানি কমবে এবং

দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। এর ফলে দেশের মধ্যে উৎপাদন ও আয়স্তর বৃদ্ধি পাবে। একে আয়-প্রভাব বলা যায়।

পরিশেষে, আমদানি-শুল্ক বসাবার পর আমদানি কমে যাবে; যদি রপ্তানি একই থাকে তাহলে বৈদেশিক লেনেদেন ব্যালেন্সের ওপর অনুকূল প্রভাব পড়বে। তবে এই অনুকূল প্রভাব সাময়িক হতে পারে। আমদানি-শুল্ক আরোপকারী দেশটি যে দেশ থেকে আমদানি করে সেই দেশের রপ্তানি কমার অর্থ সেই দেশের আয়স্তর কমা। এই দ্বিতীয় দেশটির আয় কমলে তার আমদানি কমবে যার ফলে প্রথম দেশটির রপ্তানি কমবে। কাজেই লেন-দেন ব্যালেন্সের ওপর প্রভাব আর অনুকূল থাকবে না।

৩.৩ স্টিলপার-স্যামুয়েলসন তত্ত্ব

আমরা দেখেছি যে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের বক্তব্য হল, অবাধ বাণিজ্যের ফলে একটি দেশ তার উৎপাদন সম্ভাবনার বাইরে ভোগ করতে পারে এবং তার ফলে দেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। প্রায় এক শতাব্দী ধরে অর্থনীতিবিদগণ এই চিন্তাধারাই পোষণ করেছেন যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিটি নাগরিকের লাভ হবে এবং বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হলে প্রত্যেকের ক্ষতি হবে। ১৯৪১ সালে স্টল্পার এবং স্যামুয়েলসন এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করলে সমগ্র অর্থনীতির পক্ষে তা ক্ষতিকারক হলেও সাধারণভাবে আমদানিকৃত দ্রব্যের প্রতিযোগী শিল্পগুলিতে নিযুক্ত উৎপাদনের উপকরণগুলির লাভ হয়, তাদের আয় বৃদ্ধি পায়। এই তত্ত্বে দুটি দেশের মধ্যে কোন তুলনামূলক আলোচনা করা হয়নি। একটি দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করা হয়েছে।

ধরা যাক এই দেশটি 'A' এবং এই দেশে শ্রম আপেক্ষিকভাবে কম পাওয়া যায়। এখন এই দেশটির আমদানি-কৃত দ্রব্যটি যদি 'X' হয় তাহলে X হবে শ্রম-নিবিড় দ্রব্য এই X দ্রব্যটির ওপর আমদানি-শুল্ক আরোপ করলে দ্রব্যটির আপেক্ষিক দাম বৃদ্ধি পাবে। স্টল্পার-স্যামুয়েলসন তত্ত্বের বক্তব্য হল কোন দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম বৃদ্ধি পেলে সেই দ্রব্যের উৎপাদনে নিবিড়ভাবে নিযুক্ত উৎপাদনের উপকরণের আয় বৃদ্ধি পাবে। আমদানি-শুল্ক আরোপের ফলে অতএব আপেক্ষিকভাবে কম পাওয়া যায় এমন উপকরণের আয় বৃদ্ধি পাবে। আমাদের উদাহরণে A দেশে শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি পাবে। এই তত্ত্ব অনুসারে শুধু যে তাদের আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পাবে তাই নয়, প্রকৃত মজুরিও বৃদ্ধি পাবে।

ধরা যাক অন্য দ্রব্যটি Y এখন X দ্রব্যের ওপর আমদানি শুল্ক বসানো হলে P_x/P_y বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে দেশটি X দ্রব্য বেশি উৎপাদন করবে এবং Y দ্রব্য কম উৎপাদন করবে। নিচের চিত্রে CD হল A দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা। আমদানি-শুল্ক বসানোর আগে P_A রেখা P_x/P_y নির্দেশ করছে এবং

উৎপাদন হচ্ছে R বিন্দুতে। আমদানি-শুল্ক বসানোর পরে $^{P}x/Py$ বৃদ্ধি পেল এবং সেই বর্ধিত $^{P}x/Py$ P_B রেখা দ্বারা চিত্রে দেখানো হল। দেখা যাচ্ছে উৎপাদন R বিন্দু থেকে সরে এসে Q বিন্দুতে হচ্ছে। Q বিন্দুতে আগের তুলনায় বেশি X এবং কম Y উৎপাদিত হচ্ছে। X শ্রম-নিবিড় দ্রব্য। অন্যদিকে Y মূলধন-নিবিড়

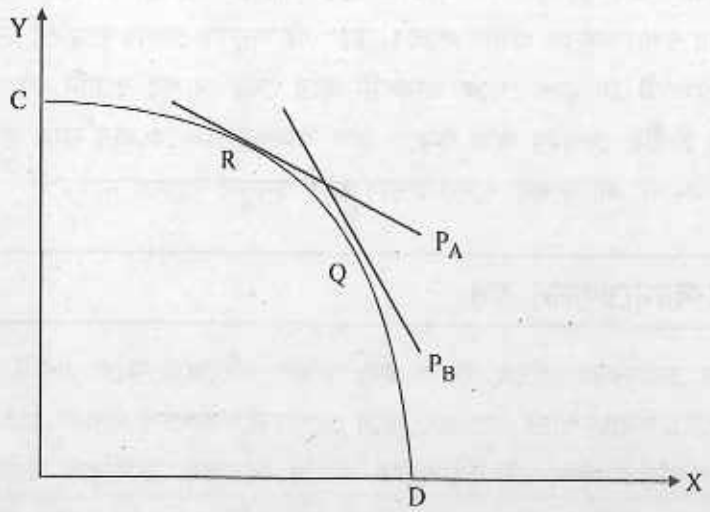

চিত্র ঃ ৩.২

দ্রব্য। Y এর উৎপাদন কমার ফলে যে অনুপাতে শ্রম এবং মূলধন পাওয়া যাবে তার থেকে বেশি অনুপাতে শ্রম এবং মূলধন প্রয়োজন হবে X এর বর্ধিত উৎপাদনের জন্য। ফলে $^{w}/_{r}$ অর্থাৎ শ্রমের এবং মূলধনের দামের অনুপাত বৃদ্ধিপাবে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমের পরিবর্তে দুটি দ্রব্যের উৎপাদনেই বেশি মূলধন ব্যবহৃত হবে এবং তার ফলে $^{K}/_{L}$ দুটি দ্রব্যের উৎপাদনেই বৃদ্ধি পাবে। শ্রমের প্রত্যেকটি একক এখন যেহেতু অধিক পরিমাণে মূলধনের সঙ্গে ব্যবহৃত হবে সেহেতু শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং ফলে w বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে X দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক আরোপ করলে সংশ্লিষ্ট দেশটিতে $^{P}x/Py$ বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রমের আয় বৃদ্ধি পাবে। শ্রম এই দেশে তুলনামূলকভাবে দুষ্প্রাপ্য উৎপাদনের উপাদান।

এখন যেহেতু শ্রমের উৎপাদনশীলতা দুটি দ্রব্যের উৎপাদনেই বৃদ্ধি পায়। সেহেতু কেবলমাত্র আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পায় তা নয়। প্রকৃত মজুরিও বৃদ্ধি পায়। আমদানি-শুল্ক আরোপের ফলে দেশের জাতীয় আয় কমে যায়, কিন্তু জাতীয় আয়ে মজুরির ভাগ বৃদ্ধি পায়। দেখা যাচ্ছে যে আমদানি-শুল্ক আরোপের ফলে সামগ্রিকভাবে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, দেশের তুলনামূলকভাবে দুষ্প্রাপ্য উপাদানের লাভ হয়।

স্টল্পার-স্যামুয়েলসন তত্ত্ব ক্ষুদ্র দেশের ক্ষেত্রে সর্বদাই প্রযোজ্য এবং বৃহৎ দেশের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রযোজ্য। তবে বৃহৎ দেশের ক্ষেত্রে সমস্যা উপস্থিত হয় কারণ, বৃহৎ দেশের বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যসমূহের দামকে প্রভাবিত করে।

৩.৪ মেট্‌জ্‌লার কূটাভাস (Metzler Paradox)

১৯৪৯ সালে অর্থনীবিদ Metzler দেখান যে আমদানিশুল্ক আরোপ করার ফলে আমদানিকৃত দ্রব্যটির দাম সর্বত্র হ্রাস পাবে—দ্রব্যটির অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে। এই সম্ভাবনাটিকে মেট্‌জ্‌লার 'কূটাভাস' (Metzler Paradox) বলা হয়। এই সম্ভাবনা দেখা দিলে স্টল্‌পার-স্যামুয়েলসন তত্ত্বটি আর কার্যকরী হবে না। এই সম্ভাবনাটি দেখা দেবে তখন, যখন (ক) আমদানিকৃত দ্রব্যটির জন্য বৈদেশিক চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হবে এবং (খ) আমদানি-শুল্ক আরোপকারী দেশটির প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা খুব কম হবে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে আমদানিকৃত দ্রব্যটির দাম আমদানি-শুল্কের পরিমাণের থেকেও বেশি হ্রাস পাবে এবং তার ফলে আমদানি-শুল্ক আরোপকারী দেশেও দ্রব্যটির দাম হ্রাস পাবে।

আমরা এই 'মেট্‌জ্‌লার কূটাভাস' ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি অংশে বিভক্ত একটি চিত্রের সাহায্য নেব। নিচে এইরকম একটি চিত্র দেখান হল। বামদিকের চিত্রে স্টলপার স্যামুয়েলসন তত্ত্বের কার্যকারিতা দেখান হয়েছে এবং ডানদিকের চিত্রে দেখান হয়েছে 'মেট্‌জ্‌লার কূটাভাস'। জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা সহজতর হবে বলে আমরা আমাদের আলোচনায় আমদানিকৃত দ্রব্যের ওপর শুল্কের বিষয় বিবেচনা না করে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর শুল্কের বিষয় বিবেচনা করব। আমরা 'অফার রেখার' সাহায্যে সমগ্র বিষয়টি

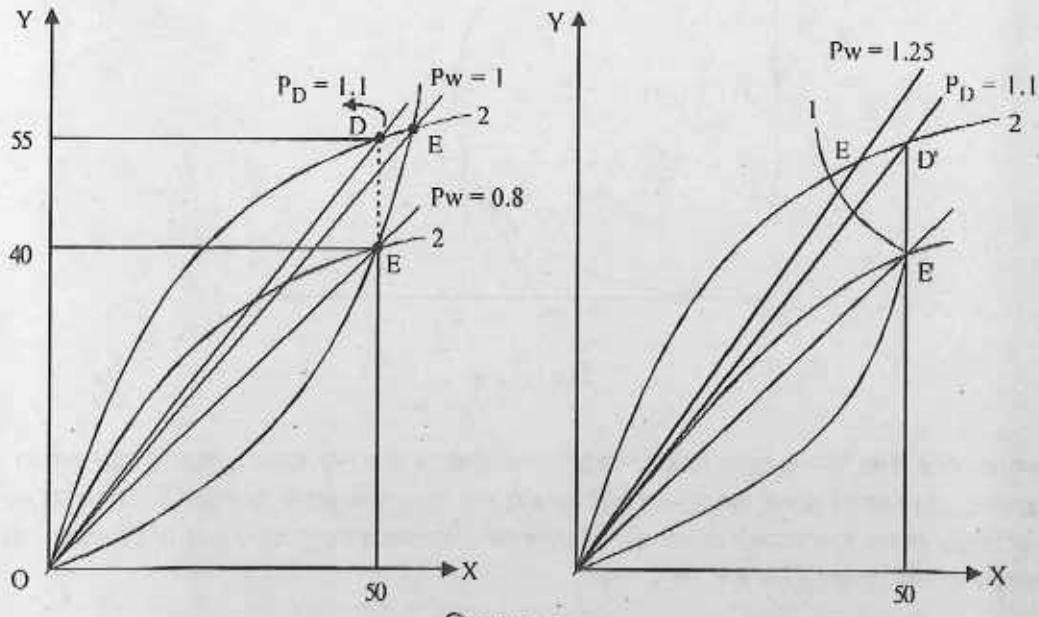

চিত্র ঃ ৩.৪

আলোচনা করব। আমাদের আলোচনায় X দ্রব্য শ্রম-নিবিড় এবং Y দ্রব্য মূলধন-নিবিড়। দেশদুটির মধ্যে প্রথম দেশটি শ্রম-প্রগাঢ় এবং দ্বিতীয় দেশটি মূলধন-প্রগাঢ়।

আমাদের চিত্রের বাম দিকের অংশে দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় দেশটি যখন তার রপ্তানির উপর শুল্ক বসাচ্ছে তখন X দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম কমে যাচ্ছে। কোনরকম শুল্ক না থাকা অবস্থায় প্রথম দেশটির 'অফার' রেখাটি হল '1' চিহ্নিত রেখাটি এবং দ্বিতীয় দেশটির 'অফার' রেখাটি হল '2' চিহ্নিত রেখাটি। ভারসাম্য বিন্দু হল E এবং ভারসাম্য $^{P}x/Py$ হল Pw = 1. 'অফার' রেখা দুটির আকৃতি অনুযায়ী X দ্রব্যটি হল প্রথম দেশটির

---

1. মেট্‌জলার কূটাভাস ব্যাখ্যা করার জন্য 'অফার কার্ভ' বা অফার রেখার ব্যবহার প্রয়োজন। অফার রেখা হল সেই সমস্ত বিন্দু যোগ করে পাওয়া রেখা, যে বিন্দুগুলি বিভিন্ন সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যহারে একটি দেশ তার চাহিদামত আমদানি দ্রব্যের জন্য কি পরিমাণ রপ্তানি দ্রব্য দিতে ইচ্ছুক তা দেখায়। ধরা যাক দেশটি A এবং দুটি দ্রব্য X ও Y এর মধ্যে X এই দেশটির রপ্তানি দ্রব্য এবং Y আমদানি দ্রব্য। নিচের চিত্রে OR হল A দেশটির অফার রেখা। দেখা যাচ্ছে OR রেখাটি অনুভূমিক অক্ষ অর্থাৎ যে অক্ষে A দেশটির রপ্তানি দ্রব্য পরিমাপ করা হয়েছে সেই অক্ষ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই সরে যাওয়ার কারণ দুটি : (ক) X দ্রব্যের উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং (খ) X এর রপ্তানি বৃদ্ধির সাথে দেশের অভ্যন্তরে X দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি। এই দুটি কারণে সংশ্লিষ্ট দেশটি সমপরিমাণ Y দ্রব্যের জন্য ক্রমশ কম পরিমাণ X দ্রব্য দিতে ইচ্ছুক হবে।

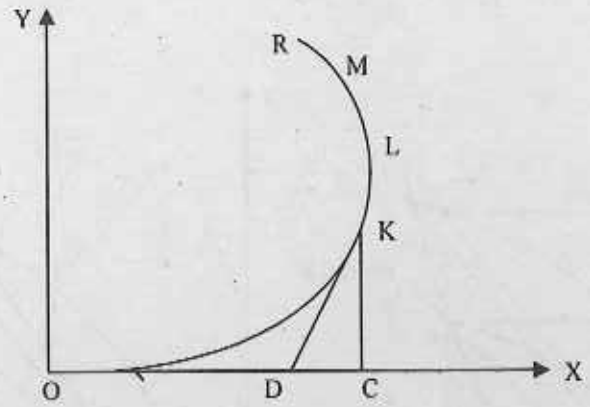

চিত্র : ২.৪

এই অফার রেখার উপর তিন প্রকারের স্থিতিস্থাপকতার ধারণা পাওয়া যায় : (খ) অফার রেখার স্থিতিস্থাপকতা বা মোট স্থিতিস্থাপকতা, (খ) আমদানি-দ্রব্যের জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং (গ) রপ্তানি-দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। এই তিন প্রকারের স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে আমদানি-দ্রব্যের জন্য স্থিতিস্থাপকতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এই স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি 'e' ঋণাত্মক হয়। 'e'-র জ্যামিতিক রূপ হল :

$$e = \frac{DC}{DC - OC}$$

ওপরের চিত্রে K বিন্দুতে $e > -1$, L বিন্দুতে $= -1$ এবং M বিন্দুতে < -1

রপ্তানি দ্রব্য এবং Y দ্রব্যটি হল দ্বিতীয় দেশটির রপ্তানি দ্রব্য। এখন যদি দ্বিতীয় দেশটি তার রপ্তানির ওপর শুল্ক আরোপ করে তাহলে তার অফার রেখাটি স্থান পরিবর্তন করে 2' চিহ্নিত স্থানে চলে আসবে এবং এর ফলে P_x/P_y কমে গিয়ে হবে P'w = 0.8 অর্থাৎ X দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম কমে যাবে।

রপ্তানি-শুল্ক আরোপকারী দ্বিতীয় দেশটির 'অফার' রেখাটি কেন স্থান পরিবর্তন করছে সেই বিষয়ে আরো একটু বলা প্রয়োজন। এই দেশের রপ্তানিকারী ব্যক্তিরা রপানির জন্য প্রস্তুত করবে Y দ্রব্যের 55টি একক কিন্তু এর মধ্যে থেকে 15টি একক এই দেশের সরকার রপ্তানি-শুল্ক বাবদ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে যার ফলে বিদেশীদের প্রকৃতপক্ষে দিতে চাওয়া হবে Y দ্রব্যের 40টি একক X দ্রব্যের 50টি এককের জন্য। রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ D'E' হলে 'অফার' রেখাটি হবে 2' চিহ্নিত রেখাটি।

এখন দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় দেশটিতে রপ্তানি-শুল্ক আরোপ করার পর রপ্তানিকারী ব্যক্তিদের কাছে $P_x/P_y = P_{D'} = 1.1$, যেখানে অবাধ বাণিজ্য থাকাকালীন অবস্থায় $P_x/P_y = P_w = 1$ ছিল। রপ্তানিকারকদের কাছে P_x/P_y বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল তারা শ্রম এবং মুলধন Y দ্রব্যের উৎপাদন থেকে সরিয়ে এনে X দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োগ করবে। এর ফলে X এবং Y দুটি দ্রব্যের উৎপাদনেই মূলধন ও শ্রমের অনুপাত অর্থাৎ K/L বৃদ্ধি পাবে। শ্রমের প্রতিটি একক যদি অধিক পরিমাণে মূলধন ব্যবহার করতে পারে তাহলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং ফলে আয় বৃদ্ধি পাবে। আমাদের চিত্রের বাম দিকের অংশে অতএব স্টল্‌পার-স্যামুয়েলসন তত্ত্বের কার্যকারিতা প্রদর্শিত হচ্ছে।

এবার আমরা চিত্রের ডান দিকের অংশে মনোনিবেশ করব। এখানে প্রথম দেশটির 'অফার' রেখাটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। একটা বিন্দুর পর রেখাটি অস্থিতিস্থাপক হয়ে যাচ্ছে। রেখাটি তখন পিছন দিকে বেঁকে গিয়ে নিম্নমুখী রেখায় পরিণত হচ্ছে। অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিন্দু E তে, Pw = 1.25 রপ্তানি-শুল্ক আরোপের ফলে দ্বিতীয় দেশটির 'অফার' রেখা হবে 2' চিহ্নিত রেখাটি এবং এটি প্রথম দেশটির 'অফার' রেখাতে E' বিন্দুতে ছেদ করবে এবং দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে Pw' = 0.8 কিন্তু দ্বিতীয় দেশের রপ্তানিকারকরা রপ্তানি-শুল্ক দেবে 15Y (D'E') যার ফলে তাদের কাছে দামের অনুপাত $P_x/P_y = P_{D'} = 1.1$ হবে। দেখা যাচ্ছে যে অবাধ বাণিজ্য থাকাকালীন অবস্থায় রপ্তানিকারকদের কাছে $P_x/P_y = 1.25$ এবং রপ্তানি-শুল্ক বসানোর পর রপ্তানিকারী ব্যক্তিদের কাছে P_x/P_y হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্টল্‌পার-স্যামুয়েলসন তত্ত্ব কার্যকরী হচ্ছে না। দ্বিতীয় দেশটিতে রপ্তানি-শুল্ক আরোপের পর অতএব দ্রব্যের উৎপাদন কমবে এবং Y দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। Y দ্রব্য মূলধন-নিবিড় দ্রব্য বলে K/L দুটি দ্রব্যের উৎপাদনেই হ্রাস পাবে। ফলে দ্বিতীয় দেশে শ্রমের উৎপাদনশীলতা এবং আয় হ্রাস পাবে। স্টল্‌পার-স্যামুয়েলসন তত্ত্বের বক্তব্যের ঠিক বিপরীত ঘটনা এখানে ঘটছে। এটাই মেট্‌জ্‌লার কূটাভাস।

মেট্‌জ্‌লার কূটাভাস একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা বলে। রাজনৈতিক নেতারা শুল্কের পক্ষে রায় দেন এই ভেবে যে আমদানি-শুল্কের মাধ্যমে আমদানির প্রতিযোগী দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া যাবে। কিন্তু মেট্‌জ্‌লার-কূটাভাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন হল যে আমদানিশুল্ক আরোপের ফলে আমদানির প্রতিযোগী শিল্পগুলি ঋণাত্মক সংরক্ষণ পাবে। আমদানি দ্রব্যের দেশীয় উৎপাদন কমে যাবে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলি আমদানির প্রতিযোগী শিল্পগুলি থেকে সরে এসে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত হবে। ঋণাত্মক সংরক্ষণের ফল আমদানির প্রতিযোগী শিল্পগুলিকে ভোগ করতে হবে।

৩.৫ কোটার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ

ঐতিহাসিক দিক থেকে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করবার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল বাণিজ্য-শুল্ক যা আমদানি এবং রপ্তানির উপর আরোপ করা হয়। কিন্তু এই বাণিজ্য-শুল্ক ছাড়াও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করবার অন্যান্য পদ্ধতি আছে—এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি হল কোটার সাহায্যে আমদানি এবং রপ্তানির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ। কোটার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ অন্যান্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

একটি দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কোটার সাহায্যে সরাসরিভাবে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। আমরা এখানে কেবলমাত্র আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করব। আমদানির পরিমাণ বিভিন্ন কারণে নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে, যেমন, দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়ার জন্য, দেশীয় কৃষিব্যবস্থাকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়ার জন্য এবং লেনদেন ব্যালেন্সে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য ইত্যাদি। আমদানির উপর শুল্ক আরোপ করার ফলাফল আমরা যেভাবে আলোচনা করেছি প্রায় সেই একই রকম ভাবে কোটার সাহায্যে আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলাফল আলোচনা করা যায়। নিচের চিত্রের সাহায্যে আমরা এখন এই আলোচনা করব।

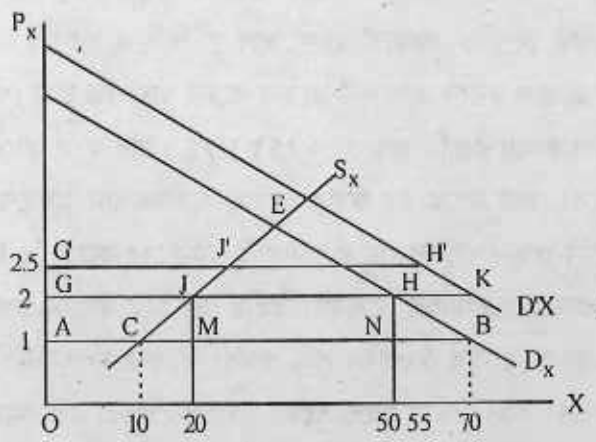

চিত্র ঃ ৩.৪

চিত্রে Dx হল X দ্রব্যের চাহিদা রেখা এবং S_x হল যোগান রেখা। অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত থাকলে P_x = \$1 এই আন্তর্জাতিক দামে দেশটি 70X বা AB পরিমাণ X ভোগ করে যার মধ্যে 10X (AC) দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত হয় এবং বাকী 60X (CB) আমদানি করা হয়। এবার এই আমদানির পরিমাণ কোটার সাহায্যে বেঁধে দেওয়া হল। ধরা যাক, 30X (JH) এ। এই বেঁধে দেওয়ার ফলে X দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ দাম বৃদ্ধি পেয়ে P_x = \$2 হল। এ রণ হল একমাত্র P_x = \$2 এ চাহিদা যোগানের সমান হচ্ছে। P_x = \$2 এ চাহিদা হল 50X (GH) এবং ন্তরীণ উৎপাদন 20X (GJ) ও কোটা দ্বারা বেঁধে দেওয়া পরিমাণ 30X (JH) মিলে যোগান হল 50X (GH) ভোগের পরিমাণ কমে যাচ্ছে 20X (BN) পরিমাণে। অন্যদিকে দেশীয় উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে 10X (CM) পরিমাণে। সরকার যদি আমদানি লাইসেন্স এর উপর 'ফি' ধার্য করেন তাহলে \$30 (\$1 X 30X) রাজস্ব আদায় হবে সরকারের। এই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ আমাদের চিত্রে হবে JHNM এই ক্ষেত্রটি।

এবার চাহিদা রেখা যদি D_x থেকে D_x' এ স্থান পরিবর্তন করে তাহলে X এর অভ্যন্তরীণ দাম বেড়ে গিয়ে হবে P_x = \$2.50, দেশীয় উৎপাদন বেড়ে গিয়ে হবে 25X (G'J') এবং ভোগ 50X থেকে বেড়ে 55X (G'H') হবে।

৩.৬ আমদানি-রপ্তানি শুল্ক এবং কোটার তুল্যতা

এই তুল্যতা বিচারের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আমদানি শুল্ক নিয়েই আলোচনা করব। আমদানির ওপর কোটার সঙ্গে আমদানির ওপর শুল্কের তুলনা করে দেখাব যে দুটির মধ্যে তুল্যতা রয়েছে। নিচের চিত্রে

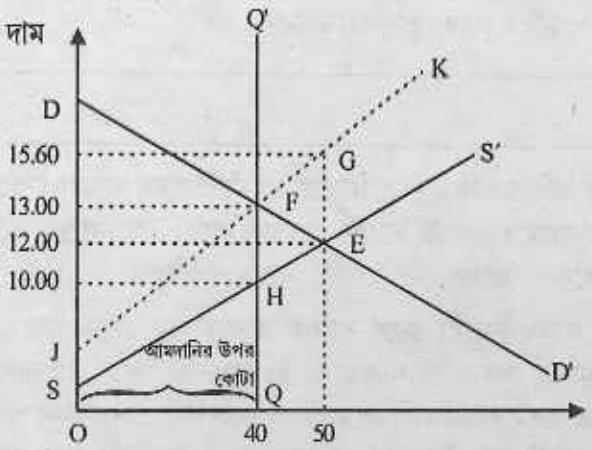

চিত্র ঃ ৩.৫

আমদানির পরিমাণ (হাজারের এককে)

একটি আমদানি কৃত দ্রব্যের বাজার, ধরা যাক ইস্পাতের বাজার, দেখান হল। DD' রেখা হল ইস্পাতের জন্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা রেখা এবং SS' রেখা হল ইস্পাতের বৈদেশিক যোগান রেখা। যখন অবাধ বাণিজ্য রয়েছে তখন ভারসাম্য স্থাপিত হচ্ছে E বিন্দুতে যেখানে আমদানিকৃত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা রেখা ঐ দ্রব্যের বৈদেশিক যোগান রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। চিত্র অনুসারে আমদানিকারী দেশটি (মাসে) 50,000 একক দ্রব্যটি আমদানি করছে এবং একক প্রতি তার দাম 12 টাকা।

এবার ধরা যাক মাসে 40,000 এককে আমদানি কোটার সাহায্যে বেঁধে দেওয়া হল। QQ' রেখা দ্বারা এই কোটার পরিমাণ চিত্রে নির্দেশিত হয়েছে। অবাধ বাণিজ্য থাকলে যত একক আমদানি করা যেত তার থেকে এই পরিমাণ কম, কাজেই কোটা এখানে ফলপ্রসূ হবে। কোটা আরোপ করার ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পেয়ে একক প্রতি 13 টাকা হয়ে যাচ্ছে (F বিন্দু দ্রষ্টব্য)। বিদেশের বাজারে দ্রব্যটির দাম কিন্তু হ্রাস পেয়ে একক প্রতি 10 টাকা হচ্ছে (H বিন্দু দ্রষ্টব্য)। আমদানি-শুল্কের মতন আমদানির ওপর কোটা আরোপ করলে দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ দাম ও বৈদেশিক দামের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিচ্ছে।

ওপরের চিত্রে কোটা আরোপ করার ফলে যে ফলাফল আমরা ঘটতে দেখলাম সেই ফলাফলের তুল্য ফলাফল আমরা পাব যদি তিরিশ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়। এই তিরিশ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হলে বৈদেশিক যোগান রেখা ওপরের দিকে স্থান পরিবর্তন করবে। নতুন এই যোগান রেখাটি হবে JK. লক্ষ্য করার বিষয় হল উল্লম্ব অক্ষে EG, 3.60 টাকা নির্দেশ করছে যা কি না E বিন্দুতে দ্রব্যের দামের তিরিশ শতাংশ, এবং উল্লম্ব অক্ষে HI হল 3 টাকা যা কিনা H বিন্দুতে দ্রব্যের দামের তিরিশ শতাংশ। দুটি যোগান রেখার সব বিন্দুতেই একই সম্বন্ধ বর্তমান। আমদানি-শুল্ক আরোপের ফলে আমদানি হ্রাস পেয়ে 40,000 এককে দাঁড়াচ্ছে এবং দ্রব্যটির অভ্যন্তরীণ দাম বৃদ্ধি পেয়ে হচ্ছে একক প্রতি 13 টাকা। অন্যদিকে দ্রব্যটির বৈদেশিক দাম একক প্রতি 10 টাকায় কমে যাচ্ছে। কোটা আরোপ করার ফলেও একই রকম ফলাফল ঘটতে দেখা গেছে। কাজেই আমদানির উপর কোটা এবং আমদানির উপর শুল্ক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে তুল্যতা বর্তমান।

৩.৭ সারাংশ

বাস্তবে সব দেশই বৈদেশিক বাণিজ্যে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে। বাণিজ্য নীতি অনুসারে রাষ্ট্রগুলি মূলত আমদানির ওপরই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এই নিয়ন্ত্রণ শুল্কের মাধ্যমে হতে পারে কিম্বা পরিমাণগত বিধিনিষেধের সাহায্যে, যা 'কোটা' নামে পরিচিত।

আমদানি শুল্ক বসালে আমদানিকারী দেশে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। এর অনেকগুলি প্রভাব রয়েছে। যেমন ঃ ভোগকারীদের ক্ষেত্রে ভোগ-প্রভাব, উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রভাব, রাজস্ব প্রভাব, আয়-প্রভাব। তবে এই শুল্কের প্রভাবে আমদানি কমে গেলে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর অনুকূল প্রভাব পড়বে (যদি রপ্তানি একই থাকে)। তবে যে দেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে, এর পরিণামে তার রপ্তানি কমলে তার আয়স্তরও কমবে। তখন তার আমদানি কমবে, ফলে প্রথম দেশটির রপ্তানি কমবে। কাজেই এইভাবে লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর প্রতিকূল প্রভাবও এসে যেতে পারে। তবে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত

হলে সমগ্র অর্থনীতির পক্ষে তা ক্ষতিকারক হলেও স্টলপার ও স্যামুয়েলসন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা একটি দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করলে আমদানিকৃত দ্রব্যের প্রতিযোগী শিল্পগুলিতে নিযুক্ত উৎপাদন-উপকরণগুলির লাভ হয়, তাদের আয়ও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে কোনও দেশে শ্রম দুষ্প্রাপ্য উপাদান হলে এবং ওই শ্রমে তৈরি দ্রব্যে আমদানি শুল্ক বসলে আর্থিকও প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পাবে। তবে আমদানি শুল্ক বসানোর ফলে দেশের জাতীয় আয় কমে যায়।

মেট্‌জ্‌লার অবশ্য তাঁর কূটাভাসে দেখিয়েছেন, আমদানি শুল্ক বসালে আমদানিকৃত দ্রব্যের দাম কমবে দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে। তখন স্টল্‌পার-স্যামুয়েলসন তত্ত্বটি আর কার্যকরী হবে না।

অন্যদিকে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়ার জন্য, কৃষিতে সংরক্ষণের লক্ষ্যে এবং লেনদেনের ভারসাম্য অনুকূল প্রভাব আনতে কোটার সাহায্যে আমদানি বেঁধে দেওয়া হয়ে থাকে। এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে তুল্যতা সহজেই প্রমাণ করা যায়।

৩.৮ অনুশীলনী

১। আমদানি শুল্ক কাকে বলে? এই শুল্ক আরোপ করা হলে যে অর্থনৈতিক ফলাফল পাওয়া যায়, সেগুলি আলোচনা করুন।

২। স্টলপার-স্যামুয়েলসন তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে মেট্‌জ্‌লার কূটাভাস আলোচনা করুন।

৩। আমদানি শুল্ক এবং কোটার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

৪। (ক) অফার রেখা কাকে বলে?
(খ) কোটার সাহায্যে কিভাবে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
(গ) স্টলপার স্যামুয়েলসন তত্ত্বের মূল বক্তব্য কি?

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Salvatore : International Economics, Prentice Hall
(২) Chacholiades : International Economics, MC Grow—Hill International Editions
(৩) Caves and Jones : World Trade and Payments—An Introduction, Addison—Wesley
(৪) Sodersten and Reed : International Economics, Macmillan.
(৫) International Trade : Edited by Jagdish Bhagwati, Penguin Modern Economics Readings.
(৬) H. Robert Helleri International Trade Theory and Empirical Evidence, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
(৭) Mia Mikic : International Trade, Macmillan.

একক ৪ ❐ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভের ব্যাখ্যা

৪.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভের প্রকৃতি

৪.৪ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভ

৪.৫ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেশের মধ্যে লাভের বণ্টন

৪.৬ সারাংশ

৪.৭ অনুশীলনী

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান পৃথিবীতে কোন দেশের অর্থনীতিই আর বদ্ধ নয়। প্রত্যেকটি দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অল্পবিস্তর অংশগ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে লাভের সম্ভাবনা না থাকলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে লিপ্ত হত না। বর্তমান এককটিতে আমাদের উদ্দেশ্য হল ঃ

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি কিভাবে লাভবান হয় তা বোঝা।
- বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই লাভের প্রকৃতি কি রকম হয় তা জানা এবং
- বিভিন্ন প্রকার দেশের মধ্যে এই লাভের বণ্টন কিভাবে ঘটে তা দেখা।

৪.১ প্রস্তাবনা

অ্যাডাম স্মিথের আগে যাঁরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন সেই মারক্যান্টিলিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী সব দেশ একসঙ্গে এই বাণিজ্য থেকে লাভবান হয়না।

অ্যাডাম স্মিথই প্রথম বলেন যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে অংশগ্রহণকারী সব দেশই একসঙ্গে লাভবান হতে পারে। তাঁর এই বক্তব্যের যথার্থতা তিনি তাঁর পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্বের সাহায্যে প্রতিপাদন করেছেন। এরপর রিকার্ডো তাঁর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্বের সাহায্যে একই বক্তব্য সপ্রমাণ করেছেন। এঁদের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির লাভ কিভাবে হয়, এই লাভের প্রকৃতি কিরূপ বিভিন্ন দেশের মধ্যে লাভের বণ্টন কিভাবে ঘটে ব্যাখ্যা করলে বর্তমান পৃথিবীর দেশগুলি কেন নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে লিপ্ত তা বোঝা যাবে।

৪.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভের ব্যাখ্যা

আমরা জানি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। এই কারণে রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব অ্যাডাম স্মিথের পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। রিকার্ডোর তত্ত্বের মূল ত্রুটি হল মূল্যের শ্রমতত্ত্বের ব্যবহার। আমরা দেখেছি মূল্যের শ্রমতত্ত্ব গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব নয়। কিন্তু সুবিধাব্যয়ের ধারণার সাহায্যে যে রিকার্ডোর তত্ত্ব পুনঃস্থাপিত করা যায় তাও আমরা দেখেছি। যেহেতু রিকার্ডো স্থির ব্যয়ের ধারণার সাহায্যে তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন সেহেতু তাঁর তত্ত্বের পুনর্ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও ব্যয় স্থির ধরে নিতে হয়। সরলরৈখিক উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা স্থির সুবিধাব্যয় প্রদর্শন করে। এই সরলরৈখিক উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে রিকার্ডোর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আমরা দেখেছি বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় একটি দেশ বাণিজ্য-পূর্ববর্তী অবস্থার সঙ্গে তুলনায় দুটি দ্রব্যই বেশি ভোগ করতে পারে এবং তার ফলে সে বাণিজ্য থেকে লাভবান হয়। যদি এমন হয় যে সে একটি দ্রব্য বেশি, কিন্তু অন্যটি কম পায় তাহলে তার লাভ হচ্ছে কি না বুঝতে হলে সামাজিক নিরপেক্ষ রেখার সাহায্য নিতে হবে। যদি বাণিজ্য পরবর্তী অবস্থায় সে উচ্চতর সামাজিক নিরপেক্ষ রেখার ওপর অবস্থান করে তাহলে অবশ্যই তার লাভ হবে। রিকার্ডোর তত্ত্ব থেকে একটু সরে এসে যদি ক্রমবর্ধমান সুবিধাব্যয়ের ধারণা এবং তজ্জনিত মূলবিন্দুর দিকে অবতল উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ব্যবহার করা হয় তাহলেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। অতএব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভের সম্যক ব্যাখ্যা করবার জন্য সামাজিক নিরপেক্ষ রেখার অবতারণা প্রয়োজন।

সামাজিক নিরপেক্ষ রেখা দুটি দ্রব্যের সেই সব সমন্বয় প্রদর্শন করে যেগুলি থেকে সমাজ সমান তৃপ্তি লাভ করে। সামাজিক নিরপেক্ষ রেখার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

১। সামাজিক নিরপেক্ষ রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয় অর্থাৎ ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট হয়।

২। সামাজিক নিরপেক্ষ রেখা রেখাচিত্রের মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হয়।

৩। দুটি সামাজিক নিরপেক্ষ রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে না। যদি করে তাহলে তারা ব্যবহারযোগ্য থাকবে না।

৪। উচ্চতর রেখা নিম্নতর রেখা অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি সূচিত করে।

দুটি দ্রব্যের অসংখ্য সমন্বয়কে যদি তাদের তৃপ্তির স্তর হিসেবে সাজানো যায় তাহলে রেখাচিত্রে অসংখ্য নিরপেক্ষ রেখা অঙ্কন করা যায়। এইসব নিরপেক্ষ রেখা দ্বারা গঠিত জ্যামিতিক চিত্রকে নিরপেক্ষ মানচিত্র বলা হয়।

সামাজিক নিরপেক্ষ রেখা ও মানচিত্র ব্যক্তিগত নিরপেক্ষ রেখা ও মানচিত্রের অনুরূপ। তবে সামাজিক নিরপেক্ষ রেখার ব্যবহারে দু-একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। সমাজ বহু ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত বিভিন্ন। কাজেই দুটি দ্রব্যের কি কি সমন্বয় সমাজকে সমান তৃপ্তি দেয় তা নিরূপণ করা কঠিন। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুটি-নিরপেক্ষ রেখা যদি পরস্পরকে ছেদ করে তাহলে তারা ব্যবহারযোগ্য থাকবে না। সমাজের ক্ষেত্রে এই ছেদ করার সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। দুটি দ্রব্যের একটি বিশেষ সমন্বয় সামাজিক কল্যাণের নানা স্তর সূচিত করতে পারে—এটি নির্ভর করবে দুটি দ্রব্য কিভাবে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে তার উপর।

এই সমস্ত সমস্যা আছে জেনেও আমরা সামাজিক নিরপেক্ষ রেখা ব্যবহার করে থাকি। নিচের চিত্রে A এবং B দুটি দেশের ক্ষেত্রে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা এবং একের অধিক সামাজিক নিরপেক্ষ রেখা দেখান হল। উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা মূল বিন্দুর দিকে অবতল, কারণ আমরা ক্রমবর্ধমান ব্যয় ধরে আলোচনা করছি। A দেশের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে X দ্রব্যের উৎপাদনে এবং B দেশের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে

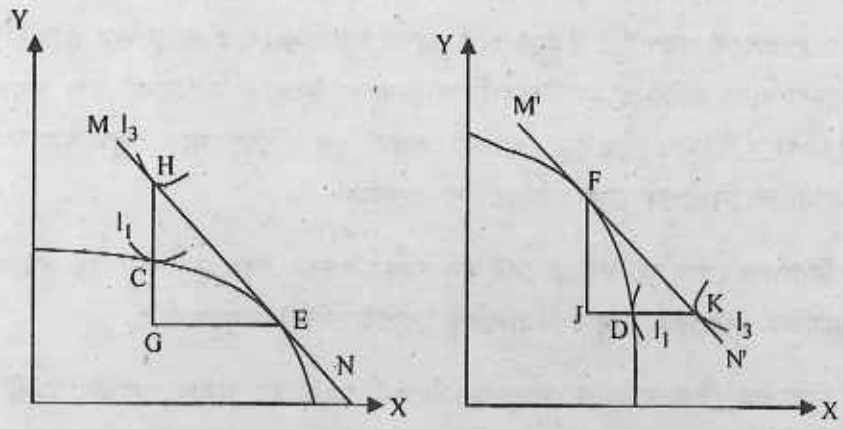

চিত্র ঃ ৪—১

Y দ্রব্যের উৎপাদনে। চিত্র ৪.১ এবং ৪.২-এ পূর্ববর্তী অবস্থায় A দেশ C বিন্দুতে এবং B দেশ D বিন্দুতে উৎপাদন ও ভোগ করছে। বাণিজ্য শুরু হলে A দেশ উৎপাদন করবে E বিন্দুতে এবং B দেশ F বিন্দুতে। তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে দুটি দেশেই বিশেষায়ন ঘটবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার MN এবং M'N' রেখার দ্বারা সূচিত হচ্ছে। একই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারে দুটি দেশ নিজেদের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করবে। দেখা যাচ্ছে A দেশ EG পরিমাণ X দিয়ে GH পরিমাণ Y নিচ্ছে B দেশের কাছ থেকে এবং এই বিনিময়ের ফলে বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় তার ভোগ সূচিত হচ্ছে H বিন্দু দিয়ে। H বিন্দু উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থান করছে। বাণিজ্যের আগে I_1 নিরপেক্ষ রেখার ওপর অবস্থিত C বিন্দুর দ্বারা A দেশের উৎপাদন ও ভোগ সূচিত হচ্ছিল। বাণিজ্যের পরে I_3 রেখার উপর অবস্থিত H বিন্দু অবশ্যই অধিকতর তৃপ্তি প্রদর্শন করছে। বাণিজ্য থেকে অতএব A দেশের লাভ হচ্ছে। একইরকমভাবে ব্যাখ্যা করলে প্রতীয়মান হবে যে B দেশেরও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে লাভ হচ্ছে। বাণিজ্যের পর B দেশও উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থান করছে এবং বেশি ভোগ করছে। এখানে আন্তর্জাতিক দাম রেখা এমনভাবে অঙ্কন করা হয়েছে যাতে দুটি দেশের আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে সমতা দেখান যায়। অর্থাৎ ওপরের চিত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য অবস্থা দেখান হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে A দেশের অভ্যন্তরীণ দাম রেখা C বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল দ্বারা সূচিত হচ্ছে এবং B দেশে অভ্যন্তরীণ দাম রেখা সূচিত হচ্ছে D বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল দ্বারা। অর্থাৎ A দেশে অভ্যন্তরীণ $^{P}x/Py$ আন্তর্জাতিক $^{P}x/Py$ অপেক্ষা কম এবং B দেশে অভ্যন্তরীণ $^{P}x/Py$ আন্তর্জাতিক $^{P}x/Py$ অপেক্ষা বেশি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার দুটি দেশের অভ্যন্তরীণ দামের অনুপাতের মধ্যে রয়েছে বলে দুটি দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে লাভবান হচ্ছে।

৪.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভের প্রকৃতি

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভ দুই প্রকারের হতে পারে—আন্তর্জাতিক বিনিময় থেকে জাত লাভ এবং আন্তর্জাতিক বিশেষায়ন থেকে জাত লাভ। আন্তর্জাতিক বাজারে বিনিময় থেকে যে লাভ হয় তাকে ভোগ সম্পর্কিত লাভ এবং উৎপাদনে বিশেষায়ন থেকে যে লাভ হয় তাকে উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ বলা যায়। ভোগ-সম্পর্কিত লাভ হল কি না বুঝতে হলে ধরে নিতে হবে যে বাণিজ্যের আগে এবং পরে একই দ্রব্য সম্মিলন উৎপাদিত হচ্ছে। এই লাভ অনুকূল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারে বিনিময়ের ফলে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ উৎপাদনে বিশেষায়নের ফল। বাণিজ্য-পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দামের অনুপাতের বিভিন্নতার ফলে উৎপাদনে যে পরিবর্তন ঘটে উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ তার থেকেই উদ্ভূত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভকে এই দুই প্রকারের লাভের সমষ্টি হিসেবে দেখার বিষয়টি নিচের চিত্রটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই চিত্রে A দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এবং একের অধিক সামাজিক নিরপেক্ষ রেখা দেখান হয়েছে। বাণিজ্যে নামার আগে দেশটি C বিন্দুতে উৎপাদন এবং ভোগ

করছে। ধরা যাক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পর উৎপাদন একই হচ্ছে অর্থাৎ দেশটি X দ্রব্যের উৎপাদনে বিশেষায়নের পথে যাচ্ছে না। বাণিজ্যের পরেও অতএব উৎপাদন C বিন্দুতেই হচ্ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক

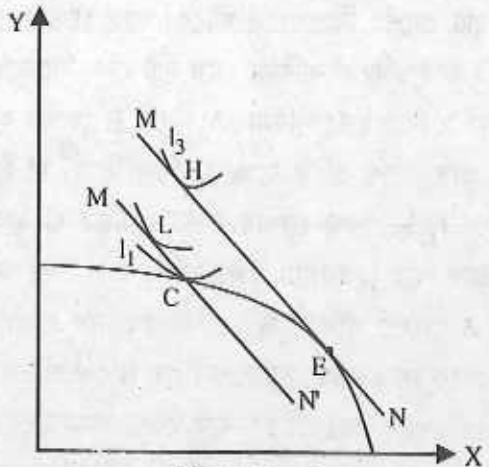

চিত্র ঃ ৪—২

বাজারে Y দ্রব্যের দাম কম হওয়ায় বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে দেশটির ভোগের পরিমাণ বাড়তে পারে। আমরা জানি যে দেশের অভ্যন্তরে দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত C বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এবং নিরপেক্ষ রেখার সাধারণ স্পর্শকের ঢাল দ্বারা সূচিত হচ্ছে। আমাদের চিত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত সূচিত হচ্ছে MN রেখার ঢাল দ্বারা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে Y এর দাম কম। কাজেই দেশটি X দ্রব্যের বিনিময়ে Y দ্রব্য নিলে তার লাভই হবে। চিত্রে M'N' রেখাটি এমনভাবে অঙ্কন করা হয়েছে যে তার ঢাল MN রেখার ঢালের সমান অর্থাৎ M'N' রেখাটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হার নির্দেশ করছে। এই M'N' রেখাটি C বিন্দুর মধ্যে দিয়ে গিয়ে I_2 নিরপেক্ষ রেখার সঙ্গে L বিন্দুতে স্পর্শক হয়েছে। C বিন্দুতে উৎপাদন হলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারে X দ্রব্যের বিনিময়ে Y দ্রব্য নিয়ে দেশটি C বিন্দু থেকে L বিন্দুতে যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে উৎপাদন হচ্ছে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার ওপর কিন্তু বাণিজ্যের ফলে দেশটির পক্ষে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার বাইরে ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। এখন C বিন্দু থেকে L বিন্দুতে যাওয়ার ফলে দেশটি I_1 নিরপেক্ষ রেখা থেকে I_2 নিরপেক্ষ রেখায় যাচ্ছে এবং অধিকতর তৃপ্তি লাভ করছে। C বিন্দু থেকে L বিন্দুতে যাওয়ার ফলে ভোগের পরিবর্তন এবং তৃপ্তির যে বৃদ্ধি ঘটছে তাকেই আমরা ভোগ-সম্পর্কিত লাভ বলব। বাণিজ্য শুরু হলে উৎপাদনে কি পরিবর্তন ঘটবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব দেশটি X দ্রব্যের উৎপাদনে তার উৎপাদনের উপকরণগুলি বেশি পরিমাণে নিয়োগ করছে কারণ X দ্রব্যের উৎপাদনে এই দেশের তুলনামূলক সুবিধা আছে। ফলে উৎপাদন ঘটছে E বিন্দুতে এবং ভোগ হচ্ছে I_3 নিরপেক্ষ রেখার উপর H বিন্দুতে। L বিন্দু থেকে H বিন্দুতে যাওয়ার ফলে ভোগের যে বৃদ্ধি ঘটছে তাকে আমরা উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ বলব। এই উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ উৎপাদনে বিশেষায়নের ফলে পাওয়া যাচ্ছে।

এভাবে প্রত্যেকটি দেশের ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত লাভকে ভোগ-সম্পর্কিত লাভ এবং উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ এই দুই প্রকারের লাভে ভাগ করে দেখান যেতে পারে। ওপরের চিত্রে C বিন্দু থেকে H বিন্দুতে যাওয়ার ফলে যে লাভ পাওয়া যাচ্ছে তা হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে পাওয়া মোট লাভ। এই মোট লাভের মধ্যে C বিন্দু থেকে L বিন্দুতে যাওয়ার ফলে প্রাপ্ত লাভ হল ভোগ-সম্পর্কিত লাভ এবং L বিন্দু থেকে H বিন্দুতে যাওয়ার ফলে প্রাপ্ত লাভ হল উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ।

৪.৪ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভ

দুটি বিশেষ অবস্থার কথা আমরা এখানে বিবেচনা করব যে দুটি অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুতি প্রদর্শন করে। প্রথম অবস্থাটিতে ধরা হচ্ছে যে, উৎপাদনের উপকরণগুলি বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে একেবারেই সচল নয়। দ্বিতীয় অবস্থাটিতে ধরা হচ্ছে যে দুটি দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত সব সময় ভোগ করা হচ্ছে। এই দুটি বিশেষ অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে কি ধরনের লাভ পাওয়া যাবে তা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

উৎপাদনের উপকরণগুলি যদি বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে সচল না হয় তাহলে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা একটি আয়তক্ষেত্র হবে। নিচের চিত্রে এইরকম একটি উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা দেখান হলো। ধরা যাক এই উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখাটি A দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা।*

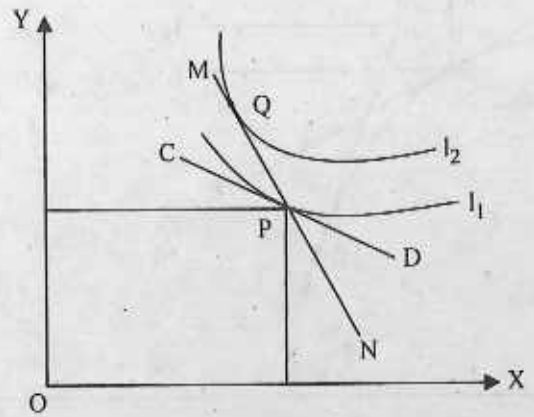

চিত্র ঃ ৪—৩

যেহেতু উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখাটি একটি আয়তক্ষেত্র সেহেতু উৎপাদন, বাণিজ্যের আগে এবং পরে, উভয়ক্ষেত্রেই p বিন্দুতে হবে। কারণ উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার আর কোন বিন্দুতে কোন নিরপেক্ষ রেখা

* এক্ষেত্রে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার পরিবর্তে উৎপাদন বিন্দুর ধারণা অধিকতর প্রযোজ্য।

স্পর্শক হচ্ছে না।[1] চিত্রে CD রেখা অভ্যন্তরীণ দাম রেখা এবং MN রেখা আন্তর্জাতিক দাম রেখা। উৎপাদন P বিন্দুতে স্থির থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে যেহেতু Y দ্রব্যের দাম দেশের অভ্যন্তরে Y দ্রব্যের দাম অপেক্ষা কম, দেশটি X দ্রব্যের বিনিময়ে Y দ্রব্য নিয়ে Q বিন্দুতে পৌঁছবে এবং লাভবান হবে। Q বিন্দু, P বিন্দু অপেক্ষা উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখার উপর অবস্থান করছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে বাণিজ্য-পূর্ববর্তী অবস্থায় উৎপাদন এবং ভোগ দুই-ই P বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছে। এখন যেহেতু উৎপাদনে বিশেষায়ন ঘটছে না সেহেতু বিশেষায়নের ফলে প্রাপ্ত লাভ অর্থাৎ উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে যে লাভ পাওয়া যাচ্ছে তা সবটাই ভোগ-সম্পর্কিত লাভ। উৎপাদন অপরিবর্তিত থেকেও শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারে বিনিময়ের ফলে প্রাপ্ত লাভ অর্থাৎ কেবলমাত্র ভোগ-সম্পর্কিত লাভই এখানেই পাওয়া যাচ্ছে।

এবার আমরা দুটি দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত সব সময় ভোগ করা হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে কি ধরণের লাভ পাওয়া যাবে দেখব। দুটি দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ভোগ করা হলে নিরপেক্ষ রেখাগুলি L আকৃতির হবে। নিচের চিত্রে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার সঙ্গে L আকৃতিবিশিষ্ট একাধিক নিরপেক্ষ রেখা দেখান হল।

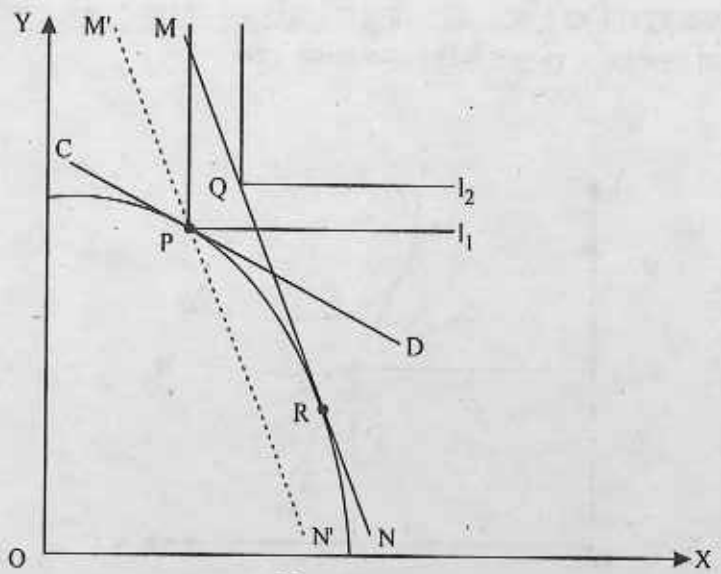

চিত্র ঃ ৪—৪

এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভোগ-সম্পর্কিত লাভ বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারে দ্রব্য বিনিময় করে কোন লাভ পাওয়া যাবে না। এখানে অভ্যন্তরীণ দাম রেখা CD, P বিন্দুতে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা, এবং I_1 নিরপেক্ষ রেখার সঙ্গে স্পর্শক হয়েছে। বাণিজ্য শুরু হওয়ার আগে উৎপাদন এবং ভোগ অতএব হবে P বিন্দুতে। উৎপাদন P বিন্দুতে স্থির রেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারে দ্রব্য বিনিময় করে উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় পৌঁছন যাচ্ছে কি না দেখতে হলে P বিন্দুর মধ্যে দিয়ে MN রেখার সঙ্গে সমান্তরাল একটি রেখা অঙ্কন

করতে হবে। ওপরের চিত্রে M'N' এরকম একটি রেখা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে M'N' রেখাটি কোন উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখার সঙ্গে স্পর্শক হচ্ছে না। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে ভোগ-সম্পর্কিত লাভ এক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন MN রেখাটি R বিন্দুতে উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার সঙ্গে স্পর্শক হয়েছে যার অর্থ হল বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় উৎপাদন হবে R বিন্দুতে। MN রেখাটি আবার উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা I_2-র সঙ্গে Q বিন্দুতে স্পর্শক হয়েছে অর্থাৎ বাণিজ্য-পরবর্তী অবস্থায় ভোগ হবে Q বিন্দুতে। দেশটি R বিন্দুতে উৎপাদন করে X দ্রব্যের বিনিময়ে Y দ্রব্য নিয়ে উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় পৌঁছচ্ছে। অতএব এক্ষেত্রে উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ পাওয়া যাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, যে দুটি বিশেষ অবস্থা আমরা বিবেচনা করেছি তার প্রথমটিতে পাওয়া যাচ্ছে কেবলমাত্র ভোগ-সম্পর্কিত লাভ এবং দ্বিতীয়টিতে পাওয়া যাচ্ছে কেবলমাত্র উৎপাদন সম্পর্কিত লাভ।

৪.৫ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেশের মধ্যে লাভের বণ্টন

দুটি দেশ A এবং B এবং দুটি দ্রব্য X এবং Y ধরে নিয়ে আমরা এবার দেখব একটি ক্ষুদ্র এবং একটি বৃহৎ দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভ কিভাবে বণ্টিত হয়। এই বণ্টন নির্ভর করবে বাণিজ্য পরবর্তী অবস্থায় উৎপাদনে বিশেষায়ন ঘটার পর দুটি দ্রব্যের ভারসাম্য দামের অনুপাত আন্তর্জাতিক বাজারে কি হবে তার ওপর। ধরা যাক A দেশটি বৃহৎ দেশ এবং B দেশটি ক্ষুদ্র দেশ। এখন X এবং Y এই দুটি দ্রব্যের জন্য সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান রেখা নির্ধারণ করে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে দুটি দ্রব্যের ভারসাম্য দামের অনুপাত কি হবে দেখাব। সামগ্রিক চাহিদা বলতে একটি দ্রব্যের জন্য দুটি দেশের মোট চাহিদাকে বোঝান হচ্ছে এবং সামগ্রিক যোগান বলতে তেমনি একটি দ্রব্যের যোগান দুটি দেশ থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে তার যোগফলকে বোঝান হচ্ছে। নিচের চিত্রে $S_x(A+B)$, X এর সামগ্রিক যোগান রেখা এবং Dx (A+B),

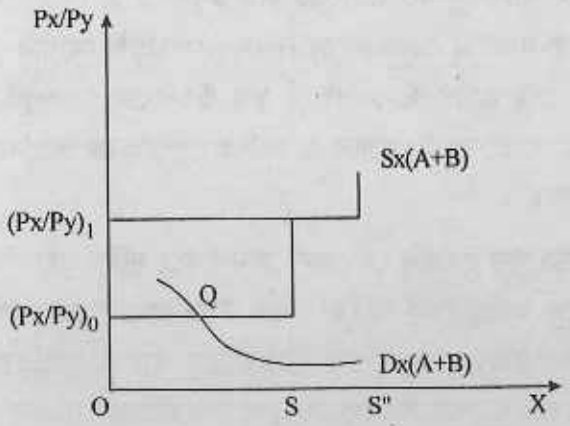

চিত্র ঃ ৪—৫

X এর সামগ্রিক চাহিদা রেখা। এই চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে X এর পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে X এবং Y এই দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত অর্থাৎ Px/Py দেখান হয়েছে। দুটি দেশই তাদের সমস্ত উৎপাদনের উপাদান X দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহার করছে ধরে নিয়ে সামগ্রিক যোগান রেখা অঙ্কন করা হয়েছে।

সুবিধাব্যয় $(Px/Py)_0$ এ স্থির থাকলে A দেশ X দ্রব্যের উৎপাদনে তার সমস্ত উৎপাদনের উপাদান নিয়োগ করে OS পরিমাণ X উৎপাদন করতে পারে। এই OS পরিমাণই হলো সর্বাধিক পরিমাণ যা A দেশ উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে SS* হলো সর্বাধিক পরিমাণ X, যা B দেশ উৎপাদন করতে পারে $(Px/Py)_1$ এই সুবিধাব্যয়ে তার সমস্ত উৎপাদনের উপাদান কাজে লাগিয়ে। দেখা যাচ্ছে OS* হলো X দ্রব্যের সর্বাধিক পরিমাণ মোট যোগান যা A এবং B দুটি দেশ তাদের সমস্ত উৎপাদনের উপাদান কাজে লাগিয়ে উৎপাদন করতে পারে। OS* X এর পরিমাণে Sx(A+B) উল্লম্ব হবে।

এখন যদি X এর সামগ্রিক চাহিদা রেখা Dx(A+B) সামগ্রিক যোগান রেখা Sx(A+B) কে O এবং S এর মধ্যে অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল অংশে ছেদ করে তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হবে $(Px/Py)_0$ এই দাম অনুপাতে। আন্তর্জাতিক বাজারে দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত অবশ্যই মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হবে। উপরের চিত্রে Dx(A+B), Sx(A+B) কে Q বিন্দুতে ছেদ করেছে। অতএব আন্তর্জাতিক বাজারে দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত হবে $(Px/Py)_0$। এই $(Px/Py)_0$-ই A দেশের অভ্যন্তরে দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত। সমস্ত উৎপাদনের উপাদান কাজে লাগিয়ে A দেশ যদি OS অপেক্ষা কম পরিমাণ Y দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে তাহলে A দেশের উচিত কেবলমাত্র X দ্রব্যই উৎপাদন করা। কিন্তু A দেশটি বৃহৎ দেশ হওয়ায় তার Y দ্রব্যের জন্য চাহিদা ক্ষুদ্রতর দেশটি পূরণ করতে পারবে না এটা বুঝে A দেশ উৎপাদনে সম্পূর্ণ বিশেষায়নের পথে যাবে না। অন্যদিকে B দেশটি কেবলমাত্র Y দ্রব্য উৎপাদন করবে। তার চাহিদা অল্প হওয়ায় তার কোন সমস্যা হবে না। এর ফলে A দেশের অভ্যন্তরীণ দাম-অনুপাতই হবে আন্তর্জাতিক দাম-অনুপাত এবং এই দাম-অনুপাতে A দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে কোন লাভ হবে না—সমস্ত লাভটাই ভোগ করবে B দেশ। সামগ্রিক যোগান রেখার যে অনুভূমিক অংশ OS এর সঙ্গে সমান্তরাল সেই অংশে A দেশের X দ্রব্য উৎপাদনে অসম্পূর্ণ বিশেষায়ন প্রদর্শিত হচ্ছে। আগেই আমরা দেখেছি যে, X দ্রব্যের উৎপাদনে A দেশের সম্পূর্ণভাবে বিশেষায়ন ঘটলে OS পরিমাণ X দ্রব্য A দেশে উৎপাদিত হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে ক্ষুদ্র হওয়াও যে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধা এনে দিতে পারে তা বোঝা গেল। ক্ষুদ্রতর দেশটিই দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত সমস্ত লাভ ভোগ করছে। এর কারণ হলো বৃহত্তর দেশটির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ দাম-অনুপাত আন্তর্জাতিক দাম অনুপাতের সমান হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ক্ষুদ্রতর দেশটি অভ্যন্তরীণ দাম-অনুপাত অপেক্ষা অনুকূল আন্তর্জাতিক দাম-অনুপাতে বাণিজ্য করতে সক্ষম হচ্ছে।

৪.৬ সারাংশ

রিকার্ডোর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আমরা দেখেছি বাণিজ্য পরবর্তী পর্যায়ে একটি দেশ বেশি ভোগ করতে পারে এবং তার ফলে সে বাণিজ্য থেকে লাভবান হয়। কিন্তু যদি একটি দ্রব্য বেশি, অন্যটি কম পাওয়া যায়, তাহলে লাভ হচ্ছে কি না বুঝতে হলে সামাজিক নিরপেক্ষ রেখার সাহায্য নিতে হয়। এই রেখা দুটি দ্রব্যের সেই সব সমন্বয় প্রদর্শন করে, যেগুলি থেকে সমাজ সমান তৃপ্তি লাভ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেশগুলিকে যে উচ্চতর সামাজিক নিরপেক্ষ রেখায় পৌঁছে দেয়, তা সহজেই প্রমাণযোগ্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই লাভ দু'রকম—আন্তর্জাতিক বিনিময় থেকে প্রাপ্ত এবং আন্তর্জাতিক বিশেষায়ন থেকে প্রাপ্ত। প্রথমটিকে বলা হয় ভোগ সম্পর্কিত লাভ, দ্বিতীয়টিকে উৎপাদন সম্পর্কিত লাভ।

দুটি বিশেষ অবস্থায় বাণিজ্যের লাভ কেমন হবে, তাও দেখান হয়েছে ওপরের আলোচনায়। একটি অবস্থায় ধরা হয়েছে যে, উৎপাদনের উপকরণগুলি একেবারেই সচল নয়। দ্বিতীয় অবস্থাটিতে দুটি দ্রব্য ভোগ করা হয়ে থাকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে। প্রথমটিতে বিশেষায়নের সুযোগ থাকছে না। তাই লাভের সবটাই ভোগ-সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভোগ সম্পর্কিত লাভের অস্তিত্ব নেই, রয়েছে উৎপাদন সম্পর্কিত লাভ।

ক্ষুদ দেশই যে অনেক সময়ে বৃহৎ দেশ অপেক্ষা বেশি লাভবান হতে পারে তাও প্রমাণ করা যায় চিত্রের সাহায্যে।

৪.৭ অনুশীলনী

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে কিভাবে লাভ পেতে পারে দেখান।

২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত লাভকে উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ এবং ভোগ-সম্পর্কিত লাভের সমষ্টি হিসেবে দেখান।

৩। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সযত্নে অনুধাবন করুন এবং সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন।

(i) দুটি দেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র এবং অপরটি বৃহৎ দেশ হলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত লাভ পাবে—

(ক) কেবলমাত্র ক্ষুদ্র দেশ।

(খ) কেবলমাত্র বৃহৎ দেশ।

(গ) বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয় দেশই।

(ii) সামাজিক নিরপেক্ষ রেখাগুলি L আকৃতির হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে যে লাভ পাওয়া যাবে তা হল ঃ

(ক) কেবলমাত্র উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ।

(গ) কেবলমাত্র ভোগ-সম্পর্কিত লাভ।

(ঘ) কোন লাভই নয়।

(iii) উৎপাদনের উপকরণগুলি বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অচল হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে যে লাভ পাওয়া যাবে তা হল ঃ

(ক) কেবলমাত্র উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ।

(খ) কেবলমাত্র ভোগ-সম্পর্কিত লাভ।

(গ) উৎপাদন-সম্পর্কিত লাভ এবং ভোগ-সম্পর্কিত লাভ দুই-ই।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Salvatore : International Economics, Prentice Hall.

(২) Chacholiades : International Economics, MC Grow—Hill International Editions.

(৩) Caves and Jones : World Trade and Payments—An Introduction, Addison-Wesley.

(৪) Sodersten and Reed : International Economics, Macmillan.

(৫) International Trade : Edited by Jagdish Bhagwati, Penguin Modern Economics Readings.

(৬) H. Robert Helleri International Trade Theory and Empirical Evidence, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

(৭) Mia Mikic : International Trade, Macmillan.

একক ১ ❐ বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং লেনদেন উদ্বৃত্ত

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩.১ লেনদেনের হিসাব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

১.৩.২ বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং চলতি খাতের হিসাব সম্পর্কে ধারণা

১.৩.৩ মূলধনীখাতে লেনদেন এবং বহির্বাণিজ্যে ভারসাম্য

১.৩.৪ লেনদেনের ভারসাম্য সর্বদাই ভারসাম্য অবস্থায় থাকে

১.৩.৫ স্বয়ংক্রিয় এবং সমন্বয়কারী লেনদেন

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত পাঠক্রমটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন।

- বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং লেনদেন উদ্বৃত্ত বলতে কি বোঝায়?
- বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং লেনদেন উদ্বৃত্তর মধ্যে সম্পর্ক।
- মূলধনী খাতে লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা।
- স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বয়কারী লেনদেনের গুরুত্ব।

১.২ প্রস্তাবনা

কোন দেশের লেনদেনের হিসাব বলতে আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য সকল দেশের অধিবাসীদের যাবতীয় লেনদেনের একটি ধারাবাহিক হিসাব। দৃশ্য রপ্তানি

এবং দৃশ্য আমদানির মধ্যে পার্থক্যকে বলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত। একতরফা পাওনা ও দেনার পার্থক্যকে বলে একতরফা দেনা-পাওনার উদ্বৃত্ত। সেবামূলক কার্যাদির রপ্তানির ও আমদানির পার্থক্যকে বলে সেবামূলক কার্যাদির উদ্বৃত্ত। এই তিনটি উদ্বৃত্তকে যোগ করলে আমরা যা পাই তাকে বলে চলতি খাতে উদ্বৃত্ত। মূলধনী খাতের পাওনা ও দেনার পার্থক্যকে বলে মূলধনী খাতের উদ্বৃত্ত। চলতি খাতের উদ্বৃত্ত এবং মূলধনী খাতের উদ্বৃত্ত যোগ করলেই আমরা পাই লেনদেনের উদ্বৃত্ত। এই ইউনিটে আমরা এই লেনদেনের উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত যাবতীয় দিক আলোচনা করব।

১.৩.১ লেনদেনের হিসাব বা Balance of Payment সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

বর্তমান বিশ্বে কোন দেশের পক্ষে নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে থাকা চলে না, নিজের অর্থনীতিকে মুক্ত করে অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করে তার জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার নিরন্তর প্রয়াস চালাতে হয়। ফলে যে কোন দেশকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হতে হয়। এখন এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আরম্ভ হয় আন্তর্জাতিক লেনদেন। আর এই লেনদেনের মধ্যে পড়ে দ্রব্য ও সেবার আমদানি ও রপ্তানি। এমনকি মূলধনের আগমন ও নির্গমনও এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরই অঙ্গ। এই সমস্ত লেনদেনের এর মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় একটি দেশের অন্যান্য দেশের কাছে দেনা ও পাওনা। আর তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে এই সমস্ত দেনা-পাওনার হিসাব সংরক্ষণ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দেনা পাওনার হিসাবকে "লেনদেনের হিসাব" বা Balance of Payments বলা হয়।

কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের সাথে অন্যান্য সমস্ত দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের ধারাবাহিক ও নিয়মমাফিক হিসাবকে সেই দেশের লেনদেন হিসাব (Balance of Payments) বলা হয়। এখানে কতগুলি সূঘম বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন আছে, যেমন একটি দেশের আদান-প্রদান বলতে আমরা কি বোঝাতে চাইছি। একটি দেশ তো একটি বিমূর্ত ধারণা। তার আদান প্রদান বলতে আমরা সেই দেশে বসবাসকারী সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কথা মনে করছি। বসবাসকারী মানুষ মানে সমস্ত নাগরিক নাও থাকতে পারে, তেমনি সেই দেশের নাগরিক নয় এমন কিছু মানুষও থাকতে পারে। দেশের নাগরিকত্ব বজায় রেখেও কিছু মানুষ প্রায় স্থায়ীভাবে অন্যদেশে বসবাস করতে পারে, এদের দ্বারা সংঘটিত দেনাপাওনাকেও আমাদের হিসেবের মধ্যে স্থান দিতে হবে, তেমনি এমন কিছু কিছু মানুষ থাকেন যারা আলোচ্য দেশের নাগরিক নন অথচ সেই বসবাস করে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেনের সাথে যুক্ত, তাদের এই সমস্ত লেনদেন সম্পর্কে। এই নীতি অনুসরণ করতে হবে প্রতিষ্ঠানের লেনদেন সম্পর্কে। এই নীতি অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির লেনদেনকে সেই দেশের লেনদেনের হিসাবে সংযুক্ত করা হয় না। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার (International Monetary Fund) বা I.M.F. এক নির্ধারিত নীতিকেই অনুসরণ করে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধরনের জটিলতাকে সরল করার উদ্দেশ্যে।

'লেনদেনের হিসাব' এর সংজ্ঞার মধ্যে আরো একটি অংশ আছে যেটিও স্বচ্ছ করে নেওয়ার প্রয়োজন থাকে। সংজ্ঞা নির্ধারণকালে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ করেছিলাম। এই সময়সীমার বিষয়টিকে দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে, যা আমরা অন্য একসময়ে বিস্তারিত আলোচনা করে নেব। তবে এটা মনে রাখার প্রয়োজন আছে নির্ধারিত সময়সীমার কাল এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ বহু ক্ষেত্রেই 'সময়সীমা'র সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। সেক্ষেত্রে এই সময়সীমার চয়ন বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩.২ বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (Balance of Trade) এবং চলতি খাতের হিসাব বা Current Account সম্পর্কে ধারণা

এখন আবার আমরা ফিরে আসি মূল বিষয়ে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক লেনদেন হিসাবের আলোচনায়। আমাদের জানা আছে যে একটি দেশের আদান-প্রদান বিভিন্ন হতে পারে। আর সমস্ত আদান-প্রদানই লিপিবদ্ধ করতে হবে এই হিসাবের মধ্যে। হিসাবরক্ষার সুবিধার্থে তাই আমরা লেনদেনগুলির একটি শ্রেণীবিন্যাস করে থাকি। 'সমস্ত দেনা' এবং 'সমস্ত পাওনা'কে প্রথমেই পৃথক করা হয় এবং দেনা ও পাওনার মূল্যকে লিপিবদ্ধ করে ব্যালেন্সটি (Balance Sheet) আকারে প্রকাশ করা হয়। এই ব্যালেন্স সীটের দুটি দিকের মধ্যেই সমস্ত দেনা-পাওনা লিপিবদ্ধ থাকে।

একটি দেশ তার উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দেশে যখন প্রেরণ করে তখন তাকে আমরা রপ্তানি বলে থাকি, তেমনি অন্যদেশের উৎপাদিত দ্রব্য যখন ঐ বিশেষ দেশে আসে তাকে বলে আমদানি। একটি দেশ যে শুধু দ্রব্যসামগ্রী যা দৃশ্যমান হয় তাই-ই রপ্তানি বা আমদানি করবে তা নয়, এমন অনেক কিছুই থাকে যা দৃশ্যমান নয় যেমন বিভিন্ন ধরনের সেবা তাও আমদানি বা রপ্তানি করে থাকে। দৃশ্য (দ্রব্যাদি) ও অদৃশ্য (সেবাকার্য) রপ্তানির মাধ্যমে সেইদেশের কিছু পাওনা হয়ে থাকে, তেমনি দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির ফলে ঐ দেশের কিছু দেনা হয়। 'পাওনা' কে দেশের আয় এবং 'দেনা' কে ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এক্ষেত্রে বলে রাখার প্রয়োজন আছে যে যখন কোন দ্রব্য বা সেবা আমদানি হয় সাথে সাথে হয় একটি দেনা, অর্থাৎ প্রাপ্তির সাথেই থাকে প্রদানের শর্ত বা দায়িত্ব, ঠিক যেমন কোন দ্রব্য বা সেবা রপ্তানি করার পাশাপাশি থাকে একটি প্রাপ্তির অঙ্গীকার। দৃশ্য রপ্তানি এবং দৃশ্য আমদানির পার্থক্য বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (Balance of trade) নামে পরিচিত। উক্ত আমদানি এবং রপ্তানি পরস্পরের সঙ্গে সমান নাও হতে পারে। যদি রপ্তানি আমদানির থেকে বেশি হয় তাহলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ধনাত্মক হবে এবং কম হলে ঋণাত্মক হবে। দৃশ্য আমদানি এবং দৃশ্য রপ্তানির মূল্য সমান হলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হবে শূন্য। অনুরূপভাবে অদৃশ্য রপ্তানি এবং অদৃশ্য আমদানির মূল্যের পার্থক্যকে বলা হয় সেবামূলক কার্যাদির উদ্বৃত্ত (Balance of Services)। কিন্তু এমন অনেক পাওনা থাকে যা একমুখী, অর্থাৎ যার পরিবর্তে কোন প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকেনা; যাকে বলে প্রতিদানহীন বা একপাক্ষিক হস্তান্তর পাওনা বা অনুদানপ্রাপ্তি। যেমন কোন একটি দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তারা যে অ-ফেরৎযোগ্য সাহায্য বা অনুদান পেয়ে থাকে। ঠিক একইভাবে অনেক দেনা থাকতে পারে যা একমুখী অর্থাৎ যার পরিবর্তে কোন প্রাপ্তির অঙ্গীকার থাকেনা। এটিকে প্রতিদানহীন এক পাক্ষিক হস্তান্তর দেনা বা অন্য দেশকে অনুদান প্রদান বলে। এইধরণের দেনাপাওনা, লেনদেন হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেনা ও পাওনা খাতে এই তিনটি বিশেষ বিভাজন দেখা যায়, এদেরকে একত্রে "চলতি খাত" বা এটিকে প্রতিদানহীন এক

পাক্ষিক হস্তান্তর দেনা বা অন্য দেশকে অনুদান প্রদান বলে। এইধরণের দেনাপাওনা, লেনদেন হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেনা ও পাওনা খাতে এই তিনটি বিশেষ বিভাজন দেখা যায়, এদেরকে একত্রে "চলতি খাত" বা Current account বলে।

১.৩.৩ মূলধনীখাতে লেনদেন এবং বহির্বাণিজ্যে ভারসাম্য

লেনদেন হিসাবে আরো একটি খাত (Account) ধরা যায়, যাকে বলে মূলধনী খাত। এই মূলধনীখাতেও থাকে একটি প্রাপ্তির দিক এবং একটি প্রদানের দিক। বিদেশ থেকে সংগৃহীত; বিদেশ থেকে ঋণ পরিশোধজনিত আয় এবং বিদেশীদের আছে সম্পত্তি বিক্রয় বাবদ আয় নিয়ে গঠিত হয় মূলধনী খাতে প্রাপ্তি (Capital Receipt) বা পাওনা। একইরকমভাবে মূলধনীখাতে প্রদান বা দেনার দিকে থাকে বিদেশকে প্রদেয় ঋণ, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয়, এবং বিদেশীদের কাছে সম্পত্তি ক্রয়জনিত প্রদেয় অর্থ বিষয়টি একটি সারণীর মধ্যে সংরক্ষিত হয়, সেইরকম একটি সারণীর উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

পাওনা 'চলতি খাত'	কোটি টাকায়	দেনা 'চলতি খাত'	কোটি টাকায়
(১) দৃশ্য রপ্তানি (দ্রব্য)	৫৫০	(৫) দৃশ্য আমদানি (দ্রব্য)	৮০০
(২) অদৃশ্য রপ্তানি (দ্রব্য)	১৫০	(৬) অদৃশ্য আমদানি (দ্রব্য)	৫০
(৩) প্রতিদানহীন বা একপাক্ষিক হস্তান্তর পাওনা দেনা	১০০	(৭) প্রতিদানহীন বা একপাক্ষিক	৮০
পাওনা মূলধনী খাত		পাওনা মূলধনী খাত	
(৪) মূলধনী প্রাপ্তি	২০০	(৮) মূলধনী প্রদান	৭০
মোট পাওনা	১০০০	মোট দেনা	১০০০

এখন বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যের বিষয়টি বিভিন্নভাবে বিভাজন করা যায়। প্রথমত আমরা শুধু দৃশ্য বাণিজ্যের বিষয়টি নিয়ে দেখতে পারি। ওপরের সারণির ১ নম্বর এবং ৫ নম্বর সারি দুটির বিয়োগফল থেকে আমরা জানতে পারি দৃশ্য বাণিজ্যে ভারসাম্য ঠিক তেমনিভাবে ২ নম্বর ও ৬ নম্বর সারির ব্যবধান থেকে ধরা পড়ে অদৃশ্য বাণিজ্যের ভারসাম্য। প্রতিদানহীন হস্তান্তরের ভারসাম্য বোঝা যায় ৩ নম্বর ও ৭ নম্বর সারির ব্যবধান থেকে। চলতি ঘাতের ভারসাম্য বোঝার জন্য আমাদের চলতি ঘাতের পাওনা থেকে চলতি ঘাতের দেনাকে বাদ দিতে হয়। সারণীর ১ নম্বর, ২ নম্বর ও ৩ নম্বর সারির যোগফল থেকে সারণীর ৫ নম্বর, ৬ নম্বর এবং ৭ নম্বর সারির যোগফলকে বিয়োগ দিয়ে বোঝা যায় যে চলতি খাতে কতটা ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত থাকছে। একই প্রক্রিয়ার ৪ নম্বর ও ৮ নম্বর সারির ব্যবধান হচ্ছে মূলধনী উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি। এখন দেখা যায় যে চলতি ঘাতে ঘাটতি বা উদ্বৃত্তের সাথে মূলধনী ঘাতের ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত যোগ দিলে যোগফল সবসময় শূন্য হবে। অর্থাৎ ১ নম্বর থেকে ৪ নম্বরের যোগফল ৫ নম্বর থেকে ৮ নম্বরের যোগফল সমান

হবে। আমরা আগেই বলেছি যে বাণিজ্যের হিসাবের মধ্যে মূলতঃ দ্রব্য সামগ্রীর দৃশ্য রপ্তানি ও দৃশ্য আমদানির বিষয়গুলি এই দুই এর পার্থক্যের ওপর দৃশ্য বাণিজ্যের হিসাব নির্ভর করে। যদি দেখা যায় দৃশ্য রপ্তানির অর্থমূল্য দৃশ্য আমদানির অর্থমূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে অনুকূল দৃশ্য বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (Favourable balance of Trade) সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে যদি দৃশ্য রপ্তানির অর্থমূল্যকে দৃশ্য আমদানির অর্থমূল্য ছাপিয়ে যায় তবে সৃষ্টি হয় প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (Unfavourable Trade Balance)। এই দুটির মূল্য কখনও কখনও সমানও হতে পারে। একইরকমভাবে চলতি ঘাতের অপর দুটি বিভাগের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতিকে পরিমাপ সম্ভব।

চলতি ঘাতের সমস্ত উপাদানগুলিকে একত্রে ধরলে যে পাওনা ও দেনার পার্থক্য পাওয়া যায় তাকে চলতিঘাতের হিসাব (Balance of Current Account) দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানি মূল্য ও প্রতিদানহীন হস্তান্তর আয়ের সমষ্টি এবং দৃশ্য-অদৃশ্য আমদানি মূল্য প্রতিদানহীন হস্তান্তর প্রদানের সমষ্টির পার্থক্যকে চলতিঘাতের হিসাব ধরা হয়, যদি এই পার্থক্য ধনাত্মক হয় তবে বলা যায় যে চলতি ঘাতের হিসাব অনুকূল (Favourable), এর বিপরীতে ঘটলে প্রতিকূল (unfavourable)। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, এই দুই এর ব্যবধান সমান হওয়াও সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে চলতিঘাতের হিসাবে সমতা আছে বলা চলে। এই চলতি ঘাত একটি নির্দিষ্ট সময়ে (বছর) সমস্ত বহমান (flow) আদান-প্রদানের হিসাবকেই সংরক্ষণ করে। চলতি ঘাতের অনুকূল উদ্বৃত্তকে নীট পাওনা, এবং প্রতিকূল উদ্বৃত্ত (ঘাটতি) কে আমরা নীট দেনা হিসাবে ভাবতে পারি। চলতি ঘাতের হিসাবকে তিনভাগে বিভাজন করে দেখানো যেতে পারে।

	কোটি টাকা
(১) বাণিজ্য হিসাব ⟶ (দ্রব্য রপ্তানি—দ্রব্য আমদানি) ⟶	— ২৫০
(২) সেবা হিসাব ⟶ (সেবা রপ্তানি—সেবা আমদানি) ⟶	— ২৫০
(৩) প্রতিদানহীন হস্তান্তর হিসাব ⟶ (প্রতিদানহীন হস্তান্তর প্রাপ্তি —প্রতিদানহীন হস্তান্তর প্রদান) ⟶	⇒ + ২০
(৪) চলতি ঘাতের হিসাব ⟶	⇒ — ১৩০

বিদেশ থেকে দেশের মধ্যে মূলধনের আগমন, দেশ বিদেশে মূলধনের বহির্গমনের হিসাব নিয়েই গঠিত হয় মূলধনী ঘাত। বিদেশ থেকে নেওয়া ঋণ, বিদেশ থেকে ঋণ পরিশোধজনিত আয়ের প্রাপ্তি, বিদেশে বা বিদেশীদের কাছে সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় মূলধনী পাওনা। অন্যদিকে বিদেশকে দেওয়া ঋণ, বিদেশী ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয়, বিদেশ থেকে বা বিদেশীদের কাছ থেকে সম্পত্তি

ক্রয়ের জন্য ব্যয়ের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় মূলধনী দেনা। পাওনা ও দেনার পার্থক্যকে লেনদেনের মূলধনী ঘাতের হিসাব বলা হয়। মূলধনী খাতের পাওনা যদি মূলধনী খাতের দেনাকে ছাড়িয়ে যায় তবে সৃষ্টি হয় অনুকূল মূলধন হিসাব বিপরীতে প্রতিকূল মুলধনী হিসাব।

চলতি ঘাতের লেনদেন ও মূলধনী ঘাতের লেনদেনের হিসাবকে একত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন (Balance of Payment) গঠন করা হয়। চলতি খাতের পাওনা ও মূলধনী ঘাতের পাওনাকে একত্রিত করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পাওনা যায়; একইরকমভাবে চলতি ঘাত ও মূলধনী খাতের দেনার যোগফল থেকে পাওয়া যায় মোট দেনা। এখন এই দুই মোট পাওনা ও মোট দেনার পার্থক্যকে লেনদেন থেকে বিষয়টি বোঝা যাক—

	কোটি টাকা
চলতি খাতের হিসাব ——→ চলতি খাতের পাওনা — চলতি খাতের দেনা =	— ১৩০
মূলধনী খাতের হিসাব ——→ মূলধনী খাতের পাওনা — মূলধনী খাতের দেনা =	+ ১৩০
লেনদেন হিসাব ——→ মোট পাওনা — মোট দেনা = (চলতি খাতের উদ্বৃত্ত + মূলধনী খাতের উদ্বৃত্ত) = — ১৩০ + ১৩০ = ০	

এখন ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোন একটি দেশের লেনদেন সব সময় ভারসাম্য অবস্থায় থাকছে। বিষয়টি অনুধাবন করতে গেলে, আমরা আরো কতগুলি বিষয় একটু বিস্তারিতভাবে জানবো। প্রথমেই আমাদের জানা দরকার 'চলতি খাত' ও 'মূলধনী খাতে'র মধ্যে কি মৌলিক পার্থক্য আছে যার জন্য আমরা দুটি পৃথক খাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন হিসাবে দেখি। চলতি খাতের লেনদেন শুধুমাত্র চলতি বছরের লেনদেনকে বোঝায়, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বছরের মধ্যে যে লেনদেন হয় তার হিসেবকেই লেনদেনের চলতি খাত হিসেবে দেখা হয়। এবং এটি জাতীয় আয়ের এবং ব্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। চলতি খাতের লেনদেনের উদ্বৃত্ত জাতীয় আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, অথবা চলতি খাতের লেনদেনের ঘাটতি জাতীয় আয় থেকে বিয়োগ করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনকে চলতি খাতের লেনদেন হিসেবে ভাবা উচিত। অন্যদিকে মূলধনী খাতের লেনদেন দেশের সম্পদকে প্রভাবিত করে। মূলধনী লেনদেনের সাথে সাথে জাতীয় সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আবার ভবিষ্যৎ আয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে মূলধনী লেনদেন চালানো হয়ে থাকে। জাতীয় আয়ের মধ্যে মূলধনী লেনদেন অন্তর্ভুক্ত নয়, ফলে জাতীয় আয়ের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

১.৩.৪ লেনদেন ভারসাম্য সর্বদা ভারসাম্য অবস্থায় থাকে

দ্বৈত হিসাব পদ্ধতি (Double entry book keeping) অনুসরণ করে লেনদেনের হিসেব রক্ষা করা হয়। ফলে প্রত্যেকটি লেনদেন উভয়দিকে অর্থাৎ 'পাওনা' ও 'দেনা'র দিকে লিপিবদ্ধ করা হয় যার জন্য সবসময়ই

মোট দেনা ও মোট পাওনা সমান হয়ে থাকে। পদ্ধতি অনুসরণের সুবাদে প্রতিটি লেনদেন দেনার দিকে দেনার বিষয় এবং পাওনার দিকে পাওনা হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়, অর্থাৎ প্রতিটি লেনদেনেই দেনা ও পাওনা লিপিবদ্ধ হচ্ছে সেই হেতু এই পদ্ধতি চালু থাকার ফলেই লেনদেনের ভারসাম্য সতত ভারসাম্য অবস্থাতেই থাকবে। কিন্তু এর মানে ভাবা উচিত নয় যে প্রতিটি লেনদেনে আলাদা করে দেনা ও পাওনার সমতা আসবে। চলতিঘাতে দেনা ও পাওনার মধ্যে সমতার অভাব থাকলে মূলধনীখাতে ও দেনা ও পাওনার মধ্যে সমতার অভাব থাকবে। চলতি ঘাতে উদ্বৃত্ত থাকলে অথবা ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত থাকবে। তবে এই দুই উদ্বৃত্ত ও ঘাটতির পরিমাণ উভয়খাতে সমান হবে এর ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য সবসময় ভারসাম্য অবস্থাতেই থাকবে।

১.৩.৫ স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বয়কারী লেনদেন

এখন আমাদের জানতে হবে কিভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের হিসাব ভারসাম্য অবস্থায় থাকে, এবং এই ভারসাম্যরক্ষাকারী বিষয়গুলি কি কি? স্বয়ংক্রিয় (autonomous) ও সমন্বয়কারী (accommodating) লেনদেনে এর বিষয়গুলি যা সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে তা একটু পরিষ্কার করা দরকার।

দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় কিছু লেনদেন থাকে। সেই লেনদেন চলতি-খাত এবং মূলধনী ঘাত উভয়ক্ষেত্রেই সম্ভব। এদের স্বয়ংক্রিয় লেনদেন বলা হয়। স্বয়ংক্রিয় লেনদেন থেকে যে 'দেনা' ও 'পাওনা' সৃষ্টি হয় তাকে স্বয়ংক্রিয় দেনা বা স্বয়ংক্রিয় পাওনা বলা হয়। স্বয়ংক্রিয় পাওনার মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ঘটে আর স্বয়ংক্রিয় দেনার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হয়। যদি দেখা যায় স্বয়ংক্রিয় পাওনার থেকে স্বয়ংক্রিয় দেনার পরিমাণ বেশি হয়ে দাঁড়ায় তবে লেনদেন হিসাবে ঘাটতি হয়, বিপরীতে হয় উদ্বৃত্ত। যখন স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য ঘাটতি হয় তখন সেই ঘাটতি পূরণের জন্য সমন্বয়কারী লেনদেনের উদ্ভব হয়। এটির উদ্ভব ব্যতিরেকে লেনদেনের সমতা আনা সম্ভব হোত না। অর্থাৎ বলা যায় স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের ফলে যদি অসমতা সৃষ্টি হয় তবে তার প্রতিরোধের এই উদ্দেশ্যে সমন্বয়কারী লেনদেন হয়ে দাঁড়ায় অবশ্যম্ভাবী। পুনরায় এই উদাহরণটির সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বয়সাধনকারী লেনদেনের ধারণাটি পরিষ্কার করে নেওয়া যাক।

পাওনা	কোটি টাকায়	দেনা	কোটি টাকায়
(১) স্বয়ংক্রিয় পাওনা	৮৭০	(৫) স্বয়ংক্রিয় দেনা	১০০০
(ক) স্বয়ংক্রিয় রপ্তানি (দৃশ্য ও অদৃশ্য)	৭০০	(ক) স্বয়ংক্রিয় আমদানি (দৃশ্য ও অদৃশ্য)	৮৫০
(খ) স্বয়ংক্রিয় প্রতিদানহীন একমুখি প্রাপ্তি	১০০	(খ) স্বয়ংক্রিয় প্রতিদানহীন একমুখী প্রদান	৮০
(গ) স্বয়ংক্রিয় মূলধনী পাওনা	৭০	(গ) স্বয়ংক্রিয় মূলধনী দেনা	৮০
(২) সমন্বয়কারী পাওনা	৮৭০	(৪) সমন্বয়কারী দেনা	০
(স্বয়ংক্রিয় + সমন্বয়কারী)	১০০০	(স্বয়ংক্রিয় + সমন্বয়কারী	১০০০

ওপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে চলতি খাতে স্বয়ংক্রিয় মোট পাওনার পরিমাণ ছিল ৮৭০ কোটি টাকা, এবং ঐ সময় একই খাতে স্বয়ংক্রিয় মোট দেনার পরিমাণ ছিল ১০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ চলতি খাতে স্বয়ংক্রিয় ঘাটতি ছিল ১৩০ কোটি টাকা। এটিকে ঋণ হিসেবে দেখতে হবে, ফলে এই ১৩০ কোটি টাকা মূলধনী খাতে সমন্বয়কারী পাওনা হিসেবে দেখতে হবে, মূলধনী খাতের মোট পাওনা ছিল ২০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৭০ কোটি টাকা স্বয়ংক্রিয়। ঐ হিসাবে মূলধনী খাতের মোট দেনা ও ৭০ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমন্বয়কারী মূলধনী দেনার পরিমাণশূন্য। এক সমন্বয়কারী ও স্বয়ংক্রিয় পাওনার সমষ্টি সমন্বয়কারী ও স্বয়ংক্রিয় দেনার সমষ্টি উভয়ের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকা ও তাহা পরস্পরের সমান, যদিও মোট স্বয়ংক্রিয় পাওনা (৮৭০ কোটি টাকা) স্বয়ংক্রিয় মোট দেনা (১০০০ কোটি টাকা) পরস্পরের সমান নয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক লেনদেনের সমতা রক্ষাকারী বিষয়টি সমন্বয়কারী লেনদেন।

১.৪ সারাংশ

কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের সমস্ত অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের ধারাবাহিক হিসেবকে লেনদেন হিসেব বলে। এই হিসেবের দুটি পৃথক দিক থাকে—'পাওনা' ও দেনা। লেনদেন হিসেবকে আবার দুটি পৃথক খাতে দেখা হয় চলতি খাত ও মূলধনী খাত। এই হিসাব প্রস্তুত করা হয় দ্বৈত হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ করে, যার ফলে দেনা ও পাওনা সব সময় সমান হয়ে লেনদেন ভারসাম্যের সমতা প্রদর্শন করে। এই হিসেবে সমতা রক্ষাকারী বিষয়গুলিকে দুটি ভাবে দেখা হয়—সমন্বয়কারী ও স্বয়ংক্রিয় বিষয়।

১.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। অদৃশ্য আমদানি এবং অদৃশ্য রপ্তানি কাকে বলে? (১.৩.২)

২। বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কাকে বলে? (১.৩.২)

৩। চলতি খাতে উদ্বৃত্ত কাকে বলে? (১.৩.২)

৪। মূলধনী খাতে লেনদেনের হিসাব বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনার জন্য কি ভূমিকা গ্রহণ করে? (১.৩.৩)

৫। স্বয়ংক্রিয় এবং সমন্বয়কারী লেনদেন এর সংজ্ঞা দিন (১.৩.৫)

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

(১) কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের হিসাব কাকে বলে? কিভাবে এই হিসাব রক্ষা করা হয় তার একটি উদাহরণ দিন।

(২) বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং লেনদেন উদ্বৃত্তর সংজ্ঞা দাও। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

(৩) কোন দেশের লেনদেন ব্যালেন্সে কমন ঘাটতি দেখা যায়? কিভাবে ঐ ঘাটতি দূর করা যেতে পারে?

(৪) স্বয়ংক্রিয় লেনদেন এবং সমন্বয়কারী লেনদেন এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন এবং ঐ পার্থক্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Bo Sodersten—International Economics.

(২) Chacholiades Miltiades : International Trade Theory and Policy.

(৩) Mead J. E. : Balance of Payments / The theory of Customs Union.

একক ২ ❐ বৈদেশিক মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজার

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩.১ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা

২.৩.২ বৈদেশিক মুদ্রার যোগান

২.৩.৩ ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ণয়

২.৩.৪ চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাত ছাড়া অন্য সকল বিষয়সমূহ যা বিনিময় হারের উপর প্রভাব ফেলে।

২.৪ বৈদেশিক মুদ্রার বাজার

২.৪.১ তাৎক্ষণিক বাজার এবং অগ্রিম বাজারের মধ্যে পার্থক্য এবং সম্পর্ক।

২.৫ পরিবর্তনশীল বিনিময়হারের সুবিধা এবং অসুবিধা

২.৬ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত পাঠক্রমটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন।

- বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে।
- বৈদেশিক মুদ্রার যোগান কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।
- বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ভারসাম্য অবস্থায় কিভাবে নির্ধারিত হয়।
- একাধিক বিষয়সমূহ যা বিনিময়হারকে প্রভাবিত করে।

- বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের গঠন।
- পরিবর্তনশীল বিনিময় হারের সুবিধা ও অসুবিধা।

১.২ প্রস্তাবনা

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হার নির্ধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব আছে। কাগজীমানের অধীনে বিনিময় হার নির্ধারণের মূল তত্ত্ব হল চাহিদা-যোগান তত্ত্ব। চাহিদা এবং যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিময়হার বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে বিনিময়হার বজায় থাকলে লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য আসে সেই বিনিময় হারই ভারসাম্য বিনিময়হার। দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে অথবা বৈদেশিক রাষ্ট্রের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বেড়ে যায়। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে বিনিময় হার তাৎক্ষণিকও স্থির হতে পারে অথবা পূর্বেই স্থির হতে পারে। আসলে পরিবর্তনশীল বিনিময়হার অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু বিনিময়হার বাইরে থেকে বেঁধে দিলে এই অনিশ্চয়তা অনেকটা দূর করা সম্ভব। উপরোক্ত বিষয়গুলি নীচের অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

২.৩.১ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা (Demand of foreign exchange)

দেশের অভ্যন্তরে দেশীমুদ্রার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলে কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য দেশী মুদ্রা ব্যবহার করা যায়না। প্রয়োজন হয় বৈদেশিক মুদ্রার। বিদেশী মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় চলে যে বাজারে তাকে বিদেশী মুদ্রার বাজারে (Foreign Exchange Market) বলে। অন্যান্য বাজারের মতো বিদেশী মুদ্রার বাজারেও এই মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়হার বা দাম নির্ধারিত হয়।

বিদেশ থেকে দ্রব্য ও সেবা আমদানি করার জন্য প্রয়োজন হয় বিদেশী মুদ্রার, অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার অন্যতম নির্ধারক বিষয় হচ্ছে আমদানি, ঠিক তেমনি দ্রব্য ও সেবা বিদেশের বাজারে রপ্তানির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় বৈদেশিক মুদ্রার যোগান। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারটির গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের উদ্দেশ্যে একটি কল্পিত উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক। ধরা যাক দুটি দেশের কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। মার্কিনী মুদ্রার নাম ডলার ($) এবং ভারতীয় মুদ্রার নাম টাকা (Rs)। এখন দেখা যাক মার্কিনী ডলারের চাহিদা কিভাবে ডলারের বিনিময়হারের ওপর নির্ভর করে। বিনিময় হার ($Rs)

অনুভূমিক অক্ষে আমরা ভারতে ডলারের চাহিদা পরিমাপ করছি, এবং উলম্ব অক্ষে দেখছি ডলারের বিনিময় হার। ডলারের চাহিদা তার বিনিময়হারের সাথে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তন হয়। যদি প্রতি ডলারের বিনিময়ে কম টাকা দিতে হয় তবে ভারতীয় মুদ্রার সমপরিমাণ আমদানির জন্য কম টাকা দিতে হবে, এর জন্য আমদানি অনুপ্রাণিত হবে এবং সেই আমদানির জন্য তখন ডলারের চাহিদা বাড়বে, তেমনি প্রতি

ডলারের জন্য যদি বিনিময়ে বেশি টাকা দিতে হয়, তবে আমদানি নিরুৎসাহিত হবে এবং ডলারের চাহিদা বিদেশী মুদ্রার বাজারে কমতে থাকবে। এই ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক আমরা DD রেখার সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করেছি (চিত্র-১ক) এক্ষেত্রে একটি বিষয়ের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিদেশী মুদ্রার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, আমদানিকৃত দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

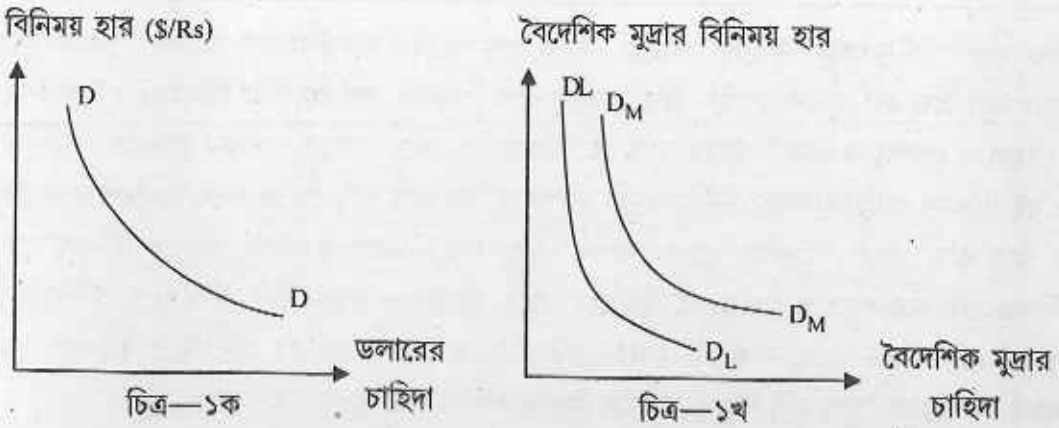

চিত্র—১ক চিত্র—১খ

আমদানিকৃত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যদি কম হয় তাহলে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন হলেও অর্থাৎ আমদানিকৃত দ্রব্যে দাম বিদেশী মুদ্রায় পরিবর্তিত হলেও আমদানি দ্রব্যের চাহিদার তেমন লক্ষণীয় পরিবর্তন হবেনা, অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার চাহিদার পরিবর্তনও ততো বেশি হবেনা, অর্থাৎ তখন বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাও কম স্থিতিস্থাপক হবে। 'বিনিময়হার' এর পরিবর্তনের সাথে সাথে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিবর্তন ঘটবে লক্ষণীয়ভাবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বৈদেশিকমুদ্রার চাহিদাও স্থিতিস্থাপক হবে। যে সমস্ত দেশ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষও আমদানি করে থাকে, এবং যে সমস্ত দেশে আমদানি প্রতিযোগী শিল্প ততো উন্নত নয়, সেখানে আমদানির স্থিতিস্থাপকতা কম, ফলে সেখানে বিদেশী মুদ্রার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও কম হবে, আবার যেখানে 'আমদানি-প্রতিযোগী' শিল্প যথেষ্ট উন্নত এবং যেখানে আমদানিকৃত দ্রব্য মূলত কম প্রয়োজনীয় অথবা বিলাসদ্রব্য সেখানে আমদানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তুলনায় বেশি হবে। ফলে সেইসব দেশে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও বেশি। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে কোন একটি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা মূলত সেই দেশের আমদানিকৃত দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ওপরেই নির্ভর করে। ওপরের চিত্র ১(ক) তে আমরা দেখিয়েছি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হারের সাথে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক, আর চিত্র ১খ এর মাধ্যমে আমরা দেখিয়েছি দুটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য কতদূর হতে পারে।

২.৩.২ বৈদেশিক মুদ্রার যোগান রেখা (Supply Curve of foreign exchange)

এবার আমরা দেখবো বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের বিষয়টি। বৈদেশিক মুদ্রার যোগান আসে দ্রব্য রপ্তানির

মাধ্যমে। অথবা যে বিদেশী মুদ্রার সাথে আলোচ্য দেশটির মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, সেই বিদেশী রাষ্ট্রটি আলোচ্য দেশটি থেকে যে দ্রব্য আমদানি করছে তার ওপর নির্ভর করছে বৈদেশিক মুদ্রার যোগনের হার কি হবে। যদি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাড়ে, তবে আলোচ্য দেশটির মুদ্রার বিনিময়হার বিদেশী রাষ্ট্রে কমে যাবে, যেমন ধরা যাক ১ ডলারের বিনিময়মূল্য যদি ৪০ টাকা থেকে বেড়ে ৫০ টাকা হয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ টাকার দাম ($^{১}/_{৪০}$) ডলার থেকে কমে ($^{১}/_{৫০}$) ডলারে পৌছাবে, ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় দ্রব্যের আমদানি বাড়বে এবং ভারতে বাড়বে ডলারের যোগান; অর্থাৎ কোন একটি দেশে যদি বিদেশী মুদ্রার বিনিময়হার বাড়ে তবে সেই দেশে বিদেশী মুদ্রার যোগান বাড়বে। একইরকম ভাবে দেখানো যেতে পারে যে ১ ডলারের দাম ৪০ টাকা থেকে কমে যদি ৩০ টাকা হয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ টাকার দাম ($^{১}/_{৪০}$) ডলার থেকে ($^{১}/_{৩০}$) ডলারে পৌঁছবে, ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে কম দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করবে, ফলে ভারতে ডলারের যোগান কমে যাবে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে ভারতীয় মুদ্রায় ডলারের বিনিময় হারের হ্রাস / বৃদ্ধির সাথ সাথে ডলারের যোগানেরও হ্রাস / বৃদ্ধি ঘটবে, বা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হারের সাথে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের সম্পর্কটি সমানুপাতিক। নীচের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি সহজেই অনুমেয়—

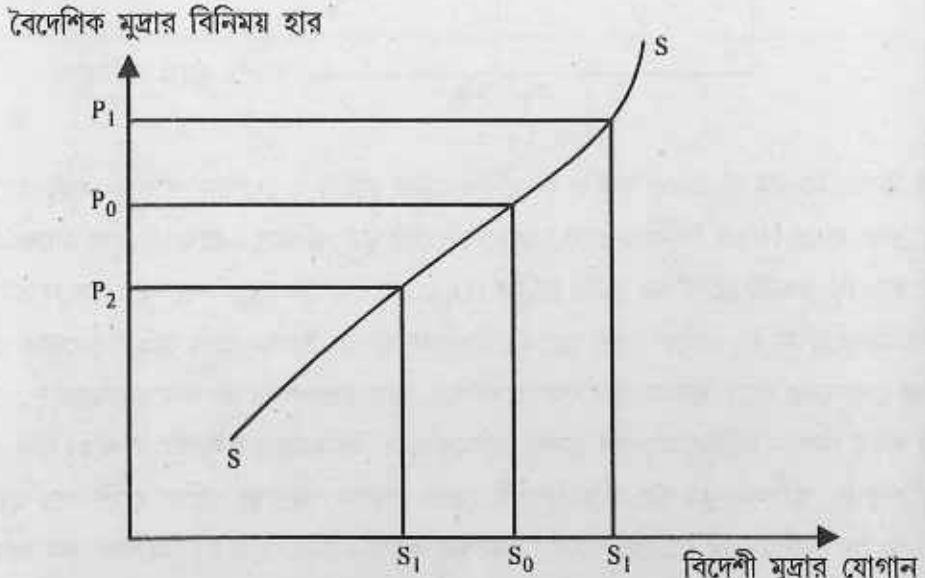

চিত্র ঃ —২

চিত্র 2 তে S-S রেখটির মাধ্যমে আমরা বিনিময়হারের সাথে বিদেশী মুদ্রার যোগানের সমানুপাতিক সম্পর্কটি দেখতে পাচ্ছি। বিনিময়হার যদি হয় P_0 তখন বিদেশী মুদ্রার যোগান S_0, বিনিময়হার বেড়ে P_1 অথবা কমে P_2 হলে বিদেশী মুদ্রার যোগান বেড়ে S_1 অথবা কমে S_2 হবে।

এখন যেহেতু বিদেশী মুদ্রার যোগানটি বৈদেশিক রাষ্ট্রটির আমদানি দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহলে তাদের আমদানির স্থিতিস্থাপকতার ওপর নির্ভর করবে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, এবং যোগানের

স্থিতিস্থাপকতাকে প্রভাবিত করা বিষয়গুলিও আমদানির স্থিতিস্থাপকতার ওপর প্রভাব স্থাপন করার বিষয়গুলি স্বাভাবিকভাবে একইরকম হবে; তাই এ নিয়ে বিশদ আলোচনা নিরর্থক। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা দেখতে চাই কিভাবে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারসাম্য বিনিময়হার নির্ধারিত হয়।

২.৩.৩ ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ণয়

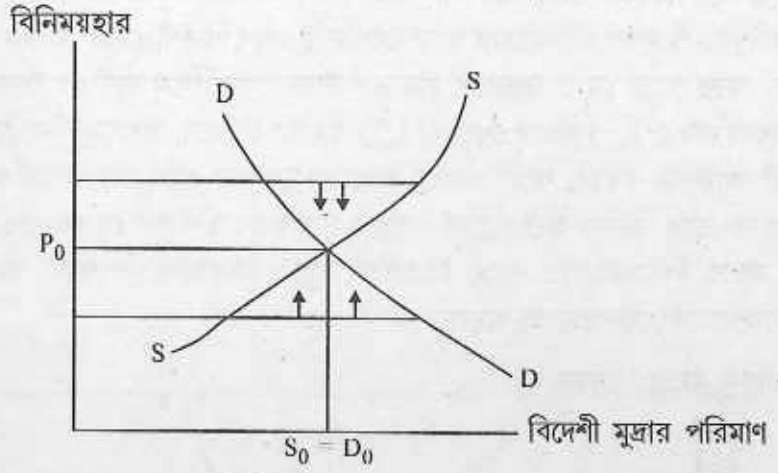

চিত্র ঃ—৩

ওপরের চিত্রের মাধ্যমে (চিত্র-৩) আমরা বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান রেখাকে একই সাথে উপস্থাপন করেছি, দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিনিময় হারে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একমাত্র যখন বিনিময় হার P_0 তখনই বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা (D_0) এবং যোগান (S_0) পরস্পরের সঙ্গে সমান হচ্ছে, যে কোন বিনিময়হার যা P_0 থেকে বেশি তাতে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান তার চাহিদার থেকে বেশি, এজন্য অতিরিক্ত যোগানের ফলে বিনিময় হার কমতে থাকবে, এবং যতক্ষণ না তা কমতে কমতে P_0 তে পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যোগান চাহিদা অপেক্ষা বেশিই থাকবে এবং বিনিময়হার কমতেই থাকবে। ঠিক তেমনিই যদি বিনিময় হার P_0 অপেক্ষা কম হয় তবে বিদেশী মুদ্রার যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হবে এবং অতিরিক্ত চাহিদার কারণে বিনিময়হার বাড়তে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিনিময়হার P_0 অপেক্ষা কম থাকবে, বিদেশী মুদ্রার বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা থেকেই যাবে এবং তার ফলে বিনিময়হার বাড়তেই থাকবে এবং অবশেষে P_0 পৌঁছানোর পর, বাজারের অতিরিক্ত চাহিদা লোপ পাবে। এইভাবে P_0 তে ভারসাম্য বিনিময়হার নির্ধারিত হবে। এই ভারসাম্য বিনিময়হার বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অবশ্যই এই প্রক্রিয়ার অনুমিত শর্ত হচ্ছে বিদেশী মুদ্রার বাজারে বিদেশী মুদ্রার ক্রেতাদের মধ্যে এবং বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

২.৩.৪ চাহিদা এবং যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া অন্য সকল বিষয়সমূহ যা বিনিময়হারের ওপর প্রভাব ফেলে

বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পরিমাণকে এখানে বিনিময়হারের ওপর নির্ভরশীল ধরা হয়, চাহিদা ও যোগানের অন্যান্য বিষয়গুলিকে এক্ষেত্রে স্থির থাকছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এখন অন্যান্য বিষয়গুলির পরিবর্তন হলে একই বিনিময়হারে মুদ্রার চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তন হতে পারে এবং তার ফলে ভারসাম্য বিনিময়হারের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। যেমন যদি আলোচ্য রাষ্ট্রটির জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে, তবে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাও বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে, তবে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাও বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে, আর তার ফলে ভারসাম্য বিনিময় হারের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটবে। ঠিক একই রকমভাবে যদি বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে ফলে ভারসাম্য বিনিময় হার কমবে বা বাড়বে। নীচের রেখাচিত্রের সাহায্যে (চিত্র-৪) আমরা বিষয়টি একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করবো।

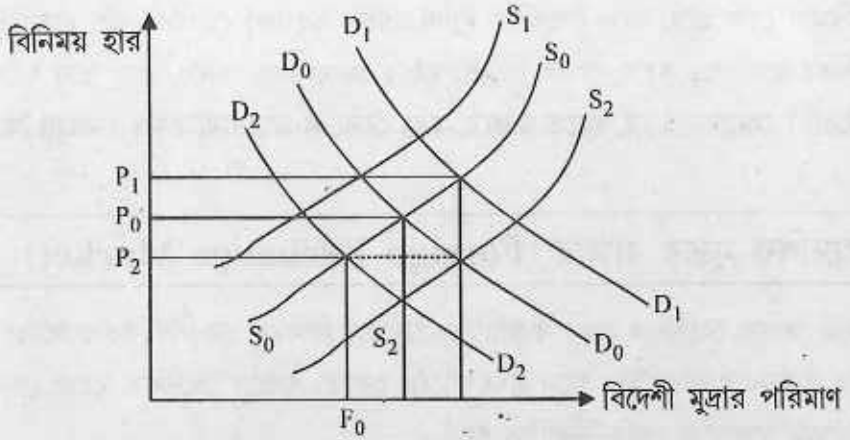

চিত্র ঃ ২.৪

ধরা যাক প্রাথমিক অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা D_0D_0 রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে, এক্ষেত্রে ভারসাম্য বিনিময় হার ছিল P_0। এখন যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাহলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে D_1D_1 হবে। এখন D_1D_1 ও S_0S_0 রেখার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারসাম্য বিনিময়হার বৃদ্ধি পেয়ে হবে P_1, একইভাবে যদি দেশের জাতীয় আয় হ্রাস পায় তাহলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা কমে যাবে যা D_2D_2 রেখার সাহায্যে দেখানো হলো। এক্ষেত্রে S_0S_0 ও D_2D_2 রেখার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারসাম্য বিনিময়হার কমে দাঁড়াবে P_2। একইভাবে বলা যায় যদি বিদেশী রাষ্ট্রটির জাতীয় আয় কমে যায়, তবে বিদেশীমুদ্রার যোগান কমে S_1S_1 হবে। এখন D_0D_0 ও S_1S_1 রেখার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারসাম্য বিনিময়হার বেড়ে দাঁড়াবে P_1. একইভাবে বিদেশী রাষ্ট্রের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে বিদেশীমুদ্রার যোগান বেড়ে যাবে, যা S_2S_2 রেখা দ্বারা দেখানো হলো এখন S_2S_2 ও D_0D_0 রেখার ঘাত-প্রতিঘাতে বিদেশী মুদ্রায় বাজারে ভারসাম্য বিনিময়হার কমে দাঁড়াবে P_2। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি বা যোগান হ্রাস পেলে বিদেশীমুদ্রার

অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়, ফলে ভারসাম্য বিনিময়হার বেড়ে যায়, অর্থাৎ দেশী মুদ্রার অবমূল্যায়ন (depriciation) অথবা বিদেশী মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি (appreciation) ঘটে। অন্যদিকে বিদেশীমুদ্রার চাহিদা হ্রাস পেলে বা যোগান বৃদ্ধি পেলে বিদেশী মুদ্রার বাজারে যে অতিরিক্ত যোগানের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পায়। একে বিদেশীমুদ্রার অবমূল্যায়ন বা দেশী মুদ্রার 'মূল্যবৃদ্ধি' বলা যেতে পারে। এখন লক্ষ্য করা যায় যে যখন বিদেশী মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে, তখন আমদানিকৃত বিদেশী দ্রব্যে দাম দেশীয় অর্থে কমে যায়, অর্থাৎ আমদানিকারী রাষ্ট্রের নিজস্ব মূল্যে তার মূল্য হ্রাস পায় ফলে আমদানির পরিমাণ বেড়ে যায়, রপ্তানি কমে যায়। এখন আমরা যদি ধরে নিই যে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যগুলি যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক হয় তবে আমদানিব্যয় বৃদ্ধি পাবে ও রপ্তানি আয় কমে যাবে যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে লেনদেনের হিসেবে লেনদেন উদ্বৃত্ত কমে যাবে বা লেনদেন ঘাটতি বেড়ে যাবে। এখন যদি একটি দেশে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকে তবে আমদানি থেকে রপ্তানির (যা অন্যদেশটির আমদানি ভাবা যেতে পারে) পরিমাণ বেশি হবে, ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হবে। এর দরুণ বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার পড়ে যাবে, অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটবে, আর তার ফলে (আমরা একটু আগেই বলেছি) লেনদেন উদ্বৃত্ত কমতে থাকবে, এবং লেনদেন ভারসাম্য ক্রমশ সমতার দিকে অগ্রসর হবে।

২.৪ বৈদেশিক মুদ্রার বাজার (Foreign Exchange Market)

এখন আমরা দেখবো বৈদেশিক মুদ্রার বাজার যেখানে তার বিনিময় হার নির্ধারিত হচ্ছে তা কতপ্রকার, এবং সেই বিভিন্ন ধরনের বাজারগুলির গঠন এবং তাদের প্রকৃতি। বাস্তবে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের প্রকৃতির পার্থক্য থেকেই বাজারের প্রকৃতি-নির্ধারিত হয়।

বিদেশী মুদ্রার ক্রেতাকে যখন অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে (সাধারণত দু দিনের মধ্যে) যদি বিক্রেতাকে বিদেশী মুদ্রার যোগান দিতে হয়, তখন সেই ধরনের বাজারকে বলে তাৎক্ষণিক বাজার বা Spot Market এবং এইরকম বাজারে তাৎক্ষণিকভাবে বিনিময়হার নির্ধারিত হয়। এই বাজারে বিদেশীমুদ্রার একজন ক্রেতা মাত্র দু-দিনের মধ্যে তার বিদেশী মুদ্রা পেয়ে যায় বা একজন বিক্রেতা মাত্র দু-দিনের মধ্যে ক্রেতাকে বিদেশী মুদ্রা সরবরাহ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে।

অন্য আরো একধরনের বাজারও বিদেশী মুদ্রা কেনাবেচার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, একে বলে অগ্রিম বাজার বা Forward Market। বিদেশী মুদ্রার বাজারে এটির গুরুত্ব অসীম। এই অগ্রিম বাজারে বিদেশী মুদ্রার বিক্রেতা একটি পূর্ব নির্ধারিত বিনিময়হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার যোগান সরবরাহ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ বা চুক্তিবদ্ধ, ঠিক তেমনিই একজন ক্রেতা একটি পূর্ব নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক

মুদ্রা কিনতে অঙ্গীকারবদ্ধ বা চুক্তিবদ্ধ। সাধারণত তিনমাসের মেয়াদে অগ্রিম কেনা-বেচার চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। তবে এর থেকে কম বা বেশি সময়ের চুক্তিও বিরল নয়।

২.৪.১ তাৎক্ষণিক বাজার এবং অগ্রিম বাজার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক

তাৎক্ষণিক বাজার ও অগ্রিম বাজার তিনভাবে পরস্পরেরর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রথণ সম্পর্কটি আসে দুটি দেশের সুদের হারের তারতম্যের (Interest arbitrage) মাধ্যমে দ্বিতীয়টি হেজিং বা কভারিং প্রক্রিয়ার মারফত এবং তৃতীয় সম্পর্কটি আসে ফাটকা (Speculation) কারবার থেকে।

তাৎক্ষণিক বাজারে বিনিময়হার সর্বত্র সমান হয়। দুটি শহরের কথা ভাবা যাক লন্ডন ও নিউইয়র্ক। দুই জায়গাতে বিনিময় হার এক, মনে করা যাক ১ পাউন্ড = ৪ ডলার কিন্তু অগ্রিম বাজারে বিনিময়হার পৃথক হতে পারে। ধরা যাক অগ্রিম বাজারের এই হার পাউন্ড = ৪.০৩ ডলার, সেক্ষেত্রে বলা যায় পাউন্ড স্টারলিং পারিতোষিক (Premium) পাওয়া যাচ্ছে, এর কারণ হিসাবে আমরা ভাবতে পারি সুদের হারের তারতম্য। যদি R_s & R_f যথাক্রমে তাৎক্ষণিক বাজার ও অগ্রিম বাজারে বিনিময়হার হয়ে থাকে এবং যদি i_e & i_a যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় সুদের হার হয়ে থাকে, তবে পারিতোষিক (Premium) p কে নীচের সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় ঃ

$$p = i_a - i_e \& i_a > i_e$$

এবং $$p = \frac{R_f - R_s}{R_s} 100 \times Rs$$

$$(i_a - i_e) = \frac{R_f - R_s}{R_s} . 100 \times Rs$$

Hedging বা Covering একটি বিকল্প সূত্র যার মাধ্যমে এই দুই বিনিময় পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমে ছোট করে Hedging বা Covering এর বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক, অগ্রিম বাজারে বিদেশী মুদ্রা কেনাবেচা হয় আগাম চুক্তিতে সেক্ষেত্রে বিনিময়হারটি চুক্তির পূর্বেই নির্ধারিত হয়, ভবিষ্যতে প্রকৃত বিনিময়হার কি হতে পারে তার ওপর একটি আগাম ধারণা করে নিয়ে কিন্তু বাস্তবে সেই হার নাও মিলতে পারে, ফলে ক্রেতা বা বিক্রেতা উভয়েই একটা ক্ষতির আশঙ্কায় থাকে, যেমন বিক্রেতা ভাবে যে মূল্যে সে বিদেশী মুদ্রা সরবরাহ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ বাজারে যদি প্রকৃত তার থেকে বেশি হয় তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আবার ক্রেতার আশঙ্কা থাকে যে মূল্যে বিদেশী মুদ্রা কিনতে সে চুক্তিবদ্ধ, প্রকৃত বিনিময় হার যদি কম হয়ে পড়ে তবে সে ক্ষতির শিকার হয়ে পড়বে। এই আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা ঐ পূর্বনির্ধারিত মূল্যে অন্যত্র আরো একটি চুক্তি সম্পন্ন করে বিদেশী মুদ্রা ক্রয় করার জন্য, এইভবে তারা অগ্রিম চুক্তির থেকে যে ক্ষতির আশঙ্কা করাচ্ছে তাকে বেড়া বা Hedge করা বা Cover করার চেষ্টা করে, একেই

Hedging বলে। পরিবর্তনশীল বিনিময়হারের উপস্থিতিতে এই বিষয়টি অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে, কারণ পরিবর্তনশীল বিনিময়হারের জন্য অগ্রিম বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের সাথে ঝুঁকির পরিমাণ বাড়ে এবং সেই ঝুঁকিকে এড়িয়ে যাবার জন্য সৃষ্টি হয় Hedging & Covering.

ভবিষ্যতে তাৎক্ষণিক বাজারে (Spot) বিনিময় হার বাড়তে পারে এই অনুমান নিয়ে অগ্রিম বাজারে বিদেশী মুদ্রা কমদামে কেনার চুক্তি করে পরে বেশি দামে তাৎক্ষণিক বাজারে বিক্রি করে মুনাফা করবে এই ধরনের অভিপ্রায় প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়, এটাই বিদেশী মুদ্রার বাজারে ফাটকা কারবার। একই উদ্দেশ্যে বহু বিক্রেতা অগ্রিম বাজারে বিক্রির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় যারা আশঙ্কা করছে তাৎক্ষণিক বাজারে ভবিষ্যতে বিনিময়হার কমবে। এইধরণের ফাটকা কারবারের মধ্য দিয়ে তাৎক্ষণিক বাজার ও অগ্রিম বাজার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে পড়ে।

২.৫ পরিবর্তনশীল বিনিময়হারের সুবিধা ও অসুবিধা

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে বিনিময় হার নিয়ে আলোচনা করলাম, তা স্পষ্টতই বোঝা যায়, যে পরিবর্তনশীল, বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বিভিন্ন বিষয় দ্বারা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে পারে এবং তার ফলে পরিবর্তন হবে বিনিময় হারের। এই পরিবর্তনশীল বিনিময়হারের কিছু কিছু সুবিধা যেমন আছে তেমনি আছে কিছু কিছু অসুবিধাও।

পরিবর্তনশীল বিনিময়হার সাধারণত বাজারের গতি প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার ইচ্ছে অগ্রাহ্য করে বিনিময়হার নির্ধারিত হয়না। এমন কি বিনিময়হার ভারসাম্যহারের আশেপাশেই থাকে, খুব বেশি বৃদ্ধি বা খুব কমে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। আবার এই পরিবর্তনশীল বিনিময়হারের জন্যেই দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য খুব বেশি ওঠা-নামা করেনা। শুধু তাই নয়, যেহেতু বাজার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিনিময়হার নির্ধারিত হয়, তার ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয় ও বিক্রয়। সরকারের আর্থিক ও ফিস্কাল নীতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত জটিলতাকেও এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়; সরকার স্বাধীনভাবে আর্থিক ও ফিস্কাল নীতি গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত খুব সাবলীলতার সঙ্গে পরিবর্তনশীল বিনিময়হার ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল, কিন্তু যুদ্ধপরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলতা দেখা যায়, এইরকম এক পরিস্থিতিতে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (International Monetary Fund বা সংক্ষেপে I.M.F.), যারা যুদ্ধ পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলতাকে দূর করতে স্থির বিনিময়হার (Fixed Exchanged rate) ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তার সদস্য রাষ্ট্রগুলির মুদ্রার বহির্মূল্য স্থির করে দেয় আর তার মধ্য

দিয়ে শুরু হয় স্থির বিনিময়হার কালের (Fixed Exchange rate regime)। এই ব্যবস্থায় এক দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময়হার বেঁধে দেওয়া হয়। বাজারে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এই হার অপরিবর্তিত থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় এই হারের পরিবর্তন বাহ্যিকভাবে না ঘটানো হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিময়হা স্থির থাকে। ঘন ঘন অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিনিময়হারের পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লে দেনের ওঠানামা ঘটতে থাকে যার ফলে সৃষ্টি হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলা, স্থির বিনিময়হার প্রতিষ্ঠার ফলে এইধরনের অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলতা বেশ খানিকটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। যার ফলে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টনের সুবিধা সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনশীল বিনিময়হারের ঘন ঘন ওঠানামার ফলে সৃষ্টি হয় বিদেশী মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের ফাটকা কারবার (Speculation), যার ফলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে যেটি অবাঞ্ছনীয়। এই অবাঞ্ছনীয় ক্রয় বিক্রয়কে রক্ষা করা সম্ভব 'স্থির বিনিময়হার' প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। তবে অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্ফীতি এই স্থির বিনিময়হার ব্যবস্থার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একটি বড়মাপের প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে এসে উপস্থিত করে। স্থির বিনিময়হার ব্যবস্থায় যে সমস্ত দেশে মুদ্রাস্ফীতির মাত্র বেশি তা অন্যান্য দেশগুলির কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলকভাবে লাভজনক অবস্থায় উপনীত হয়। এই সমস্ত কারণে, ১৯৭৩ সালের পরে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই এই ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ বের হয়ে আসতে থাকে। এই ব্যবস্থার মধ্যেই অতিরিক্ত সরকারি হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থাকে। এটিও এর একটি দুর্বলতা হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

২.৬ সারাংশ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রার ক্রয় বিক্রয়কে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার বলে। বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান নির্ধারিত হয় মূলত আমদানির বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে। এখন যে হারে দেশী মুদ্রার সাথে বিদেশী মুদ্রার আদান প্রদান হয় সেই হারকে বিনিময়হার বলে। এই বিনিময়হার স্থির অথবা পরিবর্তনশীল দুরকমেরই হয়ে থাকে। পরিবর্তনশীল বিনিময়হার নির্ধারিত হয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে। যখন একদেশের মুদ্রার সাথে অন্যদেশের মুদ্রার বিনিময়হার বাইরে থেকে বেঁধে দেওয়া হয় তখন তাকে স্থির বিনিময়হার বলে। পরিবর্তনশীল বিনিময়হার অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, এবং এর থেকে বিদেশীমুদ্রার বাজারে ফাটকা কারবার মাথা চাড়া দিতে পারে, শুধু তাই নয় এই ব্যবস্থায় মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনাও প্রবলভাবে উপস্থিত থাকে। এই কুপ্রভাবগুলি কিন্তু স্থির বিনিময়হারে অনুপস্থিত।

২.৭ অনুশীলনী

১। বিনিময়হার কাহাকে বলে?

২। বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

৩। বৈদেশিক মুদ্রার যোগান কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৪। চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাত কিভাবে একটি অর্থনীতির বিনিময়হার নির্ধারিত হয়?

৫। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে, তাৎক্ষণিক বাজার এবং অগ্রিম বাজারের মধ্যে সম্পর্ক কি?

৬। পরিবর্তনশীল বিনিময়হারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি?

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Bhagawati Jagdish (Ed) International Trade.

(২) Bo Sodersten : International Economics.

(৩) Tinbekgen Jan : International Economic Integration.

একক ৩ ❐ লেনদেন ভারসাম্যর সমতা আনয়ন ধারা বিষয়সমূহ

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ লেনদেন ভারসাম্যের ভারসাম্যহীনতা দূর করার বিভিন্ন পদ্ধতি

৩.৩.১ স্বর্ণমান পদ্ধতির উপস্থিতি

৩.৩.২ ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির মাধ্যম

৩.৩.৩ ব্যয় হ্রাস নীতি ও ব্যয় অপসারণ নীতি সম্পর্কে ধারণা

৩.৩.৪ ব্যয় হ্রাস নীতি

৩.৪.১ অবমূল্যায়ন : স্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টিকোণ

৩.৪.২ অবমূল্যায়ন : পরিশোষণের দৃষ্টিভঙ্গি

৩.৪.৩ অবমূল্যায়ন এবং বাণিজ্য হার

৩.৪.৪ অবমূল্যায়ন এবং পূর্ণ নিয়োগ পরিস্থিতি

৩.৫ প্রত্যক্ষ পরিশোষণ প্রভাবকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিষয়সমূহ

৩.৬ লেনদেন ব্যালেন্সের ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত পাঠক্রমটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন।

- লেনদেন ভারসাম্যর ভারসাম্যহীনতা দূর করার একাধিক পদ্ধতি
- অবমূল্যায়নের সংজ্ঞা
- বিনিময়হারের অবমূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা
- অবমূল্যায়নের ফলে অর্থনীতিতে প্রভাব

৩.২ প্রস্তাবনা

হিসাবশাস্ত্রের গঠনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন এর ভারসাম্য সবসময় সাম্য অবস্থায় থাকে; কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা ভারসাম্য অবস্থা বলতে রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের ব্যবধানকে বুঝি। যখন দেখা যায় ক্রমাগতভাবে রপ্তানি আয় থেকে যে পাওয়া সৃষ্টি হয় তার থেকে যদি আমদানি ব্যয় জনিত দেনা বেশি হয়ে যায় তবে সৃষ্টি হয় ঘাটতি বা লেনদেন প্রতিকূল উদ্বৃত্ত। অর্থাৎ তখন আন্তর্জাতিক লেনদেন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, এই অবস্থার স্থির বিনিময়হারে সৃষ্টি হয় এক জটিল অবস্থা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে? আমরা জানি যে কোন দেশের রপ্তানি কত হবে, সেটি, অন্য যে দেশগুলির সাথে এই দেশটি বাণিজ্যে লিপ্ত আছে তাদের জাতীয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল। ঐসমস্ত দেশের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সাথে তাদের আমদানির চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এই বিশেষ দেশটির রপ্তানির চাহিদা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে, অন্যদিকে অন্যান্য দেশগুলিতে যদি আমদানি-পরিবর্ত দ্রব্য সম্ভারের দাম বৃদ্ধি পায় তবে একইভাবে তাদের আমদানির চাহিদার বৃদ্ধি ঘটবে। ফলে উৎসাহিত হবে এই বিশেষ দেশটির রপ্তানি। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি কোন একটি দেশের রপ্তানি আয়ের হ্রাস / বৃদ্ধি অর্থাৎ লেনদেনের পাওনা শুধু সেই দেশটি আর্থিক চলরাশি (Economic Variables) গুলির ওপর নির্ভর করেনা, বাণিজ্যে লিপ্ত অপরাপর দেশগুলির আর্থিক চলরাশিগুলি দ্বারাও প্রভাবিত হয়। আভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্য-স্ফীতিও (Inflation) অনেক ক্ষেত্রে লেনদেন ভারসাম্যকে ভারসাম্যহীন করে তুলতে পারে। কেইনসীয় (Keynes) মতবাদ অনুযায়ী কার্যকরী চাহিদা (Effective Demand) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। প্রথম চাহিদা বৃদ্ধিজনিত কারণে আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি হয় আর তার ফলে আমদানির পরিবর্তন হয়, দ্বিতীয়ত মূল্যস্তর আভ্যন্তরীণ বাজারে বৃদ্ধি পেলে, আমদানি-প্রতিযোগী শিল্পের দ্রব্য সমষ্টির চাহিদা হ্রাস পায় এবং আমদানি বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণে রপ্তানি আয়ের হ্রাসেরও সম্ভাবনা থাকে। ফলে ঘাটতি দেখা দিতে পারে বা ঘাটতির হার বৃদ্ধি পেতে পারে। অনেক অর্থনীতিবিদ্ আরো একরকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যেটিকে কাঠামোগত (Structural Explanation) ব্যাখ্যা বলে যেতে পারে। ধরা যাক সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতি অনুপস্থিত, কিন্তু রপ্তানিযোগ্য শিল্পটির মূল্যবৃদ্ধি অন্যান্য শিল্পের তুলনায় অনেক বেশি ফলে এই দেশে ঐ শিল্প দ্রব্যটির আমদানি বৃদ্ধি পাবে লেনদেনের ঘাটতির জন্য মূলত দায়ী থেকে যাবে। অবশ্যটি সাধারণ ভারসাম্য (General Equilibrium) ধারা উপযোগী তত্ত্ব নয়, এটিকে আংশিক (Partial) ধারার বিশ্লেষণ হিসেবে পরিচালনা করা হয়।

নিম্নে আমরা এই ভারসাম্যহীনতা দূর করার একাধিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

৩.৩ লেনদেন ভারসাম্যর ভারসাম্যহীনতা দূর করার বিভিন্ন পদ্ধতি

এখন দেখা যাক কিভাবে লেনদেনের এর এই ভারসাম্যহীনতা বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে এই ভারসাম্যহীনতা দূর করা হয়; অবশ্য নীতি নির্বাচনের ক্ষেত্রটি নিরপেক্ষ নয়, পরিস্থিতি ও পরিবেশের রকমফেরে এটি সুনির্দিষ্ট।

৩.৩.১ স্বনির্মাণ পদ্ধতির উপস্থিতিতে (Gold Standard System)

স্বর্ণমানে কোন দেশের অর্থমূল্য স্বর্ণের মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে স্বর্ণের মূল্যকে স্থির করা হয়। এই অবস্থায় প্রতিটি দেশের অর্থমূল্য সুনির্দিষ্ট ও স্থির। অবমূল্যায়ন (Devaluation) বা মূল্যবৃদ্ধির (Revaluation) মাধ্যমে এক্ষেত্রে বিনিময়হারের তথা অর্থের মূল্য কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন ঘটানো হয়। এখন স্থির বিনিময়হার ও স্বর্ণমানের উপস্থিতি কোন একটি দেশে যদি কোনভাবে লেনদেন ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে কিভাবে তা শোধরানো যায়, তা আমরা দেখাবো। এই পরিস্থিতিতে সে দেশের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সংকোচনশীল আর্থিক নীতি গ্রহণ করতে পারে।

৩.৩.২ ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির মাধ্যমে (Increasing Bank Rate)

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার ব্যাঙ্ক রেটের বৃদ্ধির মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ চাহিদাকে কমিয়ে আনতে পারে। ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির সাথে বাজারে সুদের হার বেড়ে যাবে, ফলে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে। ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারে সামগ্রিক চাহিদার অভাবে আমদানিও হ্রাস পাবে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে প্রকারান্তরে বাজারে সুদের হার বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবে যা ব্যাঙ্ক সৃষ্ট ঋণকে নিয়ন্ত্রিত করবে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি টাকার যোগানকে কমিয়ে দেয় তবে উৎপাদন ব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়বে। এমনকি

নিয়োগ হ্রাসের সম্ভাবনাও থাকবে। ফলে টাকার অঙ্কেও জাতীয় আয় কমে, আমদানি কমাতে সক্ষম হবে, যা পরিশেষে আন্তর্জাতিক লেনদেন ঘাটতিকে কমিয়ে ফেলতে সাহায্য করবে এবং ক্রমশ তা ভারসাম্য অবস্থার দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে। ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির ফলে বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পাবে, যা সঞ্চয়কে অনুপ্রাণিত করবে, এবং মূলধনের গতিশীলতার জন্য তা বিদেশী মূলধনকে আলোচ্য দেশটিতে প্রবেশ করতে অনুপ্রাণিত করবে। মূলধনের আন্তর্জাতিক গতিময়তা এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বর্ণমানের যুগে লেনদেন ভারসাম্য রক্ষা করা ছিল আর্থিক নীতি চয়নের পেছনে অন্যতম অভিলক্ষ্য, অবশ্য আজকের দুনিয়ায় প্রতিটি রাষ্ট্র আরো বেশি উচ্চকাঙ্ক্ষী ভারসাম্যের সমতা রক্ষা ছাড়াও আরো অনেক বেশি উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় আর্থিক নীতি চয়নের ক্ষেত্রে। বর্তমান বিশ্বের বহিঃসমতা ছাড়াও অভ্যন্তরীণ পূর্ণ নিয়োগ (Full Employment) অবস্থা বজায় রাখাও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

৩.৩.৩ ব্যয় হ্রাস নীতি (Expenditure Reducing Policy) ও ব্যয় অপসারণ নীতি (Expenditure Switching Policy-র সম্পর্কে ধারণা

সাময়িকভাবে যদি আমরা মূলধনের স্বয়ংক্রিয় চলাচল (automatic capital movement) কে উপেক্ষা করি তবে লেনদেনের ভারসাম্যকে দেখা যায় আভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন ও মোট ব্যায়ের পার্থক্য হিসাবে। সাঙ্কেতিকভাবে বলা যায় যে $B = Y - E$. যেখানে B হচ্ছে নীট লেনদেন উদ্বৃত্ত এবং Y ও E হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়। যখন Y, E অপেক্ষা বড় হয় তখন লেনদেনে নীট উদ্বৃত্ত থাকে যা অনুকূল পরিস্থিতি হিসাবে পরিগণিত হয়। অন্যদিকে যদি E, Y অপেক্ষা বড় হয় তখন লেনদেনে নীট ঘাটতি হয়, যা প্রতিকূল বাণিজ্য পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে। এখন উদ্বৃত্ত বা ঘাটতিকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং ভারাসাম্যের সমতাকে রক্ষা করার জন্য দুটি নীতিকে কার্যকর করা সম্ভব—উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করা অথবা ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত করা। লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি অবস্থা থাকলে 'আয়বৃদ্ধি' অথবা ব্যয়সংকোচন এই দুই নীতির মধ্যে স্বল্পকালীন অবস্থায় যেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা একটি উর্ধ্বসীমার প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে, সেইহেতু 'ব্যয় সংকোচনের' নীতিই তুলনামূলকভাবে অধিক কার্যকরী। এই ব্যয়সংকোচন নীতি দু-ভাবে কার্যকরী করা যায় (১) ব্যয় হ্রাস নীতি (Expenditure Reducing Policy) (২) অপসারণ নীতি (Expenditure Switching Policy)

৩.৩.৪ ব্যয় হ্রাসের নীতি (Expenditure Reducing Policy)

ব্যয় হ্রাসের নীতিকে দু-ভাগে প্রয়োগ করা যায়। প্রথমত সরকার তার আর্থিক নীতি (Monetary Policy) কে হাতিয়ার করে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারে। অন্যথায় সরকার তার 'আয়-ব্যয়' নীতির (Fiscal Policy) পরিবর্তন ঘটিয়েও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে। প্রথমে আমরা দেখবো লেনদেন ভারসাম্য

ঘাটতিকে দূরীভূত করতে কিভাবে আর্থিক নীতির ব্যবহার করা যায়। আর্থিক নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি হাতিয়ার বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। প্রথমটি হলো ব্যাঙ্ক রেট ও দ্বিতীয়টি হলো খোলাবাজারের কারবার (Open market operation)। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বিনিময়বিল (Bill of Exchanges) গুলিকে বাট্টা (Discount) করে থাকে, সেই হারকে ব্যাঙ্ক রেট বলা হয়। এই ব্যাঙ্ক রেটের বৃদ্ধি ঘটিয়ে বাজারে সুদের হারের বৃদ্ধি ঘটানো যায়। বাজারে সুদের হার বাড়লে, বিনিয়োগ বেড়ে যাবে বলে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেবে। এছাড়া সুদের হার বাড়লে সমন্বয় এর পরিমাণ বাড়বে এবং ভোগের পরিমাণ কমবে। অন্যদিকে বিনিয়োগ হ্রাসের ফলে উৎপাদন এবং আয় হ্রাস পাবে, যেহেতু আমদানি আয়ের পরিবর্তনের সাথে একই দিকে পরিবর্তিত হয়, তাই আমদানিও হ্রাস পাবে। আমদানি, ভোগ ও বিনিয়োগ সমস্ত হ্রাস পাবার মধ্য দিয়ে 'E' বা মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয় কমে গিয়ে ঘাটতির পরিমাণকে কমিয়ে আনবে।

আর্থিক নীতির দ্বিতীয় হাতিয়ার 'খোলা বাজারের কাজকর্ম' কিভাবে কার্যকরী হয় এবার তা দেখা যাক। খোলাবাজারের কাজকর্ম বলতে আমরা বুঝি যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে ঋণপত্র (Bonds) ক্রয় বা বিক্রয় করতে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে তখন দেশের জনগণ ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সেই ঋণপত্র ক্রয় করে থাকে। এর দরুন জনগণ ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অর্থের পরিমাণ কমে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে ঋণযোগ্য অর্থের তহবিলের সংকোচন ঘটে। ঋণ সংগ্রহ তখন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে বিনিয়োগ যথেষ্ট উৎসাহ পায় না। বাজারে ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্রের যোগান বাড়িয়ে তোলে ফলে ঋণপত্র বা বন্ডের দাম কমে যায় অর্থাৎ বাজারে তখন সুদের হার বেড়ে যায়। এর ফলে বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং সাথে সাথে উৎপাদন, আয় এবং আমদানিও হ্রাস পায়, এইভাবে সরকার তার আর্থিক নীতির সহায়তায় ব্যয় হ্রাসের নীতিকে কার্যকরী করে।

ব্যয় হ্রাস নীতি (Expenditure reducing Policy) রূপায়ণের আরো একটি অন্যতম ব্যবস্থা হল সরকারি আয়-ব্যয় নীতির (Fiscal Policy) প্রণয়ন। সরকারি আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতিতে দুটি দিক আছে—(১) আয় সংক্রান্ত নীতি ও (২) ব্যয় সংক্রান্ত নীতি। সরকারি আয় বৃদ্ধি বা ব্যয় হ্রাস হল এই নীতিগ্রহণের পেছনে মূল লক্ষ্য। সরকারি আয় বলতে আমরা প্রধানত বুঝি কর (Tax) সংগ্রহ। এই কর (Tax) আবার দুরকমের প্রত্যক্ষ কর (Direct tax) এবং পরোক্ষ কর (Indirect tax)। বিভিন্ন ধরনের আয়কর প্রত্যক্ষ করের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যক্ষ করের বৃদ্ধি ঘটিয়ে সরাসরি জনসাধারণের ব্যয়যোগ্য আয় (Disposable Income) কে কমিয়ে দিয়ে ভোগ ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, এই ভোগব্যয়ের একটি অংশ হচ্ছে আমদানি ব্যয়, খুব স্বাভাবিকভাবে আমদানিব্যয়ও কমে আসবে। অন্যদিকে পরোক্ষ করের প্রভাবও পরিশেষে একই রকম হবে। পরোক্ষ কর ভোগ্য পণ্যটির দাম বৃদ্ধি করে সেই দ্রব্যগুলির ভোগকে নিয়ন্ত্রিত করে। এর ফলে মোট ব্যয় (E) হ্রাস পায়।

এছাড়া সরকারি ব্যয়কে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেও একই লক্ষ্যে পৌছানো যায়। অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশে সরকারি ব্যয় মোট ব্যয়ের প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ, আবার সরকারি ব্যয়ের একটি বড়ো অংশ হল হস্তান্তর পাওনা বিশেষ (Transfer payment) যেমন বেকারভাতা, অবসরভাতা এবং দরিদ্রব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার সাহায্য প্রদান। এই সমস্ত 'হস্তান্তর পাওনা' প্রাপকরা মূলত নিম্ন আয় শ্রেণীভুক্ত; যাদের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (Marginal propensity to consume) খুব বেশি। এমন এই হস্তান্তর খাতে যে সরকারি ব্যয় তা যদি প্রত্যক্ষভাবে ছাঁটাই করা হয় তবে সরকারি ব্যয় হ্রাস পাবে। এরফলে এক দিকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় কমবে, অন্যদিকে সরকারি ব্যয় ছাঁটাই এর ফলে 'গুণক' (Multiplier) প্রক্রিয়ায় দেশের মধ্যে আয়ের সঙ্কোচন ঘটাবে, যার ফলে আমদানি ও ভোগ ব্যয় উভয়েই কমে গিয়ে মোট ব্যয় (E) এর হ্রাস হবে এবং যা বাস্তবিকই লেনদেন ঘাটতি (B) কে কমিয়ে দেবে।

সরকারি আয় ব্যয় সংক্রান্ত নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করলে তা আর্থিক নীতির চেয়েও বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। আর্থিক নীতির সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে অনেকগুলি 'যদি'র (ifs) উপস্থিতি থাকে, যেমন সুদের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিয়োগ হ্রাসের বিষয়টি বিনিয়োগের স্থিতিস্থাপকতার মান নিরপেক্ষ নয়। এবং বহুমনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রভাব এখানে অনস্বীকার্য। সরকারি কর বৃদ্ধি বা ব্যয় হ্রাসের ফলে যে আয় ও উৎপাদন সংকোচন হবে তাতে আমদানি হ্রাস পাওয়া ছাড়াও দেশের মধ্যে নিয়োগহীনতা বৃদ্ধি পাবে যার ফলে মজুরী ও অন্যান্য উপকরণের দাম হ্রাস পাবে উৎপাদন ব্যয় কমে আসবে, যার ফলে আমদানি প্রতিযোগী শিল্প ও রপ্তানিযোগ্য শিল্পের উৎপাদন আরো বেশি একে অপরের প্রতিযোগী হয়ে উঠবে, যা একই সাথে আমদানি কমাতে ও রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করবে অর্থাৎ লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি আরো নিশ্চিতভাবে কমে আসবে।

৩.৩.৫ ব্যয় অপসারণ পদ্ধতি (Expenditure Switching Policy) এবং অবমূল্যায়ন বা Develuation

পরবর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে আমরা ব্যয়হ্রাসের বিকল্প হিসেবে ব্যয় অপসারন নীতি (Expenditure Switching Policy) সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। এই নীতির মাধ্যমে আমদানি ব্যয়ের অপসারণ ঘটিয়ে আমদানি প্রতিযোগী শিল্পে ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটানো হয়ে থাকে। এর ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বেড়ে যায়, যদিও এই বৃদ্ধির ফলে আবার আভ্যন্তরীণ ভোগ ব্যয় বেড়ে যায় তবে এই বৃদ্ধি আমদানি আয়ের তুলনায় কম হওয়ার দরুন মোট ব্যয়ের সঙ্কোচনও হয়। তাই ব্যয় অপসারণ নীতির মাধ্যমে আমরা ব্যয় হ্রাসও ঘটাতে পারি। এই ব্যয় অপসারণ নীতির মূল চাবিকাঠি হল আমদানি ও রপ্তানির দ্রব্যের বিনিময়ের জন্য আপেক্ষিক মূল্যের (Relative Policy) পরিবর্তন ঘটানো। যদি আমদানি দ্রব্যের তুলনামূলক দাম বেড়ে

যায় অর্থাৎ রপ্তানি দ্রব্যের তুলনামূলক দাম কমে যায় তাহলে আমদানি কমে যাওয়া ও রপ্তানি বেড়ে যাওয়ার সুযোগ আসে যা ঘাটতি কমিয়ে আনার সহায়ক। এখন এই তুলনামূলক দামের পরিবর্তনের অন্যতম উপায় হচ্ছে দেশী মুদ্রার বহির্মূল্য কমিয়ে আনা, যাকে অবচয়ন (Depreciation) বা অবমূল্যায়ন (Devaluation) বলা হয়ে থাকে। সাধারণত অবচয়ন বা অবমূল্যায়ন শব্দ দুটি সমার্থক। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দুটির মধ্যে সংজ্ঞাগত পার্থক্য থাকতে পারে প্রথমেই, বিস্তারিত আলোচনার আগে আমরা অবচয়ন ও অবমূল্যায়ন এই দুটি শব্দের সংজ্ঞাগত ও ধারণাগত মূল্য পার্থক্যটি বুঝে নেবার চেষ্টা করি। অবচয়ন বা Depreciation বলা হয় সেই অবস্থাকে যখন কোন একটি দেশের মুদ্রার মান বা মূল্য অন্য একটি দেশের মুদ্রার তুলনায় কমিয়ে আনা হয়। অপরদিকে অবমূল্যায়ন বা Devaluation বলা হয় এমন একটি পরিস্থিতিকে যখন একটি দেশের মুদ্রার স্বর্ণের ভিত্তিতে মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়, যেমন ১০০ টাকার বিনিময়ে যতটা স্বর্ণ দাবি করা যেত তা যদি কমিয়ে দেওয়া হয়, তবে বলা যায় যে টাকার অবমূল্যায়ন বা Devaluation করা হল। এখন যদি স্বর্ণের মূল্য স্থির থাকে তবে কোন একটি দেশের মুদ্রার অবচয়ন ঘটানো মানেই সেই মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো। আবার এমন যদি হয় সমস্ত দেশগুলি যদি তাদের মুদ্রার সমহারে অবমূল্যায়ন ঘটায় তবে কিছু মুদ্রায় অবচয়ন হচ্ছে না অর্থাৎ অবমূল্যায়ন মানেই অবচয়ন না-ও হতে পারে। অবশ্য বর্তমান আলোচনায় আমরা কোনরকম দ্বিধার অবকাশ রাখতে চাইনা, অবচয়ন ও অবমূল্যায়নকে পরস্পরের সমার্থক প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করবো।

অবমূল্যায়নের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে তুলনামূলক দামের পরিবর্তন হবে, দেশী মুদ্রায় আমদানিকৃত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে আমদানির পরিমাণ কমে যাবে এবং আমদানি পরিবর্ত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়বে, অন্যদিকে অবমূল্যায়নের ফলে, রপ্তানিকারকদের সমপরিমাণ রপ্তানি বাবদ দেশী মুদ্রায় বেশি অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে, যা রপ্তানিকে উৎসাহ বর্ধন করবে, এখন খুব স্বাভাবিকভাবে রপ্তানিকারকেরা রপ্তানি দ্রব্যে দাম বিদেশী মুদ্রায় কমিয়ে দিয়ে রপ্তানির বাজারের প্রসার ঘটাতে পারবে। কিন্তু ঠিক কতটা পরিণাম রপ্তানি প্রসার সম্ভব হবে তা সরাসরি বলা যাবে না। এটি মূলত নির্ভর করবে রপ্তানিগত দ্রব্যগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ওপর।

৩.৪.১ অবমূল্যায়ন : স্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টিকোণ

চিরায়ত ধারণা অনুযায়ী বাণিজ্য ঘাটতিতে অবমূল্যায়নের প্রভাব স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর। অবশ্য ভিন্ন একটি মতবাদও আছে। যেটিকে বলা হয় পরিশোষণ (Absorption approach) পদ্ধতি। প্রথমে আমরা অবমূল্যায়নের প্রভাব আলোচনা করবো স্থিতিস্থাপকতার প্রভাব অনুযায়ী। স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে অবমূল্যায়নের প্রভাবের চিরায়ত ধারণাটির মূল প্রবক্তা দুই অর্থবিজ্ঞানী—মার্শাল এবং লার্নার। বাস্তবে মার্শাল-লার্নার শর্ত হিসেবে এটি পরিচিত। এই শর্ত অনুযায়ী কোন একটি দেশের রপ্তানি দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং সেই দেশটির আমদানি দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার যোগফল যদি একের থেকে

বেশি হয় তবে অবমূল্যায়নের মারফৎ দেশটি তার লেনদেন ঘাটতিকে কমিয়ে আনতে সমর্থ হবে, অন্যথায় দেশটিকে তার নিজের মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি (Apprciation of Currency) ঘটাতে হবে। একটি সংকেতের সাহায্যে এই শর্তটিকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি—

$$dB = kX_f (el_m + e_{2m} - 1)$$

এখানে dB হচ্ছে লেনদেন ভারসাম্য (B) এর পরিবর্তন। k হচ্ছে যে শতাংশ হারে মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হল, X_{1f} হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানিকৃত দ্রব্যটির পরিমাণ, e_{lm} হচ্ছে যে দেশটি অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে সেই দেশটির আমদানিকৃত দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং e_{2m} হচ্ছে যে দ্রব্যটি অবমূল্যায়নকারী দেশটি রপ্তানি করছে, অপরদেশে তার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।

এখন ওপরের সমীকরণ থেকে খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে যদি $(e_{lm}+e_{2m})$ অর্থাৎ আমদানিকৃত দ্রব্যের অবমূল্যায়নকারী দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও অবমূল্যায়নকারী দেশের রপ্তানিকৃত দ্রব্যটির অন্যদেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার যোগফল যদি একের থেকে বেশি না হয় তবে dB এর মান ঋণাত্মক হয়ে পড়বে, অর্থাৎ B(Y–E) এর মান কমে যাবে। অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যাবে। এই অবস্থায় অবমূল্যায়নের মাধমে ভারসাম্যের সমতা পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন k এর ঋণাত্মক মান অর্থাৎ অবমূল্যায়নের পরিবর্তে মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি।

অবমূল্যায়নের ফলে আমদানিকৃত দ্রব্যটি আপেক্ষিক দাম বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানিকৃত দ্রব্যটির আপেক্ষিক দাম হ্রাস পায়। আমদানি দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম বৃদ্ধি পেলে আমদানি দ্রব্যের দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা কমে যাবে কিন্তু, চাহিদা কি হারে কমছে তার ওপর নির্ভর করছে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে না কি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। মূল্য বৃদ্ধির হার যদি চাহিদা হ্রাসের হারের থেকে বেশি হয় তবে আমদানি ব্যয় বাড়বে, আবার যদি আমদানি হ্রাসের হার আমদানি মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় বেশি হয় তবে আমদানি ব্যয় কমে যাবে। অন্যদিকে রপ্তানি মূল্য হ্রাসের ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে কিন্তু এক্ষেত্রেও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে না হ্রাস পাবে তা স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর। রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য যে হারে হ্রাস পেল রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা যদি তার থেকে কম হারে বৃদ্ধি পায় তবে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে রপ্তানি আয় ও আমদানি আয়ের ব্যবধান কোন দিকে যাবে তাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে স্থিতিস্থাপকতার বিষয়টি। এখন কোনও দেশ যদি আমদানি দ্রব্যের এবং রপ্তানি দ্রব্যের প্রকৃতিকে যথাযথ অনুধাবন না করে লেনদেন ঘাটতি দূর করতে অবমূল্যায়ন ঘটায় তবে তার প্রভাব কি রকম হবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকতে পারবেনা। যেমন উন্নয়নশীল দেশগুলির আমদানির দ্রব্য ও রপ্তানি দ্রব্যের প্রকৃতি সাধারণত এমনই যে এদের চাহিদার দামগত

স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি হয়না ফলে এই সমস্ত দেশের লেনদেন ঘাটতি কমাতে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ততটা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে না। অন্যদিকে শিল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে মুদ্রার অবমূল্যায়ন অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারবে কারণ এদের আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তুলনায় অনেক বেশি।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে অবমূল্যায়নের প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্শাল-লার্নার সমীকরণটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, এখন একটি প্রতিকল্প (মডেল) এর মাধ্যমে আমরা দেখবো কিভাবে মার্শাল লার্নার এই সমীকরণটি পাওয়া গেল। অনুধাবনের সুবিধার জন্য আমরা এমন একটি বিশ্ব অনুমান করে নিই যেখানে দুটি দেশ মাত্র দুটি দ্রব্য নিয়ে লেনদেন করছে। এক্ষেত্রে প্রথম দেশটির লেনদেন ভারসাম্যের সমীকরণ হচ্ছে।

$$B_{1f} = X_1 \cdot P_{2m} - m_1 P_{2x} = X_{1f} - M_{1f}$$

এখানে B_{1f} হচ্ছে প্রথম দেশটির (ধরা যাক এই দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটছে) বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত মাপা হয়েছে। x_1 ও m_1 হচ্ছে প্রথম দেশটির রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ হচ্ছে P_{2m} & P_{2x} হচ্ছে দ্বিতীয় দেশটিতে আমদানি ও রপ্তানির মূল্য। এবং X_{1f} ও M_{1f} হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রথম দেশটির রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ।

সমীকরণের দুই দিকে মোট পরিবর্তন ঘটালে (Total Differentiation)

$$dB_{1f} = dx_1 . P_{2m} + dP_{2m} . x_1 - d_{m_1} P_{2_x} - dP_{2xm_1}$$

$$= X_1 P_{2m} + \left(\frac{dx_1 . P_{2m} + dP_{2m} x_1}{x_1 . P_{2m}} \right) + m_1 P_{2x} \left(\frac{-dP_{2x} m_1 - dm_1 P_{2x}}{m_1 P_{2x}} \right)$$

$$= X_1 P_{2m} \left(\frac{dx_1}{x_1} + \frac{dP_{2m}}{P_{2m}} \right) + m_1 p_{2x} \left(-\frac{dm_1}{m_1} - \frac{dP_{2x}}{P_{2x}} \right)$$

$$dB_{1f} = X_{1f} \left(\frac{dx_1}{x_1} + \frac{dP_{2m}}{P_{2m}} \right) + M_{1f} \left(-\frac{dm_1}{m_1} - \frac{dP_{2x}}{P_{2x}} \right)$$

এখন রপ্তানির আভ্যন্তরীণ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $(= S_{1x}) = \frac{dx_1}{dp_{1x}} \cdot \frac{P_{1x}}{x_1}$

রপ্তানির বৈদেশিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $(=l_{2m}) = -\frac{dx_1}{dp_{2m}} \cdot \frac{P_{2m}}{x_1}$

আমদানির বৈদেশিক যোগানের স্থিতিস্থাপকতা $(=S_{2m}) = \frac{dm_1}{dp_{2x}} \cdot \frac{P_{2x}}{m_1}$

আমদানির আভ্যন্তরীণ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $(=e_{1m}) = -\frac{dm_1}{dp_{1m}} \cdot \frac{P_{1m}}{m_1}$

এই আলোচনায় আমরা গিফেন দ্রব্যের স্থান রাখিনি।

ধরা যাক দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার r : 1

অর্থাৎ $\frac{P_{2x}}{P_{1m}} = r$ বা $P_{2x} = r \cdot P_{1m}$.

বা $dP_{2x} = r.\ dP_{1m} + P_{1m}dr$

$P_{2x} + dP_{2x} = rP_{1m} + dP_{1m}r + P_{1m}dr$

$P_{2x} + dP_{2x} = (P_{1m} + dP_{1m}) \cdot r + P_{1m}dr$

এখন অবমূল্যায়ন মাত্রা (k) কে এইভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায়

$$k = -\frac{P_{1m}}{P_{1m} + dP_{1m}} \cdot \frac{dr}{r}$$

$$= -\frac{dr}{r}\left(\frac{1}{1 + \frac{dp_{1m}}{\{_{1m}}}\right)$$

$$= -\frac{dr}{r}\left(1 - \frac{dp_{1m}}{P_{1m}}\right)$$

$$= -\frac{dr}{r}$$

আবার $P_{2x}+dP_{2x} = (P_{1m}+dP_{1m})r + dr.\ P_{1m}$

$= (P_{1m}+dP_{1m})r - k((P_{1m}+dP_{1m})r$

$= (P_{1m}+dP_{1m})\ (r - kr)$

$= (P_{1m}+dP_{1m})\ .\ r.\ (1-k).$

এখন $\frac{dP_{2x}}{P_{2x}} = -k + \frac{dP_{1m}}{P_{1m}}(1-k).$

একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে $\frac{dP_{2m}}{P_{2m}} = -k + \frac{dP_{1x}}{P_{1x}}.(1-k).$

স্থিতিস্থাপকতা সমূহের সংজ্ঞা ব্যবহার করে—

$$\frac{dx_1}{x_1} = e_{2m}\frac{dP_{2m}}{P_{2m}} = -e_{2m}\left[-k + \frac{dP_{2m}}{P_{2m}}(1-k)\right]$$

কিন্তু $\frac{dx_1}{x_1} = S_{1x}\left(\frac{dP_{1x}}{P_{1x}}\right)$

$\therefore$ প্রতিস্থাপনের পর

$$\frac{dx_1}{x_1} = e_{2m}k - \frac{e_{2m}}{S_{1x}}.(1-k)\frac{dx_1}{x_1}$$

$$\frac{dx_1}{x_1} = \frac{e_{2m.k}}{1+(C_{2m}/S_{1x})(1-k)} = \frac{S_{1x}.e_{2m.k}}{S_{1x}+e_{2m}(1-k)}$$

একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আমরা দেখাতে পারি—

$$\frac{dP_{2m}}{P_{2m}} = -\frac{k.S_{1x}}{S_{1x}+e_{2m}(1-k)}$$

$$\frac{dm_1}{m_1} = -\frac{k.S_{2m}e_{1m}}{e_{1m} + S_{2m}(1-k)}$$

$$\frac{dP_{2x}}{P_{2x}} = -\frac{ke_{1m}}{e_{1m} + S_{2m}(1-k)}$$

একই চারটি ফলাফল ব্যবহার করে আমরা পাচ্ছি।

$$dB_{1f} = K\left[X_{1f}\frac{S_{1x}(e_{2m}-1)}{S_{1x}+e_{2m}(1-k)} + M_{1f}\frac{e_{1m}(S_{2m}+1)}{e_{1m}+S_{2m}(1-k)}\right]$$

এখন যদি আমরা ধরে নিই যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অসীম (∞) তাহলে

$$dB_{1f} = K\ M_{1f}\ .\ (e_{2m} + e_{1m} - 1)$$

৩.৪.২ অবমূল্যায়ন : পরিশোষণের দৃষ্টিভঙ্গি

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অবমূল্যায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করলাম, স্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। এখন আমরা দেখবো একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সমষ্টিগত (Macro) দৃষ্টিকোণ থেকে, একে পরিশোষণ দৃষ্টিকোণ (Absorption approach) বলা হয়ে থাকে। আমরা এর আগেই বলেছি যে আন্তর্জাতিক লেনদেন ভারসাম্য (B) হচ্ছে মোট জাতীয় আয় (Y) এবং সামগ্রিক ব্যয় (E) এর ব্যবধান।

অর্থাৎ $B = Y - E$.

এখন এই সামগ্রিক ব্যয় 'E' কে আমরা পরিশোষণ বা Absorption বলে ভাবতে পারি। একে আমরা A দ্বারা সূচিত করতে চাই। অর্থাৎ $B = Y - A$

মোট পরিশোষণ (A) হচ্ছে সমস্ত প্রকারের চাহিদার সমষ্টি। অর্থাৎ ভোগপণ্যের চাহিদা (C) বিনিয়োগ পণ্যের চাহিদা (I) এবং বেসরকারি ও সরকারি দুধরনের ব্যয় (G)। অর্থাৎ

$$A = C + I + G$$

এখন অবমূল্যায়ণের ফলে লেনদেন ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত দু-ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। প্রথমত, অবমূল্যায়নের প্রভাবে জাতীয় আয় এর পরিবর্তন (dY) হতে পারে দ্বিতীয়ত এই অবমূল্যায়নের ফলে পরিশোধনের পরিবর্তন (dA) হতে পারে। অর্থাৎ $dB = dY - dA$.

মোট পরিশোষণ এর পরিবর্তনকে দুভাগে বিভাজিত করা যেতে পারে—প্রথমত অবমূল্যায়নের ফলে জাতীয় আয়ের যে পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তিত আয়ের একটি অংশ পরিশোষিত হয়। যার মাত্রা নির্ধারিত হয় প্রান্তিক পরিশোধন প্রবণতা (Marginal propensity to absorb)। ধরা যাক এই প্রবণতার মান (C), যা অবশ্যই শূন্য ও একের মধ্যবর্তী কারণ আয়ের একটি ভগ্নাংশ পরিশোষিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত অবমূল্যায়নের এক প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে পরিশোষণে একে D দ্বারা সূচিত করলে, পরিশোষণের পরিবর্তন (dA) কে এইভাবে লেখা যায় $dA = c.dy + dD$। এর ফলে লেনদেন ভারসাম্যের উদ্বৃত্তের পরিবর্তন (dB) কে নিম্নলিখিত রূপে দেখানো সম্ভব।

$$dB = dY - c.\ dy - dD.$$

বা $$dB = (1 - C)dy - dD$$

ওপরের এই সমীকরণ থেকে বুঝতে পারি তিনটি বিশেষ বিষয় আছে যাদের ওপর নির্ভর করছে অবমূল্যায়নের প্রভাব। প্রথমত অবমূল্যায়ন কিভাবে জাতীয় আয়কে পরিবর্তিত করছে, দ্বিতীয়ত প্রান্তিক পরিশোষণ প্রবণতার মান এবং সর্বশেষে পরিশোষণের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব কতটা? অবমূল্যায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ দুটি বিশেষ পরিস্থিতিতে দু'রকম হতে পারে। দ্বিতীয় পরিস্থিতিটি হচ্ছে যখন পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান। প্রথম অবস্থায় আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানে পূর্ণ-নিয়োগ অবস্থা নেই। এই পরিস্থিতিতে অবমূল্যায়নের ফলে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাবে, ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, এর ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুণক প্রক্রিয়ায় সম্প্রসারণ পর্বের সূচনা হবে। এখন রপ্তানি কতটা সম্প্রসারিত হবে তা নির্ভর করবে দুটি বিষয়ের ওপর প্রথম রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যের কতটা বৃদ্ধি ঘটবে অবমূল্যায়নকারী রাষ্ট্রে এবং অন্য রাষ্ট্রগুলি এই বর্ধিত রপ্তানির যোগানকে পরিশোষণ করতে কতটা ইচ্ছুক তার ওপর।

এখন মনে রাখা আবশ্যক যে অবমূল্যায়নের নীট ফল শুধুমাত্র কত আয় বৃদ্ধি পেল তার ওপর নির্ভর করেনা। এটি আয়ের পরিবর্তন ও অবমূল্যায়ন দ্বারা আবিষ্ট হয়ে পরিশোষণের যে পরিবর্তন হয়, তার ব্যবধানের ওপর নির্ভর করে। এই ব্যবধানকে আমরা প্রকৃত মজুত (Real Hoarding) বলে ভাবতে পারি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে লেনদেন ভারসাম্যের উদ্বৃত্তের পরিবর্তন প্রকৃত মজুতের পরিবর্তনের সমান হবে।

এখন আমরা যদি অবমূল্যায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করি, তাহলে আমরা বলতে

পারি যে প্রান্তিক পরিশোষণ প্রবণতা বা প্রান্তিক মজুত প্রবণতা (যাকে সমপর্যায়ের বলে মনে করা যেতে পারে) সেটাই হচ্ছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা অবমূল্যায়নের প্রভাবকে ব্যাখ্যা করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবণতার (C) মান এক অপেক্ষা কম হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু মজুত হতেই থাকবে, সমগ্র জাতীয় আয় পরিশোষিত হবেনা এবং ততক্ষণ পর্যন্ত লেনদেন ঘাটতিতে অবমূল্যায়নের প্রভাব ধনাত্মক হবে। কিন্তু এই 'C' এর মান যদি একের বেশি হয় তবে ঋণাত্মক প্রভাব অনুভূত হবে। এর কারণ অপ্রত্যক্ষ অবমূল্যায়ন আবিষ্ট পরিশোষণ প্রভাবের মান তখন প্রত্যক্ষ প্রভাবের মানকে ছাড়িয়ে যাবে। এই সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় অবমূল্যায়নে প্রভাবকে ব্যাখ্যা করছি, এক্ষেত্রে অবমূল্যায়নের ধনাত্মক প্রভাবে জাতীয় আয় তথা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, বৃদ্ধি পাবে নিয়োগের পরিমাণ। এদের প্রভাবে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাবে, এই সমস্তের যুগ্ম প্রভাবে প্রান্তিক পরিশোষণ প্রবণতার মান খুব বেশি হওয়া এমন কি এক কে ছাড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় এবং সেক্ষেত্রে অবমূল্যায়নের প্রভাব ঋণাত্মকও হওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি ঐ প্রবণতার মান একের থেকে কম হয় অথবা উপযুক্ত নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে একের থেকে কম রাখা হয় তবে অবশ্যই অবমূল্যায়ন লেনদেন উদ্বৃত্তকে ধনাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে। একটা কথা এক্ষেত্রে মানে রাখা ভীষণ জরুরী। যখন একটি দেশ অবমূল্যায়নের সফল প্রয়োগ ঘটায় তখন অন্যান্য দেশে তার প্রভাব বিপরীত দিকে যায়, এবং খুব স্বাভাবিক কারণে তারাও তখন নিজের নিজের দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাতে চাইবে। যাকে প্রতিযোগিতামূলক অবমূল্যায়ন বলা যেতে পারে, এর ফলে ক্রমাগত অবমূল্যায়ন ঘটতে ঘটতে প্রকৃত বাণিজ্য ঘাটতির কোন সুরাহা হয়না, এই পরিস্থিতি বোধে অবশ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের কিছু 'রক্ষা-কবচ' ব্যবস্থা আছে, যার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগী অবমূল্যায়নকে আটকানো হয়।

৩.৪.৩ অবমূল্যায়ন এবং বাণিজ্য হার (Devaluation and Terms of Trade)

অনেক সময় বলা হয় যে অবমূল্যায়নের ফলে বাণিজ্য হার (Terms of Trade) সেই দেশের বিপক্ষে যায় অবমূল্যায়নের ফলে বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানি মূল্য হ্রাস পায় এবং অন্যদিকে আমদানি অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় ও ছড়ানো এবং বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি মূল্যও পরিবর্তিত হয়, যার দরুন বাণিজ্যহার বিপক্ষে চলে যেতে পারে। এখন যদি বাণিজ্যহারের পরিবর্তনের ফলে প্রকৃত আয় হ্রাস পায়, তাহলে পরিশোষণও হ্রাস পাবে এবং সেক্ষেত্রে বাণিজ্য উদ্বৃত্তে অবমূল্যায়নের ধনাত্মক প্রভাব পড়বে।

৩.৪.৪ অবমূল্যায়ন এবং পূর্ণ নিয়োগ পরিস্থিতি (Devaluation and Full Employment situation)

এতক্ষণ আমরা অপূর্ণ নিয়োগ পরিস্থিতিতে অবমূল্যায়নের প্রভাব আলোচনা করেছি। এখন আমরা দেখবো

পূর্ণ নিয়োগ পরিস্থিতি অবমূল্যায়ন কিভাবে কার্যকর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মূলশক্তি হচ্ছে পরিশোষণে অবমূল্যায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং এই প্রভাব জাতীয় আয়বৃদ্ধির সাথে কোনভাবে যুক্ত নয়। নির্দিষ্ট আয়ে মূল্যস্তরের যে পরিবর্তন ঘটবে তার ফলে পরিশোষণের যে পরিবর্তন হবে তার ওপরই মূলত এটি নির্ভরশীল। মনে করা যাক একটি দেশ তার মুদ্রার ১০ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে। পরিশোধনের প্রত্যক্ষ স্থিতিস্থাপকতার মান ধরা হোক ০.১। এখন যদি আমরা অনুমান করে নিই যে রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের অন্তসম্পর্কের ফলে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর পরিবর্তন হয় ০.৫ গুণ। এর মানে রপ্তানি ও আমদানি মূল্যের দশ শতাংশ পরিবর্তনের ফলে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের পরিবর্তন হবে ৫ শতাংশ এখন ১০ শতাংশ হারে অবমূল্যায়নের জন্য ০.৫ শতাংশ হারে হ্রাস পাবে পরিশোষণ। যদি জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ হয় আমদানি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ২.৫ শতাংশ হারে উন্নত হবে।

৩.৫ প্রত্যক্ষ পরিশোষণ-প্রভাবকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিষয়সমূহ (Factors affecting Direct Absorption Effect)

এখন আমরা জানতে চাইবো প্রত্যক্ষ পরিশোষণ প্রভাবকে কোন বিষয়গুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যখন টাকাকড়ির যোগান অপরিবর্তিত থাকে, তখন মূল্যস্তর বাড়লে নগদ টাকা ধরে রাখা পরিমাণ বেড়ে যাবে, এটি একমাত্র পরিশোষণের মাত্রা কমিয়ে আনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। একজন বিশেষ ব্যক্তি তার নগদ টাকা জমার পরিমাণকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সেটা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এর ফলে তখন পরিশোষণ কমে আসতে বাধ্য। এটিকে প্রকৃত জমা প্রভাব (Real Balance Effect) বলা হয়।

প্রত্যক্ষ পরিশোষণকে প্রভাবিত করে আরো কিছু বিষয়। আয়বণ্টনও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে। যদি কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এখানে দেখানো সম্ভব নয়। আয়ের পুনর্বণ্টনে পরিশোষণ বাড়তে বা কমতে পারে এবং কোনদিকে সেটি যাবে তা নির্ভর করছে পুনর্বণ্টনে যাদের আয় বাড়লো তাদের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি না কম তার ওপর। আর্থিক বিভ্রমও (Money illusion) বহু ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। আর্থিক বিভ্রমের উপস্থিতিতে একজন ক্রেতা মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেয় যদি তার আয় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে লেনদেন উদ্বৃত্তের ওপর ধনাত্মক প্রভাব পড়তে পারে।

৩.৬ লেনদেন ব্যালেন্সের ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ (Direct Control)

লেনদেনের প্রতিকূলতা দূর করার জন্য আর্থিক নীতি, ফিসক্যাল নীতি, অথবা 'মুদ্রার অবমূল্যায়ন' নীতির ভূমিকা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতাগুলিও আমরা আলোচনা করেছি। এই নীতিগুলিতে সাফল্য আসে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। তাই দ্রুত পরিবর্তনের তাগিদে এই সমস্ত নীতির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়, এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য যে সকল নীতি নেওয়া যেতে পারে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ (Direct Control)

এই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণই দুভাবে করা যায়—

(১) পরিমাণজনিত নিয়ন্ত্রণ (Quantitative Restriction)

(২) বিনিময়জনিত নিয়ন্ত্রণ (Exchange Restriction)

আমদানির পরিমাণ কমিয়ে অথবা রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারলে প্রতিকূল লেনদেন ভারসাম্যকে কমানো সম্ভব, কিন্তু যেহেতু রপ্তানি আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমদানিকারকেরা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারণের ভূমিকা নিচ্ছে, ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে রপ্তানিকারকের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়; অন্তত সেই আয়কে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে পরিমাণজনিত নিয়ন্ত্রণ মূলত আমদানি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সরকার আমদানিকৃত দ্রব্যটি ওপর কর আরোপ করে, অথবা দেশের অভ্যন্তরে আমদানি পরিবর্ত দ্রব্যটির উৎপাদনে ভরতুকি প্রদান করে আমদানিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আবার সরকার আমদানির ওপর সরাসরি নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমা (Quota) বেঁধে দিয়ে আমদানিকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এক্ষেত্রে আমদানি লাইসেন্স প্রথার মাধ্যমে অবাধ আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি করে বাণিজ্যিক প্রতিকূলতার পরিবেশ খানিকটা শোধরানো সম্ভব।

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্য একটি পদ্ধতি হল বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচা সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে রাখে। রপ্তানিকারকেরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, এখন তারা যদি তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সরকার নির্মিত বোর্ড ছাড়া অন্যত্র কোথাও এই মুদ্রা বিক্রি করতে না পারে তবে দেশের সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রার একচেটিয়া বিক্রয়কারী হবে এই বোর্ড এবং সমস্ত আমদানিকারককে ঐ বোর্ডের কাছ থেকেই কিনতে হবে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা। এই পদ্ধতির ফলে সরকার সবসময়ই আমদানিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং তা যেন রপ্তানি আয়কে ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিতে সমর্থ হবে এবং লেনদেন এর সমতা ফিরিয়ে আনতে পারবে।

বৈদেশিক মুদ্রার বণ্টনের মাধ্যমে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠু করা যায়, তার জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমদানিকারকদের বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি করা যেতে পারে। আর অগ্রাধিকারের বিষয়টি অনুধাবনের জন্য বা আমদানির আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝার জন্য বহু বিনিময়হার (Multiple Exchange Rate) প্রথাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানির জন্য বিনিময়হার কম রেখে, অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানির জন্য বিনিময়হার বেশি রেখে সেই সমস্ত আমদানিকে অনুৎসাহিত করা যেতে পারে। এইভাবে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো সম্ভব।

এখন আমরা দেখছি যখন আমদানি দ্রব্যটি কম স্থিতিস্থাপক হয় তা হলে অবমূল্যায়নের মাধ্যমে সেই দ্রব্যের আমদানিকে খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে। একটা কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ একটা স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসেবে যতটা কর্মক্ষম দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে এটি ততোটা কার্যকরী নয় কারণ এটি দামের বিচ্যুতি ঘটিয়ে ভোগ ও উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে।

৩.৭ সারাংশ

যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন দেশের দেনা তার পাওনার থেকে বেশি হয়ে থকে, তখন সেই দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হয়েছে বলতে হবে। এই পরিস্থিতি দূর করে সমতা আনার দুটি পথ থাকে, প্রথমটি ব্যয় হ্রাসের নীতি এবং দ্বিতীয়টি ব্যয় অপসারণের নীতি। এখন ব্যয়হ্রাসের নীতিকেও দু-ভাবে দেখা যায় (১) আর্থিক নীতি ও (২) সরকারি আয়-ব্যয় নীতি। আর্থিক নীতির হাতিয়ারগুলি হল ব্যাঙ্ক রেট এর পরিবর্তন ও খোলাবাজারি কারবার। সরকারি আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতির মূল হাতিয়ার হল বিভিন্ন ধরনের কর বৃদ্ধি ও সরকারি ব্যয় হ্রাস। ব্যয় অপসারণ নীতির প্রয়োগ করা হয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে।

৩.৮ অনুশীলনী

১। লেনদেন ভারসাম্যর ভারসাম্যহীনতা কিভাবে দূর করা যায়?

২। মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলতে কি বোঝায়? কিভাবে অবমূল্যায়ন রপ্তানি ও আমদানিকে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা কর।

৩। মুদ্রার অবমূল্যায়ন দ্বারা কি লেনদেন ভারসাম্যর ঘাটতি দূর করা যায়? এই প্রসঙ্গে অবমূল্যায়নের অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

৪। অবমূল্যায়নকে স্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং পরিশোষণের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা কর।

৫। লেনদেন ব্যালেন্সের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Bo Sodersten—International Economics

(২) Chacholiades Miltiades : International Trade Theory and Policy

(৩) Kindleberger C. P.—International Economics

(৪) Tinbergen Jan—International Economic Cooperation

একক ৪ ❐ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ ব্রেটন উডস্ ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বিবিধ কার্যাবলী

৪.৩.১ বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা

৪.৩.২ কোটাভিত্তিক ঋণপ্রদান

৪.৩.৩ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদমান বিষয়গুলির সুষ্ঠু সমাধান

৪.৩.৪ Special Drawing Right (S. D. R.)-এর আগমন

৪.৩.৫ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাজের পর্যালোচনা

৪.৪ বিশ্বব্যাঙ্ক

৪.৪.১ বিশ্বব্যাঙ্ক গঠনের উদ্দেশ্য

৪.৪.২ বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণপ্রদান ও নজরদারী

৪.৫ বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা

৪.৬ সারাংশ

৪.৭ অনুশীলনী

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত পাঠক্রমটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন।

- কোন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের জন্ম হয়েছিল।
- আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বিবিধ কার্যকলাপ
- বিশ্বব্যাঙ্কের বিবিধ কার্যকলাপ
- বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা।

৪.২ প্রস্তাবনা

বিশ্ব অর্থনীতিতে মহামন্দার প্রভাব অনস্বীকার্য। ১৯২৯-৩০ সালে সারা বিশ্বজুড়ে যে মহামন্দা (Great Depression) বিস্তার লাভ করেছিল তার ফলে একের পর এক সমস্ত দেশ তাদের মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। বাস্তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সব দেশই স্বর্ণমান (Gold standard) পরিত্যাগ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৪৪ সালে ব্রেটন-উড্‌স এ এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund, I. M. F) গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাকে অনেক সময় ব্রেটন উডস্ ব্যবস্থাও বলা হয়।

মন্দার প্রভাবে প্রতিটি দেশেই উৎপাদন হ্রাস পায় এবং সাথে সাথে হ্রাস পায় রপ্তানি আয়, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা তখন নিজ নিজ দেশে মুদ্রার বহির্মূল্য কমাতে থাকে, যাতে প্রতিকূল অবস্থা থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে। নিজের অর্থের বহির্মূল্য হ্রাসের এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় দেশগুলির মধ্যে, এর ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে শুরু হয় এক চরম বিশৃঙ্খলা, স্বর্ণমান ব্যবস্থাও অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সফল হতে পারছিল না। ১৯৩৩-৩৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তার অর্থের বহির্মূল্য হ্রাস করে ও স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। বিভিন্ন দেশ তার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও নিয়োগ হ্রাসের পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের ওপর বিভিন্ন রকম বাধা নিষেধ আরোপ করতে থাকছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকছিল এই সময়ে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্র-শক্তির দেশগুলি একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক অর্থ-

ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ার এর অন্তর্গত ব্রেটন উডস্ এ চুয়াল্লিশটি দেশের এক সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সংগঠনটি ১৯৪৪ সালেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৪.৩ ব্রেটন উডস্ ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (International Monetary Fund বা I.M.F.) বিবিধ কার্যাবলী

ব্রেটন উডস ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এর মাধ্যমে যে একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে দুটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে—প্রথমত বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, ও দ্বিতীয়ত বহুধা ঋণ ব্যবস্থা (Multilateral Credit System)। আর এই দুই স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তার মূল উদ্দেশ্যগুলি স্থির করে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়হার রোধ করা এছাড়া প্রয়োজনানুযায়ী একদেশীয় মুদ্রার পরিবর্তে অন্য মুদ্রার পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করা। লেনদেন হিসেবের ঘাটতি পূরণে সাময়িক সাহায্য করাও আই.এম.এফ-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে চিত্রিত হয়েছিল। লেনদেন হিসেবে যদি কোন মৌলিক ভারসাম্যহীনতা থাকে, তবে তা দূর করার ব্যবস্থাদি গ্রহণে সহয়তা প্রদানও এই সংগঠন গড়ে তোলার পেছনে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

৪.৩.১ বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা (To Maintain the Stability of Exchange Rate)

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে যাতে সাধন করতে পারে তার জন্য তার কিছু কিছু কার্যাবলীও (Functions) সুনির্দিষ্ট করেছে। এই কার্যাবলীর কথা বলতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই বলতে হয় **বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা** বজায় রাখা। আমরা আগেই বলেছি যে বিশ্বব্যাপী মহামন্দার কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে বেশিরভাগ দেশই মেতেছিল প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়হার হ্রাসের খেলায়, এর ফলে দেখা গিয়েছিল যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (I.M.F) এই পরিস্থিতি থেকে বিশ্বকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়হার হ্রাসকে প্রতিরোধ করে, বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র তাঁদের মুদ্রার স্থিরীকৃত বিনিময়হারকে স্বর্ণের ভিত্তিতে প্রকাশ করে থাকে। এই ব্যবস্থাকে স্বর্ণ সমতামান (Gold

Parity Standard) বলে অভিহিত করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য বিনিময়হারকে স্বর্ণের সাথে যুক্ত করে তাকে স্থিতিশীল রাখা। এক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে যে তারা কোন ক্ষেত্রেই স্থিরীকৃত বিনিময়হারের ১০ শতাংশের বেশি পরিবর্তন তাদের বিনিময়হারের ঘটাবেনা। এই শর্তের ব্যতিক্রম হতে পারে তখনই যদি কোন দেশে লেনদেনের হিসেবে মৌলিক ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রেও দশ শতাংশের বেশি পরিবর্তনের মুদ্রাভাণ্ডারের অনুমোদন সাপেক্ষ। এই বিশেষ অবস্থায় মুদ্রাভাণ্ডার ওই দেশটির আর্থ-সামাজিক নীতিগুলির অনুসন্ধান ও প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিমার্জনের সুপারিশ করার অধিকার ভোগ করে।

৪.৩.২ কোটাভিত্তিক ঋণপ্রদান

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দ্বিতীয় প্রধান কাজ হল লেনদেনের সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য স্বল্পকালীন ঋণ প্রদান করা। এই ঋণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট কোটা (Quota) থাকে। ১৯৪৪ সালে মুদ্রাভাণ্ডারের তহবিল ঠিক হয়েছিল ৮.৫ বিলিয়ন ডলার। নির্দিষ্ট কোটার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে এই অর্থসংগ্রহ করা হয়। আর এই কোটার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে আপেক্ষিক গুরুত্বকে বিবেচনা করা হয়। সেই গুরুত্বের ভিত্তিতে মোট তহবিলের ৩৬ শতাংশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশ তাদের কোটার পরিমাণকে বাড়িয়ে নিয়েছে। ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভান্ডারের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩০। প্রত্যেক দেশের যে কোটা থাকে তা দিনে কতগুলি বিষয় সুনির্দিষ্ট। প্রথমত কোটার দ্বারা প্রত্যেক দেশের চাঁদার পরিমাণ নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়ত এই কোটার দ্বারা নির্ধারিত হয় কোন দেশ কতটা পরিমাণ ঋণ পেতে পারে, যাকে বলে বিশেষ ঋণগ্রহণের অধিকার (Spccial Drawing Right বা S.D.R) এবং তৃতীয়ত, এই কোটার দ্বারাই নির্ধারিত হয় কোন দেশের ভোটাধিকার। লেনদেনের ঘাটতি মেটাতে এই দেশগুলি তাদের S.D.R প্রয়োগ করে মুদ্রাভাণ্ডার থেকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ পেয়ে থাকে। পরিশোধযোগ্য ঋণের একটা অংশ দিতে হয় বৈদেশিক মুদ্রায় এবং বাকীটা আভ্যন্তরীণ মুদ্রায়। বর্তমানে এই ঋণ পরিশোধের বিষয়টি আরো সহজ করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয় অংশটি ৫টি বিশেষ বিদেশী মুদ্রায় প্রদান করা যায়। এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী মুদ্রাকে একত্রে 'কারেন্সি বাস্কেট' বলে। ভাণ্ডারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের ওপর সুদের হার নির্ভর করে গৃহীত ঋণের পরিমাণের ওপর। সংবিধান অনুযায়ী কোন দেশ কখনও নিজস্ব কোটার দু-গুণের বেশি ঋণ পেতে পারেনা। তবে এই শর্ত বিশেষ পরিস্থিতিতে শিথিলযোগ্য)।

৪.৩.৩ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদমান বিষয়গুলির সুষ্ঠু সমাধান

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের তৃতীয় প্রধান কাজ হল আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনা সংগঠিত করে বিবাদমান বিষয়ের সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি ঘটানো। এটি ভাণ্ডারের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি অন্যতম অস্ত্র। যে

পরিস্থিতিতে এই ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল তার ফলে ভাণ্ডারের ভূমিকা ছিল ভীষণভাবে রক্ষণশীল, ভাণ্ডারের আশঙ্কা ছিল যে যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশ মুদ্রাভাণ্ডার থেকে লেনদেন ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে তা কাজে লাগাবে আর্থিক পুনর্গঠনের কাজে এবং লেনদেন প্রতিকূলতা দূর করার কোন পদক্ষেপ নিতে হয়তো পারবেনা, তাই ঋণদানের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত কঠোর। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা কঠোরভাবে মানা হত, বকেয়া ঋণের ওপর চড়া হারে সুদ ধার্য করা হত। শুধু তাই নয়, ঋণ নেওয়ার আগেই আবেদনকারী রাষ্ট্রটিকে প্রমাণ করতে হয় যে লেনদেন ঘাটতি সাময়িক এবং ঋণ পাওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঘাটতি দূর করা সম্ভব। আর এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ভাণ্ডার বিনিময়হার স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিনিময়হারের পরিবর্তন না ঘটিয়ে, শুধু 'ব্যয় হ্রাসের নীতি'র (Expenditure reducing Policy) প্রয়োগের মাধ্যমে ঘাটতি দূর করা এবং সমতা নিয়ে আসা ছিল ভাণ্ডারের অভিপ্রায়।

৪.৩.৪ Special Drawing Right (S.D.R.)এর আগমন

১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বিশ্ব অর্থনীতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেনি। শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতো। শুধুমাত্র স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে ভাণ্ডার তার কাজকর্মের পরিধিকে বিস্তৃত রেখেছিল। ১৯৬৭ সালে 'স্পেশাল ড্রয়িং রাইট' ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করে এই ভাণ্ডার। পরবর্তীকালে এই S.D.R. আন্তর্জাতিক মুদ্রার মর্যাদা পেয়েছে, এর অন্যতম কারণ অবশ্য স্বর্ণের যোগান ও ডলারের যোগান হ্রাস পাওয়া। ফলে S.D.R. এর বৈশিষ্ট্য যা আমরা আগে খানিকটা আলোচনা করেছি, তা থেকেই বোঝা যায় কেন এই S.D.R. একটি জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়েছে, এই মুদ্রা পাঁচটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মুদ্রা ক্রয়ে সক্ষম। ফলে স্বল্পোন্নত দেশ খুব সহজেই তাদের লেনদেন ঘাটতি দূর করতে সক্ষম হয়, এই সমস্ত কারণে S.D.R. আন্তর্জাতিক মুদ্রার রূপে স্বীকৃতি আদায় করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে মজুত অর্থের তহবিল কোটার ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয় এবং উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় বেশি কোটার মালিক হওয়ায় S.D.R. বণ্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য সৃষ্টি হয় ফলে S.D.R. এর ব্যবহারের সুবিধা ও অসমভাবে বণ্টিত হয়। আর এই অসাম্য থেকে যাওয়ার দরুণ উন্নয়নশীল দেশগুলির আন্তর্জাতিক অর্থের সমস্যা অমীমাংসিত থেকে গেছে।

৪.৩.৫ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাজের পর্যালোচনা

ব্রেটন উডস্ চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বিনিময়হারের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করে এক কার্যকরী

ব্যবস্থাও গড়ে তোলে, এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করেছে। এই ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক অর্থের এক যোগান ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এর মূলে ছিল স্বর্ণের মজুত ও ডলারের পরিমাণ। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে স্বর্ণের যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় আন্তর্জাতিক অর্থের ভিত্তি ডলারের যোগানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিশ্ববাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য ও লেনদেন ভারসাম্যে তাদের উদ্বৃত্ত অবস্থা দীর্ঘকাল বজায় থাকার কারণে এই ভাণ্ডারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। কিন্তু সত্তরের দশকের শুরু থেকেই বিশ্ববাণিজ্যে মার্কিনী আধিপত্য লুপ্ত হতে শুরু করে; এর ফলে ব্রেটন্ উডস্ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে শুধু একটি দেশের ওপর নির্ভর করে বিনিময় হারের স্থিরতা বজায় রাখা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি একটি মুদ্রার ওপর নির্ভর থেকে কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারেনা বা দীর্ঘকাল কার্যকরী থাকতে পারেনা। ১৯৭০ সালের ডলার সঙ্কট (Dollar Crisis) ব্রেটন উডস ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে তাই পরিগণিত হয়। এই সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের শিকার হয়ে পড়ে। ডলারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অনেকটাই নষ্ট হয় এই সময়। ডলারকে নিজের ইচ্ছেমতো স্বর্ণে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা হারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এছাড়া ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটানোর তাগিদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহজ আর্থিক নীতির শরণাপন্ন হয়, আর তার ফলে মুদ্রার যোগান বাড়িয়ে তুলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় যথেষ্ট পরিমাণে, ডলারের মর্যাদাও বিশ্ববাজারে ক্ষুণ্ণ হয় আর তার জন্য আন্তর্জাতিক অর্থের মাধ্যম হিসেবে ডলার তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়, আর এই ব্যর্থতায় ব্রেটন উডস্ ব্যবস্থার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি সম্পর্কে ইউরোপের অনুকূল উদ্বৃত্ত দেশগুলি ক্রমশ শঙ্কিত হয়ে পড়ে, এছাড়া রাজনৈতিক কারণেও তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া যুদ্ধ পরবর্তী মন্দা অতিক্রম করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদের হার যথেষ্ট কমিয়ে দিয়েছিল। এর লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর মূলধনের বহির্গমন ঘটে এবং এর একটা বড় অংশ জার্মানীতে প্রবেশ করে, ফলে জার্মান 'মার্ক' মুদ্রার ওপর চাপ বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ডলার তার আন্তর্জাতিক বিশ্বস্ততা হারাতে থাকে। বাড়তে থাকে লেনদেন ঘাটতি। মূলধনের বাজারে বাড়তে থাকে ফাটকা কারবার। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান রিচার্ড নিক্সন মার্কিন ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটায়। ব্রেটন উড ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশ তাদের মুদ্রায় বিনিময় হার ডলারের মাধ্যমেই স্থির করতো, এখন সেই ডলারের নিজস্ব অবমূল্যায়নের ফলে গোটা ব্যবস্থার ওপর একটা আকস্মিক ধাক্কা পড়ে। ঐ একই বছরে ডলারের পরিবর্তে স্বর্ণের ক্রয়-বিক্রয়

আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করে দেয় নিক্সন প্রশাসন, ফলে ব্রেটন উডস ব্যবস্থা আরো একটি জোর ধাক্কার সম্মুখীন হয়। ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণের পরিবর্তন যোগ্যতার অবসানের সাথে সাথে ব্রেটন উডস ব্যবস্থার স্বর্ণ বিনিময় মান অবলুপ্ত হয়। ১৯৭৩ সালে মূলধনের প্রচণ্ড ফাটকা কারবারের ফলে ১০ ভাগ হারে ডলারের মূল্য হ্রাস করে, এই একই সময়ে European Economic Commnunity বা ইউরোপীয় আর্থিক গোষ্ঠীর পাঁচটি দেশ ডলারের তুলনায় তাদের মুদ্রার বহির্মূল্য বৃদ্ধি করে, ফলে আন্তর্জাতিক বিনিময়হারে বড় রকমের ওলটপালট শুরু হয় এবং বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা ধাক্কা খায় বড় মাপের এবং স্বাভাবিকভাবেই ব্রেটন উডস ব্যবস্থার পতন হয়।

৪.৪ বিশ্বব্যাঙ্ক বা (World Bank)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুদ্রা ভাণ্ডারের সাথে সাথে আরো একটি আর্থিক সংগঠন গড়ে ওঠে, এটিকে পুনর্গঠন ও উন্নয়ণের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (The International Bank for Reconstruction and Development I.B.R.D.) বলে। এটি অবশ্য বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) নামে অনেক বেশি পরিচিত। এটিকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের একটি সহযোগী সংস্থা হিসাবে ভাবা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালে এই বিশ্বব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। মূলত যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির পুনর্গঠন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থিক উন্নয়নে আর্থিক সরবরাহের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করার নিমিত্তে এই সংস্থাটি গড়ে তোলা হয়।

৪.৪.১ বিশ্বব্যাঙ্ক গঠনের উদ্দেশ্য

বিশ্বব্যাঙ্কের কাজগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দান করা প্রকৃতপক্ষে, এসমস্ত দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করাই বিশ্বব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, যে সমস্ত উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশে এরা সহায়তা প্রদান করে সেখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং এই সমস্ত সমীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে ঐ সমস্ত দেশে উন্নয়নের কর্মসূচিকে চিহ্নিত করা। এছাড়া স্বল্পোন্নত দেশে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে পরামর্শ প্রদান করাও বিশ্বব্যাঙ্কের পরিধির মধ্যে পড়ে।

৪.৪.২ বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণপ্রদান এবং নজরদারি

বিশ্বব্যাঙ্ক সাধারণত স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সরকার ও সরকারি সংস্থাকেই ঋণ প্রদান করে। দ্রুত

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই মূলত বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে থাকে। তবে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও পরিকাঠামো গঠনের ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করে। ঋণ প্রদানের পর ঋণের সঠিক ব্যবহারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে বিশ্বব্যাঙ্ক, প্রয়োজনে প্রকল্প বা কর্মসূচি রূপায়ণে পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তাও প্রদান করে থাকে। বিশ্বব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বিশ্বব্যাঙ্কের তহবিল আসে মূলত উন্নত দেশগুলি থেকে। তবে আন্তর্জাতিক মূলধনের বাজার থেকে অর্থসংগ্রহ করা হয়। বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান বাণিজ্যিক নীতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। ফলে ঋণ প্রদানের পূর্বে বিশ্বব্যাঙ্ক আবেদনকারী দেশগুলি ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা যাচাই করে নেয়। এক্ষেত্রে কতগুলি বিষয় স্মরণে রাখা প্রয়োজন। প্রথম বিশ্বব্যাঙ্ক মূলত প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে, নির্দিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচির বিচার বিশ্লেষণের পরই ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারিত হয়। প্রকল্প মাঝপথে পরিত্যক্ত হলে, বরাদ্দ ঋণও মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্প নির্বাচনও ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার, এবং সেই প্রকল্পটি আবেদনকারী দেশটির পক্ষে কতটা জরুরী তার চেয়ে ব্যাঙ্কের কাছে বেশি বিবেচনীয় বিষয় প্রকল্পটির ভবিষ্যতে আর্থিক সাফল্যের সম্ভাবনা। বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের সুদের হার সাধারণত বেশ চড়া, ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলি অনেকটা ঋণ গ্রহণে আগ্রহী থাকেনা। বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ সাধারণত কঠিন ঋণ (Hard Loan)। কারণ এটি শুধু পাউন্ড বা ডলারে পরিশোধযোগ্য, পাউন্ড বা ডলার কঠিন মুদ্রা (Hard Currency)। ফলে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধের শর্ত অনেক দেশের কাছেই গ্রহণযোগ্য থাকে না। সর্বশেষে বলা যায় বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ প্রদানের পেছনে থাকে এক লুকানো কর্মসূচি (Hidden Agenda)। ঋণের শর্ত হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের নিষেধাজ্ঞা এর মাধ্যমে জারি করে থাকে; ফলে, বহু ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণকারী দেশ তার আর্থিক সার্বভৌমিকতা হারিয়ে ফেলে।

৪.৫ বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা

স্বর্ণমান (Gold Standard) ব্যবস্থায় সব দেশেই মুদ্রার বিনিময়মূল্য স্বর্ণের মাধ্যমে নির্ধারিত হত। ব্রেটন উডস্ ব্যবস্থাতেও বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময়হার স্থির ছিল, কিন্তু এই ব্যবস্থার পতনের পর, বর্তমানে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রকমের বিনিময় হার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একদিকে যেমন দেখা যায় স্থির বিনিময় হার তেমনি দেখা যায় পরিবর্তনশীল বিনিময়হার একে নমনীয় বিনিময়হারও বলে। আবার কিছু

কিছু দেশে এই দুই রকম বিনিময়হারের সংমিশ্রণের উপস্থিতিও কোথাও কোথাও দেখা যায়। সেজন্য বর্তমান ব্যবস্থাকে মিশ্র ব্যবস্থা (Hybrid System) বলা যেতে পারে।

এমন কিছু দেশ আছে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাদের মুদ্রার বিনিময় মূল্য সম্পূর্ণরূপে নমনীয় (freely floating)। এই বিনিময়হার বাজারের চাহিদা-যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়। সরকার কোনভাবে বিনিময়হার নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করেনা। আবার কিছু কিছু দেশ আছে যেমন জাপান, কানাডা, ব্রিটেন এরা গ্রহণ করেছে নিয়ন্ত্রিত নমনীয় বিনিময় ব্যবস্থা (Managed flexible system)। এই ব্যবস্থায় স্বল্পকালে বিনিময়হার স্থির থাকে, এবং দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা বাজারের কারবারের মধ্য দিয়ে মুদ্রার যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে বিনিময়হারের পরিবর্তনকে রোধ করে। এবং সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিনিময়হারকে কাঙ্ক্ষিত দিকে পরিবর্তিত করে খোলাবাজারের কারবারের মধ্য দিয়ে। এবং এই হস্তক্ষেপ প্রায় একটি নিয়মিত অনুশীলনের মধ্যেই পড়ে। এছাড়া কিছু কিছু ছোট ছোট দেশ আছে, তারা তাদের দেশের মুদ্রার বিনিময়হার অন্যদশের মুদ্রার মাধ্যমে স্থির করে নেয়। আবার কেউ কেউ তাদের মুদ্রার বিনিময়হার অন্য একটি বিদেশী মুদ্রার মাধ্যমে না করে একগুচ্ছ বৈদেশিক মুদ্রার (Currency basket) মাধ্যমে স্থির করে। আমাদের দেশে টাকার বিনিময়হার এইভাবে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার বিভিন্ন অংশ নিয়ে স্থির হয়। আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে কিছু কিছু দেশ বিনিময়হার স্বল্পকালে স্থির রাখলেও দীর্ঘকালে এই বিনিময়হারকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করে, একে Gliding Peg, বা Crawling Peg ব্যবস্থা বলে। কিছু কিছু দেশ আবার একত্রিত হয়ে একটি মুদ্রা গোষ্ঠী (Current block) গঠন করেছে। গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি নিজেদের মধ্যে তাদের মুদ্রার বিনিময়হারকে স্থির রেখে গোষ্ঠীর বাইরের দেশগুলির সঙ্গে বিনিময়হারকে নমনীয় বা পরিবর্তনশীল করে। ইউরোপীয় আর্থিক সংগঠন (European Monetary Union) ১৯৩১ সালে মাস্ট্রিকট চুক্তির মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ একটি অভিন্ন মুদ্রা চালু করার কথা স্থির করে এবং ১৯৯৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে এই মুদ্রা ব্যবস্থা চালুও হয়। এই মুদ্রার নাম দেওয়া হয় ইউরো (Euro Currency) : ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মান প্রভৃতি দেশ এই গোষ্ঠীর অন্যতম শরিক। যে সমস্ত দেশগুলি এই ইউরো মুদ্রাকে গ্রহণ করেছে তারা সাধারণভাবে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়িত করেছে, যার নাম ইউরোপিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (European Central Bank ECB); ইউরোপীয় আর্থিক সংগঠন বা গোষ্ঠীর সদস্যরাষ্ট্রগুলির আর্থিক নীতি প্রণয়নের দায়িত্বও বর্তেছে এই ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ওপর। একই মুদ্রা চালু থাকার দরুন এই দেশগুলির মধ্যে বিনিময়হার পরিবর্তনের সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। এই ব্যবস্থাটি অবশ্যই একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা, এবং এর সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ বিশ্ববাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি।

৪.৬ সারাংশ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে স্বর্ণমান ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, সব দেশ থেকেই স্বর্ণমানের অবলুপ্তি ঘটে। ১৯৪৪ সালে ব্রেটস উডস্ সম্মেলনের শেষে জন্ম নেয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার, মূলত বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর তাগিদে সদস্য রাষ্ট্রের কোটা বা চাঁদার ভিত্তিতে গড়ে তোলা এক মজুত ভাণ্ডার, যা থেকে সদস্য রাষ্ট্ররা কোটার ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে লেনদেন ঘাটতির সমস্যা দূর করতে পারে এবং বিনিময়হারকে স্থিতিশীল রাখতে পারে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে কার্যকরী থাকতে পেরেছে, কিন্তু ১৯৭১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টালমাটাল পরিস্থিতিতে যে ডলার সঙ্কট সৃষ্টি হয়, তার ফলে জোর ধাক্কা খায় ব্রেটস উডস্ ব্যবস্থা এবং তা কার্যত ভেঙে পড়ে। ১৯৭৪ সালের পর আবার পরিবর্তনশীল বিনিময়হার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনশীল বিনিময়হার ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্বর্ণ ও ডলারের পরিবর্তে S.D.R. এক গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী মুদ্রা হিসেবে বিশ্ব বাজারে উপস্থিত হয়।

১৯৪৭ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের পাশাপাশি স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য উন্নতদেশের তহবিল নিয়ে গঠিত হয় বিশ্বব্যাঙ্ক। বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ দেয় বাণিজ্যিক নীতি অনুসরণ করে, ফলে সুদের হার থাকে অত্যন্ত বেশি, যার ফলে বহুক্ষেত্রেই এই ঋণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। এছাড়া বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান নীতির অভ্যন্তরে থাকে লুকানো কর্মসূচী যাতে বহুদেশ আর্থিক সার্বভৌমত্ব হারানোর আশঙ্কা থাকে।

বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার বর্তমান কোন শুদ্ধ ব্যবস্থা নেই, পরিবর্তে গড়ে উঠেছে এক মিশ্র ব্যবস্থা। কিছু কিছু দেশ আবার গোষ্ঠী গঠন করে সাধারণ মুদ্রা ব্যবহার করছে, যার ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে বিনিময় হার থাকছে স্থিতিশীল। এই সমস্ত দেশ আবার একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করে গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক নীতি গ্রহণ করছে।

৪.৭ অনুশীলনী

১। কি কি উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার গঠিত হয়েছিল? এই উদ্দেশ্যগুলি কি সফল হয়েছে? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখান।

২। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কিভাবে যে-সব সদস্যরাষ্ট্রের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি আছে তাদের সাহায্য করে থাকে? কাঠামোগত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার যে ঋণ দিয়ে থাকে তার শর্তাবলী কি কি?

৩। বিশ্বব্যাঙ্ক স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে কিভাবে সাহায্য করে থাকে সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। বিভিন্ন অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Bo Sodersten—International Economics

(২) Raulett J. G. : Money and Banking

(৩) Wilfred Ethier : Modern International Economic.

একক ১ ❐ সামাজিক দ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্য ; বিশুদ্ধ সামাজিক দ্রব্যের সুদক্ষ বণ্টন, বাহ্যিকতা

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্ম

১.৩ বাজারের ব্যর্থতা ও সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা

- ১.৩.১ সামাজিক দ্রব্য
- ১.৩.২ ক্রমহ্রাসমান ব্যয়যুক্ত শিল্প
- ১.৩.৩ বাহ্যিক প্রভাব

১.৪ সামাজিক দ্রব্য

- ১.৪.১ সামাজিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য
- ১.৪.২ ব্যক্তিগত দ্রব্যের সঙ্গে পার্থক্য
- ১.৪.৩ সামাজিক দ্রব্যের মোট চাহিদা, ভারসাম্য নির্ণয়ের সমস্যা
- ১.৪.৪ সামাজিক দ্রব্যের ভারসাম্য নির্ধারণ
- ১.৪.৫ ব্যক্তিগত দ্রব্যের দাম নির্ধারণের সঙ্গে পার্থক্য

১.৫ মিশ্র দ্রব্য

১.৬ বাহ্যিক প্রভাব

- ১.৬.১ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক
- ১.৬.২ ভোক্তা ও উৎপাদকের উপর
- ১.৬.৩ বাহ্যিকতার সমাধান

১.৭ সারাংশ

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে ঃ

- রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়
- বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা
- সামাজিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য
- ব্যক্তিগত দ্রব্যের সঙ্গে সামাজিক দ্রব্যের পার্থক্য
- সামাজিক দ্রব্যের ভারসাম্য নির্ণয়ের সমস্যা ও সমাধান
- বাহ্যিক প্রভাব

১.১ প্রস্তাবনা

অর্থনীতির অন্যতম প্রথম আলোচনার বিষয় হলো বাজার ব্যবস্থা এবং কীভাবে তার মধ্যে দিয়ে দাম নির্ধারণ ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হয়। এখানে 'দাম' হলো সেই অদৃশ্য হাত যা চৌমাথার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের মতো ক্রেতা ও বিক্রেতাকে চাহিদা ও যোগানের বিষয়ে নির্দেশ দেয়। প্রথম প্রজন্মের অর্থনীতিবিদরা, যাঁদের 'ক্লাসিকাল' বা ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ বলা হয়, তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছেন যে বাজার নিজে নিজেই ঠিকমতো কাজ করে। বরং সেখানে সরকারের হস্তক্ষেপ সুষ্ঠুভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে দেখা দেবে। তাদের এই বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় ছিল যে দেশের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো ছাড়া সরকারের আর কোনো কাজ থাকতে পারে বলে তাঁরা মনে করতেন না।

বাস্তবে দেখা গেল বাজার ব্যবস্থা সবসময় ঠিকভাবে কাজ করেনা, সেখানে প্রয়োজনে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। বিশেষত ১৯২৯-৩০ সালের বিশ্বমন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতা দেখাল যে প্রয়োজন হলে সরকারকে অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে হতে পারে। এই অভিজ্ঞতা অনেককেই সরকারি হস্তক্ষেপের বিষয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করল। ফলে দেশের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা

রক্ষা এবং দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা ছাড়াও সরকারকে অন্যান্য নানা কাজে হাত দিতে দিল। ফলে সরকার যেমন একদিকে জনগণের জন্য রাস্তা বা হাসপাতালের মতো পরিকাঠামো বানানো, অন্যদিকে সরাসরি দ্রব্য ও পরিষেবার উৎপাদনেও হাত দিল। পাশাপাশি জনগণের জন্য সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা চালু করলো। সরকার অর্থনীতিতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে, এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থই বা আসবে কোথা থেকে এই নিয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় **রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি**।

বর্তমান প্রায় বহু দেশই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করেছে। ফলে যে ব্যক্তি নানাভাবে বাজার ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেনি, সেই ব্যক্তির কল্যাণকেও কীভাবে সর্বাধিক করা যায়, সেটাও আজকের রাষ্ট্রের অর্থনীতির অংশ, বাস্তবে তথাকথিত বাজারভিত্তিক বলে পরিচিত এরকম অর্থনীতিতেও সমস্ত অর্থনৈতিক কাজের প্রায় এক তৃতীয়াংশ হয় সরকারি ক্ষেত্রের আওতায়। এই সমস্ত নানা কারণেই বাজার ব্যবস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনাও একান্ত জরুরি।

১.২ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্ম

রাষ্ট্রের বা সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলে তার আয়ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব দিয়ে। এখানে দেখা হয় সরকার কোন্ কোন্ খাতে অর্থব্যয় করবে এবং সেজন্য কোন্ কোন্ উৎস থেকে রাজস্ব পাবে। একে বলে সরকারের বাজেট। এটি সাধারণত একটি আর্থিক বছরের জন্য তৈরি করা হয়। এই বাজেটে সরকারের জন্য মূলত তিনধরনের কর্তব্য নির্দিষ্ট করা আছে।

(ক) **সম্পদ বিভাজন** : অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্য ও পরিষেবাগুলির মধ্যে উৎপাদনের সীমিত উপকরণগুলিকে এমনভাবে বণ্টন করা যাতে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়েই সর্বাধিক তৃপ্তি পায়।

(খ) **বণ্টন** : অর্থাৎ কর, সরকারি ব্যয় ও ভর্তুকির মাধ্যমে দেশের আয় ও সম্পদের বণ্টনে অসাম্য থাকলে তাকে দূর করা এবং সেই বণ্টনকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলা।

(গ) **স্থিতিশীলকরণ** : বাণিজ্যচক্রের ওঠানামার হাত থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করে, দেশের মধ্যে সার্বিক স্থিতিশীলতা আবার যাতে বেকারত্ব হার মুদ্রাস্ফীতি দূর হয়, দেশের আর্থিক উন্নতি দ্রুততর হয় এবং উন্নয়নের হার যথাসম্ভব বেশি হয়।

রাষ্ট্রের সামনে অন্যতম প্রধান সমস্যা থাকে যে কীভাবে এমন একটি আয় ও ব্যয়সংক্রান্ত আর্থিক নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে যা সম্পদ বিভাজন, বণ্টন ও স্থিতিশীলকরণের লক্ষ্যগুলিকে একই সঙ্গে পূর্ণ করতে পারে।

১.৩ বাজারের ব্যর্থতা ও সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা

এখন প্রশ্ন হল যে কেন সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়? নানা কারণেই বাজার সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। সেই কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি মুখ্য কারণকে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।

১.৩.১ সামাজিক দ্রব্য

দেশে উৎপাদিত দ্রব্য ও পরিষেবার মধ্যে যেগুলি সামাজিক দ্রব্য হিসাবে পরিচিত সেগুলির ক্ষেত্রে বাজার সুষ্টুভাবে কাজ করতে পারে না। সামাজিক দ্রব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি সবাই সমপরিমাণে ভোগ করতে পারেন। ফলে কেউই প্রকাশ করতে চান না যে তার জন্য তিন কত দাম দিতে প্রস্তুত। যেমন বাড়ির কাছাকাছি একটি পার্ক থাকলে সবাই সেখানে বেড়াতে পারেন কিন্তু তার জন্যে কে কত অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত তা জানা যায় না। ফলে বাজার চলতি দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়া অর্থাৎ চাহিদা যোগান প্রক্রিয়া এখানে অচল। এই দ্রব্যগুলি তাই সাধারণত সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়। এর পরেই আমরা এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি।

১.৩.২ ক্রমহ্রাসমান ব্যয়যুক্ত শিল্প

সামাজিক দ্রব্য ও পরিষেবা উৎপাদনে সাধারণত অত্যাধিক পরিমাণে স্থির ব্যয় বা প্রাথমিক বিনিয়োগ করতে হয়। সে তুলনায় দৈনন্দিন ব্যয় কম। অর্থাৎ অর্থনীতির ভাষায় পরিবর্তনশীল বা প্রান্তিক ব্যয় কম হয়। এছাড়াও বহু সময় এরা আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়তনের নানা সুবিধা ভোগ করে। সেজন্য এদের প্রান্তিক ব্যয় শুধু কম হয় তাই নয়, তা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ফলে এসমস্ত শিল্পে যদি প্রান্তিক ব্যয়ের সঙ্গে দামকে সমান করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়, তাহলে এদের স্থির ব্যয় বা প্রাথমিক বিনিয়োগের খরচ উঠবে না। এদের ক্ষেত্রে 'প্রান্তিক আয়-প্রান্তিক ব্যয়' নীতি মেনে এদের দাম নির্ধারণ করলে সরকারকে এ সমস্ত শিল্পের স্থির ব্যয় ভর্তুকি দিতে হবে। সেজন্য এধরনের উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে।

১.৩.৩ বাহ্যিক প্রভাব

অনেক দ্রব্য ও পরিষেবা উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সমাজের তার জন্য কিছু বাড়তি ক্ষতি বা লাভ হয়। যেমন কোনো রং কারখানা হয়তো পাশের নদীতে তার বিষাক্ত বর্জ্য ফেলে দিল। এর ফলে ঐ নদীর দশ মাইলের মধ্যে সমস্ত মাছ মরে গেল। তখন সেই দশমাইলের অধিবাসী সব জেলেদের জীবিকায় টান পড়বে। অর্থাৎ রং উৎপাদনের জন্য ব্যয়ের হিসাব করলে ঐ রং কারখানার মালিক ব্যক্তিগতভাবে বাজারের দামে

উৎপাদনের উপকরণগুলি কিনতে যে অর্থব্যয় করছেন, শুধু সেটুকুই ধরা হবে। কিন্তু বর্জ্যের জন্য জেলেদের আয় যতটা কমলো, তার আর্থিক মূল্য ধরা হবে না। কারণ ঐ খরচ রং উৎপাদনের খরচের মধ্যে ধরা নেই।

এক্ষেত্রে রং তৈরির প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় হবে মালিকের ব্যক্তিগত ব্যয় ও জেলেদের আয় হ্রাসের প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সামাজিক ব্যয়কে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

কোনো অর্থনীতিতে দুটিমাত্র শিল্প আছে ধরে নিয়ে আমরা যদি শুধুমাত্র বাজার দামের ভিত্তিতে শিল্পে ভারসাম্যের প্যারেটো কাম্যতার (Pareto efficiency) সূত্রটি লিখি, তা হবে এরকম :

$$\frac{\text{'ক' দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়}}{\text{'খ' দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়}} = \frac{\text{'ক' দ্রব্যের প্রান্তিক আয়}}{\text{'খ' দ্রব্যের প্রান্তিক আয়}}$$

$$= \frac{\text{'ক' দ্রব্যের দাম}}{\text{'খ' দ্রব্যের দাম}}$$

এক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে সমতা থাকলেও এর মধ্যে একটা মস্ত ভুল থেকে যাবে। আমরা 'ক' দ্রব্য বা রং উৎপাদনের বাজার চলতি ব্যক্তিগত ব্যয়টুকুই দেখছি, তার সামাজিক ব্যয়টা ধরছি না। সামাজিক ব্যয়টুকুও দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ে যুক্ত হলে 'ক' দ্রব্যের প্রকৃত ব্যয় হবে এই দুটির সমষ্টির সমান (ব্যক্তিগত ব্যয় + সামাজিক ব্যয়)। সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সমীকরণ কার্যকর হবে না, অর্থনীতিতে প্যারোটো কাম্যতা থাকবে না।

এই সামাজিক ব্যয়কে বলে বাহ্যিক প্রভাব। এত বোঝা তৃতীয় কোনো পক্ষের উপর পড়ে। বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে থাকলে কখনই রং উৎপাদনকারীর এই সামাজিক ব্যয় বাজার দাম মারফত আদায় করতে পারবে না। সেজন্য সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

অনুশীলনী - ১

(পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন)

১। রাষ্ট্রের অর্থনীতি কী?

২। বাজার অর্থনীতিতে সরকারের কাজগুলি কী?

৩। কী কী কারণে বাজার সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হতে পারে?

১.৪ সামাজিক দ্রব্য

এখন সামাজিক দ্রব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এমন অনেক দ্রব্য ও পরিষেবা আছে যেগুলির ক্ষেত্রে একবার অর্থব্যয় করলে বা বিনিয়োগ করলে বাড়তি একজন ভোক্তাকে বিনাব্যয়েই ঐ দ্রব্য ভোগ করার সুবিধা দেওয়া যায়। পৌরসভা যদি পথে আলো জ্বালানোর দায়িত্ব নেয়, একজন বাড়তি পথচারী ঐ আলোকিত পথটি ব্যবহার করলে পৌরসভার কোনো ব্যয় হবে না। এই ধরনের দ্রব্যকেই সামাজিক দ্রব্য বলে।

যে কোনো দেশে যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপন্ন হয়, তাদের সাধারণত দুভাগে ভাগ করা যায়—সামাজিক ও ব্যক্তিগত দ্রব্য ও পরিষেবা। যখন কোনো সরকার বা সরকার নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ (যেমন পৌরসভা) জনসাধারণের জন্য দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে, সেগুলিকে সামাজিক দ্রব্য বলে আর বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে, ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত দ্রব্য হল ব্যক্তিগত দ্রব্য।

১.৪.১ সামাজিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য

১। **অবিভাজ্যতা ঃ** এটি টুকরো টুকরো করে ব্যবহার করা যায় না। এই ব্যয় একটা স্তর পর্যন্ত অবিভাজ্য। ভোক্তার সংখ্যায় হ্রাস বা বৃদ্ধি হলে উৎপাদন ব্যয়ে অনুরূপ কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হবে না। যেমন 'ক' এর জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে তার প্রাথমিক ব্যয় বা স্থির ব্যয় এতো বেশি যে 'ক' এর পর 'খ' বিদ্যুতের গ্রাহক হলেও বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে না। আবার যদি 'ক' গ্রাহক তালিকা থেকে নাম কাটিয়ে নেয়, তাহলেও উৎপাদন ব্যয় কমবে না।

২। **প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীনতা ঃ** এক্ষেত্রে এক ব্যক্তির ভোগ অপর ব্যক্তির ভোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না বা অপরের ভোগের পরিমাণ কমিয়ে দেয় না। যেমন বাজার দামে যে ব্যক্তির বেশি টাকা আছে, তিনি বেশি চাল কিনতে পারেন। কিন্তু যাঁর বেশি টাকা আছে, তিনি বেশি কর দিচ্ছেন বলে অধিক প্রতিরক্ষা দাবি করতে পারেন না। কপর্দকহীন রাস্তার ভিক্ষুক থেকে সর্বোচ্চ করদাতা—দুজনেই সমান প্রতিরক্ষা পাবেন।

৩। **বাদ দেওয়া যাবে না ঃ** দাম না দিলেও সামাজিক দ্রব্যের ভোগ থেকে কাউকে বাদ দেওয়া না। যেমন যদি কোনো রাস্তায় পথকর থাকে তাহলে আলাদা কথা। নইলে করদাতা এবং করদাতা নন এরকম পথচারী—দুজনেই রাস্তাকে সমানভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

বিশুদ্ধ বা আদর্শ সামাজিক দ্রব্যের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই থাকবে।

১.৪.২ ব্যক্তিগত দ্রব্যের সঙ্গে পার্থক্য

পূর্বোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশুদ্ধ সামাজিক দ্রব্যকে বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত দ্রব্যের থেকে পৃথক করে দেয়। প্রথমত, ব্যক্তিগত দ্রব্য বিভাজ্য। কেউ চাল কিনতে গেলে ৫ কিলো চাল কিনতে পারেন আবার ৫ কুইন্টাল চালও কিন্তু পারেন।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত দ্রব্যের ভোগ **প্রতিদ্বন্দ্বিতাযুক্ত**। কোনো ক্রেতা বা ভোক্তা ব্যক্তিগত দ্রব্যের যতটা কিনবেন বা ভোগ করবেন, অন্যদের জন্য সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকিটা পড়ে থাকবে। যেমন বাজারে যদি ২০টা বেনারসী শাড়ি আসে, কোনো ক্রেতা ৩টি শাড়ি কিনলে বাকি ক্রেতাদের জন্য (২০-৩) না ১৭টি শাড়ি পড়ে থাকবে।

তৃতীয়ত, কোনও ব্যক্তিগত দ্রব্য ভোগ করতে গেলে তার জন্যে ক্রেতা বা ভোক্তাকে যথাযোগ্য দাম দিতে হবে। যিনি দাম দিতে পারবেন না তিনি দ্রব্যটির ভোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।

অঙ্কের ভাষায় :

ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে :

মোট ব্যক্তিগত দ্রব্যের পরিমাণ = শ্রীমতী 'A' -এর ভোগের পরিমাণ + শ্রীমতী 'B' এর ভোগের পরিমাণ।

∴ 'A' এর ভোগের পরিমাণ = মোট পরিমাণ – 'B' এর ভোগের পরিমাণ।

'A' এর ভোগের হ্রাস (বা বৃদ্ধি) হলে B এর ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পাবে।

অনুরূপভাবে, 'B' এর ভোগের পরিমাণ = মোট পরিমাণ—'A' এর ভোগের পরিমাণ।

অর্থাৎ মোট পরিমাণ স্থির আছে বলে একজনের ভোগের পরিমাণ বাড়লে (বা কমলে) অন্যজনের ভোগের পরিমাণ কমবে (বা বাড়বে)।

যেমন শ্রীমতী A বাজার থেকে বেশি মাছ কিনলে শ্রীমতী 'B' এর জন্যে বাজারে মোট মাছের পরিমাণ কমে যাবে। বিপরীতে, **সামাজিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ঃ**

মোট সামাজিক দ্রব্য 'A' এর ভোগের পরিমাণ = 'B' এর ভোগের পরিমাণ।

অর্থাৎ একজন ভোক্তা ভোগ করলেও অন্যজনের জন্য দ্রব্যের যোগান হ্রাস পাচ্ছে না। দুজনেই এক পরিমাণে ভোগ করছেন।

যেমন পাড়ার পার্কে শ্রীমতী 'A' বেশি বেড়ালে শ্রীমতী 'B' এর বেড়াবার জায়গা কমে যাবে না। সামাজিক দ্রব্যের এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যে এই ধরনের দ্রব্যের বাজারের মোট চাহিদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে যেভাবে বাজারের মোট চাহিদা বার করা হয় সামাজিক দ্রব্যের বেলায় একটু অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

চিত্রের সাহায্যে আমরা সামাজিক ও ব্যক্তিগত দ্রব্যের চাহিদা নির্ধারণের এই পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি।

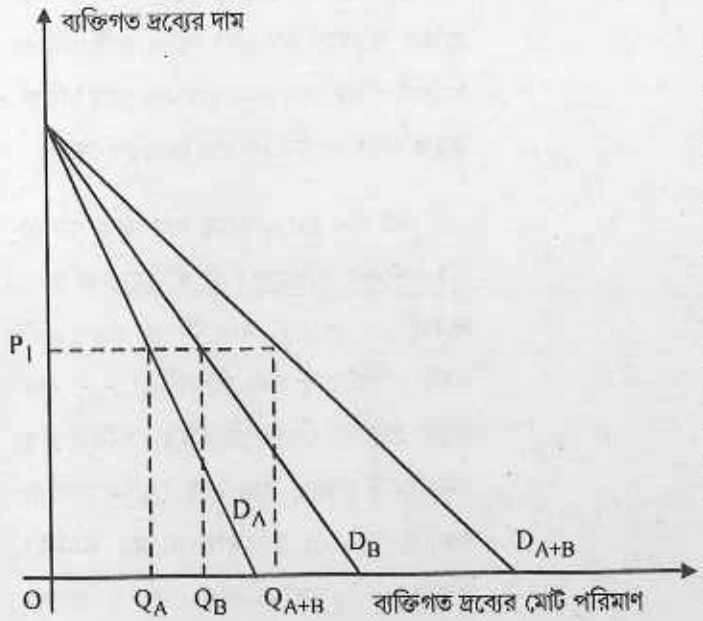

চিত্র ১.১
ব্যক্তিগত দ্রব্যের মোট চাহিদা

আগের মতোই ধরা যাক বাজারে কেবল দুজন ক্রেতা আছেন—শ্রীমতী 'A' ও শ্রীমতা 'B' ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমরা অনুভূমিক যোগফলের মাধ্যমে তাঁদের মোট চাহিদা রেখা পাবে। মনে করি চিত্র ১.১ এ অনুভূমিক অক্ষে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে দাম প্রদর্শিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে শ্রীমতী 'A'-এর চাহিদারেখা D_A ও 'B' এর চাহিদা রেখা D_B। যে কোনো দামে দুজনের মোট চাহিদা হবে D_{A+B}। যেমন যদি বাজার দাম হয় P। তা হলে শ্রীমতী 'A' এর চাহিদা OQ_A, যা আমরা P দামের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী 'A' র চাহিদা রেখা থেকে পাচ্ছি। অনুরূপভাবে ঐ দামের শ্রীমতী 'B'-এর চাহিদা অনুভূমিকভাবে যোগ করে পাচ্ছি Q_{A+B}।

যখন বাজার দাম OP_1, তখন দুজনেই একক পিছু OP_1 দাম দিচ্ছেন এবং মোট পরিমাণ OQ_{A+B} দুজনের মধ্যে OQ_A ও OQ_B হিসাবে বণ্টিত হচ্ছে।

$$\therefore OQ_{A+B} = OQ_A + OQ_B$$

এইভাবে প্রতিটি দামের জন্য আমরা শ্রীমতী A ও B মোট চাহিদা ও চাহিদা রেখাটি নির্ণয় করতে পারবো।

১.৪.৩ সামাজিক দ্রব্য : মোট চাহিদা

আমরা দেখেছি সামাজিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য এমনই যে তার পরিমাণ দুজনের জন্যই স্থির থাকে। যোগানের পরিমাণ স্থির থাকে বলে আমরা যেভাবে ব্যক্তিগত দ্রব্যের মোট চাহিদা পেয়েছিলাম, এখানে তা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পরিমাণ স্থির থাকে বলে উল্লম্ব সংযোজনের মধ্যে দিয়ে আমরা মোট চাহিদা স্থির করি।

চিত্র—১.২ দেখুন। এখানে উল্লেখ অক্ষে সামাজিক দ্রব্যের দাম ও অনুভূমিক অক্ষে সামাজিক দ্রব্যের পরিমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। এখানে D_A হচ্ছে শ্রীমতী 'A' এর চাহিদা রেখা, D_B 'B'-র। যেহেতু দুজনের জন্যই এই দ্রব্যের পরিমাণ স্থির এবং সমান, তাই আমরা সংশ্লিষ্ট পরিমাণের জন্য দুজনের মোট চাহিদা উল্লম্ব সংযোজনের মাধ্যমে নির্ধারণ করছি।

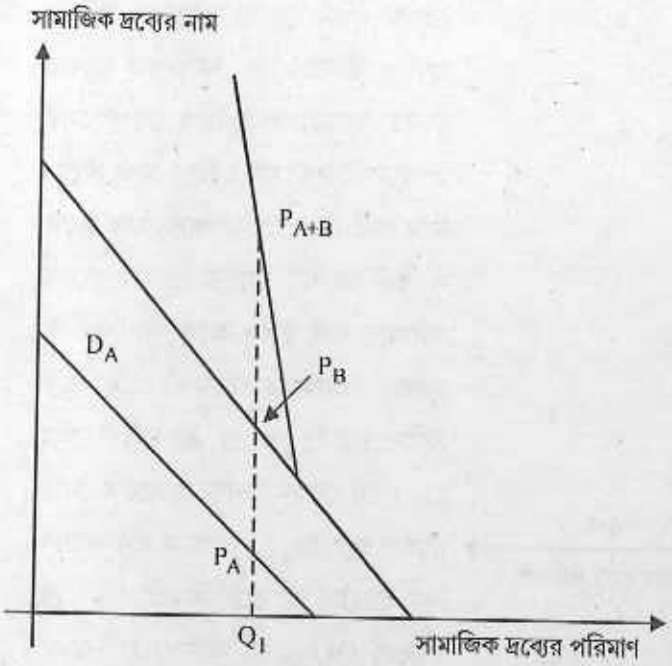

চিত্র ১.২
সামাজিক দ্রব্যের মোট চাহিদা নির্ধারণ

ধরা যাক OQ_1 হচ্ছে সামাজিক দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ। ঐ পরিমাণের জন্য শ্রীমতী A, P_AQ_1 দাম দিতে প্রস্তুত। ঐ একই পরিমাণের জন্য শ্রীমতী B P_{Bq} দাম দিতে প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে OQ_1 পরিমাণের জন্য মোট চাহিদা দাম হবে 'A' র চাহিদা দাম ও 'B' -র চাহিদার দামের সমষ্টি। অর্থাৎ OQ_1 সামাজিক দ্রব্যের জন্যে শ্রীমতী 'A' ও শ্রীমতী 'B' যে দাম দিতে প্রস্তুত, তা হল 'A' -র চাহিদা + 'B' -র চাহিদা দাম

o অথবা $Q_1P_A+Q_1P_B = Q_1P_{A+B}$

কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে ঐ বিন্দুতে দুজনের ভোগের পরিমাণই OQ_1 এর সমান।

এইভাবে বিভিন্ন পরিমাণ সামাজিক দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদ্বয় ব্যক্তিগতভাবে যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত সেগুলি যোগ করলে, বাজারে সামাজিক দ্রব্যের জন্য ক্রেতারা মোট কী দাম দিতে প্রস্তুত বা তা বার করা সম্ভব হবে এবং বাজারের চাহিদা। রেখাটি অঙ্কন করাও সম্ভব হবে।

অনুশীলনী—১

১। সামাজিক দ্রব্য কাকে বলে?

২। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দ্রব্যের পার্থক্য কী?

৩। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দ্রব্যের মোট চাহিদা কীভাবে নির্ধারণ করবেন? চিত্রসহ দশটি বাক্যে লিখুন।

৪। তিনটি সামাজিক দ্রব্যের উদাহরণ দিন।

৫। নীচের দ্রব্যগুলির কোনটি সামাজিক ও কোনটি ব্যক্তিগত দ্রব্য?

(ক) চাল (খ) মাছ (গ) বিদ্যুৎ (ঘ) প্রতিরক্ষা

১.৪.৪. সামাজিক দ্রব্যের ভারসাম্য নির্ণয়ের সমস্যা

সামাজিক দ্রব্যের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় একান্ত জরুরি। অর্থাৎ ব্যক্তিগত দ্রব্যের ন্যায় একটি সামাজিক দ্রব্যও কী পরিমাণে উৎপন্ন হবে এবং ভোক্তারা তারজন্য কী পরিমাণ দাম দেবে, সেগুলি জানাও বিশেষ দরকার। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভারসাম্য নির্ণয়ের কিছু সমস্যা আছে। আমরা দেখেছি সামাজিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হল অবিভাজ্যতা, বাদ-না -দেওয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনতা অর্থাৎ সবাই সমান পরিমাণে ভোগ করবেন এবং কাউকে বাদ দেওয়া চলবে না। ফলে সবাই জানে যে সে যদি দাম না-ও দেয়, দ্রব্যটি ভোগের ক্ষেত্রে সে বাদ পড়বে না। এর ফলে কোনো ব্যক্তি কতটা দ্রব্য চায় এবং তারজন্য প্রকৃতপক্ষে সে কতটা দাম দিতে প্রস্তুত তা জানা কঠিন। সেজন্য সামাজিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোনো প্রকাশিত চাহিদা রেখা থাকেনা। এর পাশাপাশি আসে 'বিনিপয়সার ভোজের' সমস্যা। ধরা যাক কোনো বাড়িতে বাচ্চার সংখ্যা বেশি। অন্য কোনো বাড়িতে একটিই শিশু। ফলে প্রথম বাড়িটিতে পার্কের চাহিদা দ্বিতীয় বাড়িটির বাড়িটির তুলনায় বেশি হবে। কিন্তু প্রথম বাড়ির গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী 'A' জানেন যে সরকার বা পৌরসভা পার্কের ব্যবস্থা করলে তিনিও বঞ্চিত হবেন না। ফলে তিনি অধিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গোপন রাখতে চেষ্টা করবেন। তিনি গোপন করবেন এই ভেবে যে তাঁর অধিক প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ করে দিলে যদি দামের অধিক অংশ তাঁর উপর চাপে! ফলে সামাজিক দ্রব্যের মোট চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করা একটা বড়ো সমস্যা হয়ে ওঠে।

যদি বা সামাজিক দ্রব্যের পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করা গেল, তাহলেও থাকে আরেক সমস্যা। উৎপাদন ব্যয়ের কোন্ অনুপাত কে বহন করবে? বা ব্যয়ের খরচ তুলতে কে কত কর দেবে।

১.৪.৫ সামাজিক দ্রব্যের ভারসাম্য নির্ধারণ

যদি কখনও সামাজিক দ্রব্যের জন্য ভোক্তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা জানা থাকে তাহলে অবশ্য চাহিদা

যোগান নীতি প্রয়োগ দ্বারা ভারসাম্য নির্ধারণ করা যায়। অবশ্য ব্যক্তিগত দ্রব্যের ভারসাম্যের সঙ্গে কিছু পার্থক্য আছে। ধরা যাক আমাদের অর্থনীতিতে আগের মতো শ্রীমতী 'A' ও 'B' এই দুজন ব্যক্তি আছেন। আরো ধরে নেওয়া যাক কোনো একটি সামাজিক দ্রব্যের জন্য শ্রীমতী 'A' ও 'B' -র চাহিদা রেখা যথাক্রমে D_A ও D_B। ঐ দুটি ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থেকে উলম্ব সংযোজনের মাধ্যমে মোট চাহিদা রেখা D_{A+B} পাওয়া গেল। এর আগেই আমরা মোট চাহিদা নির্ধারণের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

পাশাপাশি মনে করি সামাজিক দ্রব্যের যোগান রেখা SS। যোগান রেখা চাহিদা রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং মোট যোগান OQ । দুজনে ঐ পরিমাণই ভোগ করবেন। OQ পরিমাণের জন্য শ্রীমতী A দেবেন QE_1। দাম যা আমরা তাঁর চাহিদা রেখা থেকে পাচ্ছি। দাম অক্ষ থেকে দেখছি $OE_1 = OP$। ∴ শ্রীমতী 'A' OP_A দাম দিতে প্রস্তুত। একই যুক্তিতে শ্রীমতী B, $OE_2 = OP_B$ দাম দিতে রাজি।

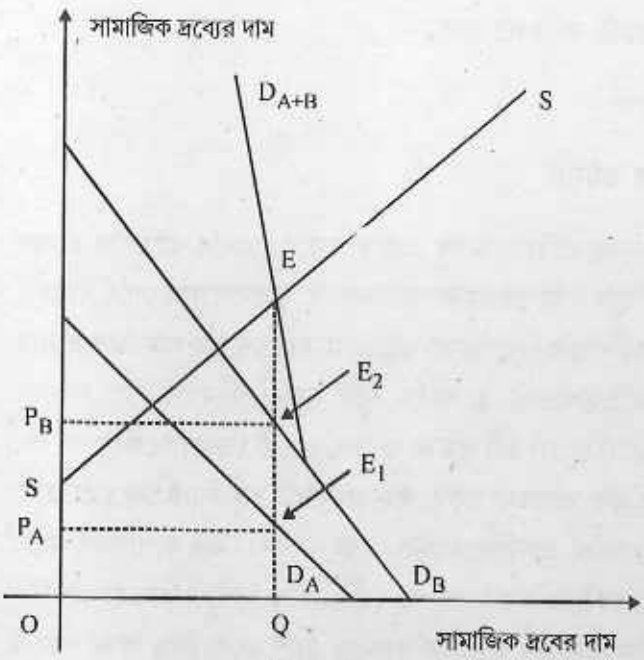

চিত্র ১.৩
সামাজিক দ্রব্যের ভারসাম্য দাম নির্ধারণ ও দামের বণ্টন

১.৪.৬ ব্যক্তিগত দ্রব্যের দাম নির্ধারণের সঙ্গে পার্থক্য

ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ধরা যাক প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় সমহারে বাড়ছে। তাহলে যোগান রেখাটি অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল একটি রেখা হবে। ধরা যাক রেখা PS ও মোট চাহিদা রেখা D_{A+B}। উভয়ের ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হবে। এখানে বাজার নির্ধারিত দামটি উভয় ক্রেতার জন্যই সমান। ঐ দাম বজায় থাকলে শ্রীমতী A কিনতে প্রস্তুত OQ_A পরিমাণ। অনুরূপ যুক্তিতে শ্রীমতী B কিনবেন OQ_B পরিমাণ। সুতরাং ব্যক্তিগত দ্রব্যের সঙ্গে সামাজিক দ্রব্যের ভারসাম্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়া ভিন্ন।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক দ্রব্যের ভারসাম্য নির্ণয়ের তিনটি মৌলিক পার্থক্য আছে।

১। **সামাজিক দ্রব্যের** ক্ষেত্রে সকল ক্রেতার জন্য দ্রব্যের পরিমাণ সমান। কিন্তু এক একজন ক্রেতাকে দামের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বহন করতে হবে। অর্থাৎ দ্রব্যটির মোট দাম দুজন ক্রেতা যৌথভাবে বহন করে।

২। **ব্যক্তিগত দ্রব্যের** ক্ষেত্রে সকলের জন্য নির্ধারিত বাজার দামটি সমান। এক একজন ভোক্তা চলতি বাজার দামে ভিন্ন, ভিন্ন, পরিমাণ ক্রয় করবে এবং ভারসাম্য উৎপাদনটির জন্য উভয় ক্রেতাই সমান দাম দেয়।

৩। অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Samuelson) এর মতে যেহেতু একটি দ্রব্যের জন্য ক্রেতা যে দাম দেয় তা দ্রব্যটি থেকে ক্রেতা যে প্রান্তিক উপযোগ (প্রাঃ উঃ) পান তা নির্দিষ্ট করে এবং, যেহেতু দ্রব্যটি কি দামে যোগান হয় তা নির্ভর করে দ্রব্যটি প্রান্তিক ব্যয়ের উপর। সেইজন্য ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থায় দ্রব্যটির প্রাঃ ব্যয় শ্রীমতী 'A' এর প্রাঃ উঃ এবং শ্রীমতী 'B' এর সমান হয়। অর্থাৎ দ্রব্যটির প্রাঃ ব্যয় = শ্রীমতী 'A' এর প্রাঃ উঃ = শ্রীমতী 'B' এর প্রাঃ উঃ। কিন্তু সামাজিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থায় দ্রব্যটির প্রাঃ ব্যয়, শ্রীমতী A এর ও শ্রীমতী B এর প্রাঃ উঃ এর সমষ্টির সমান হয়। অর্থাৎ দ্রব্যটির প্রাঃ ব্যয় = শ্রীমতী 'A' এর প্রান্তিক উপভোগ + শ্রীমতী B এর প্রান্তিক উপযোগ।

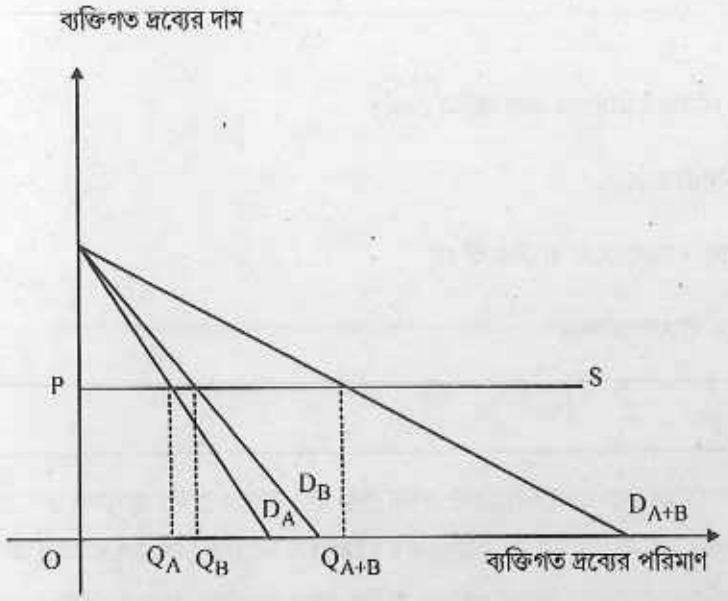

চিত্র ১.৪
ব্যক্তিগত দ্রব্যের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ

১.৫ মিশ্র দ্রব্য

বিশুদ্ধ সামাজিক দ্রব্য আর বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত দ্রব্যের মাঝামাঝি মিশ্র দ্রব্যের একটি শ্রেণী আমরা ভাবতে পারি। সেগুলির ক্ষেত্রে বাদ দেওয়ার নীতি কাজ করে। অর্থাৎ দাম না দিলে জিনিষটি ভোগ করার অধিকার পাওয়া যাবে না। কিন্তু দাম দেওয়ার পর সবাই সমপরিমাণে ভোগ করছেন। সেখানে আর কোনো তারতম্য হচ্ছে না। এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। যেমন ধরুন ক্লাবের সাঁতারের পুকুরটির ব্যবহার। যে চাঁদা দিয়ে ক্লাবের সদস্য হচ্ছে না, সে ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু একবার কেউ সদস্য হয়ে গেলে তাঁর সাঁতারের অধিকার বাকি সদস্যদের সঙ্গে সমান।

সবশেষে আমরা এমন কিছু ক্ষেত্র ভাবতে পারি যেখানে দ্রব্যগুলি বাজারের চাহিদা-যোগানের কাঠামোর মধ্যে উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু সেগুলি সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে সরকার উচ্চহারে ভর্তুকি দিচ্ছে যেমন ডাক-ব্যবস্থা, রেল পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সস্তায় আবাসন ইত্যাদি। এগুলির জন্য ক্রেতাকে দাম দিতে হচ্ছে, অতএব বাদ দেওয়ার নীতি কাজ করছে। কিন্তু সেই দাম এতটাই ভর্তুকিযুক্ত যে সেখানে বাজার ব্যবস্থার নীতিতে মুনাফা সর্বোচ্চ করে দাম নির্ধারিত হচ্ছে না। এ, ধরনের দ্রব্যকে রিচার্ড মাসগ্রেভ বলেছেন 'মেরিট দ্রব্য'।

অনুশীলনী—১

১। সামাজিক দ্রব্যের ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন কেন?

২। কীভাবে ঐ ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হবে?

৩। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দ্রব্যের ভারসাম্যের পার্থক্য কী?

৪। মিশ্র দ্রব্য কী? উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

১.৬ বাহ্যিক প্রভাব

যখন বাজার ব্যবস্থার মধ্যে কোনো দ্রব্য বা পরিষেবা বেচা-কেনা করা হয়, অনেক সময় তার সমস্ত ব্যয় (বা সুবিধা) বাজার দামের মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। যেমন রং কারখানায় সামাজিক ব্যয়ের উদাহরণ আমরা আগেই দিয়েছি। আবার অনেক উৎপাদনে সমাজ বা অন্য কোনো ভোক্তা বা উৎপাদক লাভবান হতেও পারেন। যেমন পাশাপাশি যদি একটি আপেল বাগিচা এবং একজন মৌমাছি পালক থাকেন। তবে কোনো বাড়তি ব্যয় ছাড়াই একজন অন্যজনের উৎপাদন বাড়িয়ে দেবেন। মৌমাছিরা পাশেই থাকায় পরাগসংযোগ আরো বেশি করে হবে বলে আপেলের উৎপাদন বাড়বে। আবার আপেলবাগিচা পাশেই থাকায় মৌমাছি পালকের মধুর উৎপাদনও বাড়বে। দুজনেই এই সুবিধা পাচ্ছেন বিনা ব্যয়ে। ফলে বাস্তবে তাঁদের একক পিছু উৎপাদন ব্যয় কমছে।

বাহ্যিকতা উপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য বা পরিষেবার ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়াও কোনো তৃতীয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার জন্য সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করছেন।

বাহ্যিকতাকে সাধারণত চারভাগে ভাগ করা হয়।

১.৬.১ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রভাব

কোন একটি দ্রব্যের কেনা-বেচার প্রক্রিয়ার মধ্যে না থেকেও যদি তৃতীয় কোনো পক্ষ সুবিধা পান তাহলে তা

হবে ধনাত্মক বাহ্যিক প্রভাব। আর যদি তিনি অসুবিধা ভোগ করেন তাহলে বলা হবে ঋণাত্মক বাহ্যিক প্রভাব। কোনো একজন পয়সা খরচ করে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র কিনতেন তাঁর প্রতিবেশীরা আগুন ছড়ানোর হাত থেকে বাঁচবেন। এটি ধনাত্মক বাহ্যিক প্রভাব আর রং কারখানার পূর্বোক্ত উদাহরণে মাছ মরে যাওয়াটা হলো ঋণাত্মক বাহ্যিক প্রভাব।

১.৬.২ ভোক্তা ও উৎপাদকের উপর প্রভাব

যে সমস্ত ভোগকারী অন্যের ভোগ দ্বারা প্রভাবিত হবেন, সেগুলি হল ভোক্তার উপর বাহ্যিক প্রভাব এবং উৎপাদনকারী যদি অন্যের উৎপাদন দ্বারা প্রভাবিত হন তা হলে তা হবে উৎপাদকের উপর বাহ্যিক প্রভাব।

আমার বাড়ি সাত-সকালে উচ্চগ্রামে রেডিও চালালে পাশের বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে যায়। এটা হল ভোক্তার উপর ঋণাত্মক বাহ্যিক প্রভাব। মধুর সুরে রেডিওতে ভৈরবী বাজালে তা হবে ভোক্তার উপর ধনাত্মক বাহ্যিক প্রভাব। উৎপাদকের দিক থেকে দেখলে পূর্বে উল্লিখিত রং কারখানায় উদাহরণটি হল উৎপাদকের উপর ঋণাত্মক বাহ্যিক প্রভাব আর আপেল বাগিচার উদাহরণটি হল ধনাত্মক বাহ্যিক প্রভাবের উদাহরণ।

১.৬.৩ বাহ্যিকতার সমাধান

উপরে আলোচিত বাহ্যিকতার বিষয়টি অর্থনীতির সবচেয়ে নতুন শাখাগুলির অন্যতম। কি করে বাহ্যিক সামাজিক প্রভাবকে ব্যক্তিগত ব্যয় বা ব্যক্তিগত সুবিধার সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রকৃত ব্যয় বা সুবিধা নিরূপণ করা যায় তার নানান পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছে। এরকম একটি পদ্ধতি হতে পারে বাহ্যিকতার অভ্যন্তরীকরণ, যার ভিত্তিতে চূড়ান্ত দাম নির্ধারণ করা হবে। এজন্য সরকার যে ঋণাত্মক বাহ্যিক প্রভাব সৃষ্টি করছে তার উপর কর বসাতে পারে আর যে ধনাত্মক বাহ্যিক প্রভাব সৃষ্টি করছে, তাকে ভর্তুকি দিতে পারে। এইভাবে কর ও ভর্তুকি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে উৎপাদন একটি কাম্য স্তরে আসতে পারে। ঋণাত্মক বাহ্যিক প্রভাব সৃষ্টিকারী উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর বসালে উৎপাদন কমবে আর ধনাত্মক বাহ্যিক প্রভাব সৃষ্টিকারী উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভর্তুকি উৎপাদন বাড়বে। অন্য একটি পদ্ধতি হল যে সমস্ত সম্পদের কোনো নির্দিষ্ট মালিক নেই বলে যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলির মালিকানা নির্ধারণ করে গোষ্ঠীর হাতে দিয়ে দেওয়া। যেমন নদীটিকে কেউ দেখাশুনো করার নেই বলে যদি রং কারখানা বর্জ্য ফেলে বা জেলে মাছ ধরে। সেই যথেচ্ছ ব্যবহার রুখতে নদীর মালিকানা রং কারখানা বা জেলেদের দেওয়া যেতে পারে। তাহলে একজন যেমন ইচ্ছেমত বর্জ্য ফেলতে পারবে না। অন্যজন যথেচ্ছ মাছও ধরতে পারবে না, বা একজন অন্যজনের থেকে ক্ষতির মূল্য আদায় করে নেবে।

দূষণ সম্পর্কে সাম্প্রতিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কীভাবে দূষণকারীকে দূষণের ব্যয় বহন করতে বাধ্য করা যায় বা সম্পদের অপব্যবহার রোধ করা যায়, সেই আলোচনায় এই বিষয়গুলি বারবার উঠে আসছে।

অনুশীলনী—১

১। উদাহরণসহ বাহ্যিকতার ব্যাখ্যা দিন।

২। বাহ্যিকতা থাকলে দাম নির্ণয় করা কেন কঠিন হয়ে ওঠে।

৩। পার্থক্য নির্ণয় করুন :

(ক) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বাহ্যিক প্রভাব

(খ) উৎপাদক ও ভোক্তার উপর বাহ্যিক প্রভাব

৪। প্রত্যেক ধরনের বাহ্যিক প্রভাবের অন্তত দুটি করে উদাহরণ দিন।

৫। ভেবে দেখুন, আপনার কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আপনি পূর্বোক্ত কোন ধরনের বাহ্যিক প্রভাবের মধ্যে ফেলতে পারেন কিনা।

১.৭ সারাংশ

উপরের এককটি পাঠ করে আমরা জানলাম, বাজার অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝানো হয়। যেহেতু বাজার অর্থব্যবস্থা, অর্থনীতিতে বর্তমান সমস্ত জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম, সেইকারণেই অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। তাই রাষ্ট্রের সামনে প্রধান সমস্যা হল এমন একটি আয়ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক নীতি গ্রহণ করা যা থেকে সম্পদ বিভাজন, বণ্টন এবং স্থিতিশীলকরণের লক্ষগুলো একই সঙ্গে পূরণ হয়। কিন্তু মোট উৎপাদিত দ্রব্য ও পরিষেবার মধ্যে যেগুলি সামাজিক দ্রব্য হিসাবে পরিচিত সেইগুলির ক্ষেত্রে চাহিদা এবং যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে, উহার দাম নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সামাজিক দ্রব্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হল অবিভাজ্যতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীনতা। উহা ছাড়াও কোন ব্যক্তি কোন দাম প্রদান না করেই সামাজিক দ্রব্য ব্যবহার করতে পারেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই সামাজিক দ্রব্যকে ব্যক্তিগত দ্রব্যের থেকে আলাদা করেছে। এরপরে আমরা দেখব, সামাজিক দ্রব্যের দাম কীভাবে নির্ধারিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সামাজিক দ্রব্য ভোগ করার জন্য কোন ব্যক্তি কতটা দাম নিতে প্রস্তুত। এরপর আমরা আলোচনা করলাম মিশ্র দ্রব্য নিয়ে যেখানে, সামাজিক দ্রব্য এবং ব্যক্তিগত দ্রব্য উভয়েরই গুণ বর্তমান। অবশেষে আমরা আলোচনা করলাম অর্থনীতিতে বাহ্যিক প্রভাব নিয়ে যেখানে প্রভাবকে দুইভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রভাব এবং ভোক্তা ও উৎপাদকের উপর প্রভাব। আমরা আরো দেখলাম যে, কীভাবে বাহ্যিকতার সমাধান সম্ভব।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। R.A. Musgrave & P.B. Musgrave : Public Finance in Theory and Practice : Mcgraw Hill International, 1989.

Chapters 1,4

২। J.F. Due & A.F. Friend loender : Government Finance : Economics of the Public sector, AITBS Publishers, New Delhi, 1994.

Chapters 3, 4.

৩। Subrata Ganguly : Public Finance : A Normative approach, Nababharat Publishers, 1991,

Chapter—3.

একক ২ ❐ করারোপ ও সরকারি ব্যয়ের নীতি; সুবিধার নীতি ও সামর্থ্যের নীতি

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ করারোপের নীতি

২.৩ সুবিধার নীতি

২.৩.১ বাওয়েনের সমাধান

২.৩.১ লিন্ডসের সমাধান

২.৩.৩ সুবিধার নীতি : সমস্যা

২.৪ সামর্থ্যের নীতি

২.৪.১ সামর্থ্য বলতে কী বুঝবো?

২.৪.২ সামর্থ্য মানে সমান ত্যাগ

২.৪.৩ সমপরিমাণ ত্যাগ

২.৪.৪ সমানুপাতিক ত্যাগ

২.৪.৫ সমান প্রান্তিক ত্যাগ

২.৪.৬ সমান ত্যাগ—চিত্রের সাহায্যে

২.৪.৭ চিত্রের সাহায্যে আলোচনা সমান পরিমাণে ত্যাগ

২.৫ সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি

২.৬ আদর্শ করনীতির বৈশিষ্ট্য

২.৭ সরকারি ব্যয়ের নীতি

২.৮ সারাংশ

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে জানা যাবে :

- করারোপের নীতিগুলি কী
- সুবিধার নীতি, লিণ্ডল সমাধান কী বলছে
- সক্ষমতার নীতি বলতে কী বোঝায়
- এইগুলি কতটা বাস্তবসম্মত?
- সরকারের ব্যয়ের নীতি কী হওয়া উচিত।

২.১ প্রস্তাবনা

আগের এককেই আমরা দেখেছি নানান কারণে সরকার দেশের অর্থনীতিকে পুরোপুরি বাজার ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দিতে পারে না। শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা বা প্রতিরক্ষা নয়, সামাজিক ন্যায়, কল্যাণ এবং আর্থিক উন্নয়নের জন্য অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। যেমন শহরের দরিদ্রদের বিনামূল্যে শিক্ষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয় এবং নানা প্রকার সামাজিক দ্রব্য উৎপাদন করতে হয়। এজন্য সরকারের অর্থ ব্যয় হয়। এই অর্থ আসবে কোথা থেকে? স্বাভাবিকভাবে প্রথমেই মনে আসে জনসাধারণের উপর কর আরোপ করার কথা। কিন্তু কর আরোপ করলে জনসাধারণের উপর সেই করের বোঝাও চাপবে। করের বোঝা বহন করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা সকলের এক নাও হতে পারে।

কী নীতির ভিত্তিতে কর আরোপ করা হবে, সেই নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এর মধ্যে মূল তিনটি ধারা হল সুবিধার নীতি, সামর্থ্যের নীতি এবং সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি। আমরা এই নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। সেইসঙ্গে পূর্বোক্ত প্রতিটি নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধার দিকগুলিও তুলে

ধরবো। এরপর আমরা একটি আদর্শ করনীতির রূপরেখা উপস্থিত করবো। সেইখান থেকে আমরা সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কী নীতি গৃহীত হবে, সেই বিষয়ে এসে আলোচনা শেষ করবো।

২.২ করারোপের নীতি

কর আরোপের ক্ষেত্রে আমরা মূলত তিনটি নীতির কথা ভাবতে পারি।

(ক) **সুবিধার নীতি :** এই নীতি অনুযায়ী সরকারি ব্যয় থেকে যে যেরকম সুবিধা পাবেন সেই অনুযায়ী কর দেবেন।

(খ) **সামর্থ্যের নীতি :** এই নীতি বলছে করপ্রদান নাগরিকের কর্তব্য এবং স্বেচ্ছায় দেওয়ার (বা না দেওয়ার) বিষয় নয়। প্রত্যেককে তার সামর্থ্য অনুযায়ীই কর দিতে হবে।

(গ) **সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি :** এটিও অনেকটা সুবিধার নীতির কাছাকাছি। সরকারি পরিষেবা প্রদানে যে মোট ব্যয় হচ্ছে, পরিষেবার ব্যবহারকারীরা ব্যবহারের অনুপাতে সেই ব্যয় বহন করবে।

২.৩ সুবিধার নীতি

এই নীতিতে লোকে স্বেচ্ছায় কর প্রদান করবে বলে মনে করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি সরকারি ব্যয় থেকে যে সুবিধা পাচ্ছে বলে মনে করবে, সেই অনুযায়ী সে কর দেবে বা সংশ্লিষ্ট সরকারি ব্যয়ের প্রয়োজনীয় অংশ বহন করবে। যে যেমন সুবিধা পাচ্ছে তার ভিত্তিতে যেহেতু করদাতা স্বেচ্ছায় কর দেবে, সেজন্য অনেকে একে স্বেচ্ছা বিনিময় নীতিও বলেন। এই নীতির ভিত্তিতে কীভাবে করবণ্টন হবে তার দুটি সমাধান আমরা এখানে রাখছি, প্রথমটি হাওয়ার্ড আর বাওয়েনের (Howard R. Bowen) এবং পরেরটি এরিক লিণ্ডলের (Erik Lindhal)।

২.৩.১ বাওয়েনের সমাধান

বাওয়েনের সমাধানে একই সঙ্গে তিনটি উত্তর পাওয়া যাচ্ছে ঃ

(ক) সামাজিক দ্রব্য থেকে যে সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, সেই সুবিধার অনুপাতে ভোক্তারা করপ্রদান করবে।

(খ) জনসাধারণই সামাজিক দ্রব্যের ব্যয়ভার বহন করবে, সরকার নয়।

(গ) সরকার এমনভাবে সামাজিক দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করবে যাতে জনসাধারণের মোট চাহিদা এবং সমস্ত দ্রব্য পরিষেবার মোট যোগান পরস্পরের সঙ্গে সমান হয়।

ধরা যাক একটি অর্থনীতিতে দুজন মাত্র ব্যক্তি আছেন, শ্রীমতী 'A' ও 'B' একটিমাত্র সামাজিক দ্রব্যই উৎপাদিত হচ্ছে। সামাজিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুজনেই সমান পরিমাণে ঐ দ্রব্য ভোগ করবেন। সেক্ষেত্রে কোনো কম-বেশি হবে না। কিন্তু সামাজিক দ্রব্যটির জন্য দুজনের চাহিদা এক নয়। ধরা যাক, একটি পার্ক হবে। শ্রীমতী 'A' -র বাড়িতে শিশুর সংখ্যা বেশি। সেজন্য শ্রীমতী 'B'-র তুলনায় তাঁর পার্কটা বেশিই প্রয়োজন। শ্রীমতী 'A' -র কাছে পার্কটা বেশি প্রয়োজনীয় বলে তাঁর চাহিদা রেখাটি বেশি অস্থিতিস্থাপক বা কম ঢালযুক্ত।

শ্রীমতী 'A' ও 'B' -কে মোট উৎপাদনব্যয়ের প্রয়োজনীয় অংশ বহন করতে হবে যাতে ঐ সামাজিক দ্রব্য উৎপাদন ও যোগান দেওয়ার পুরো খরচ উঠে আসে। এখন প্রশ্ন হল দুজনেই যখন সম-পরিমাণে সামাজিক দ্রব্য ভোগ করবেন, ব্যয়েরও সমান অংশই কী তাঁরা বহন করবেন? দেখা যাক বাওয়েনের সমাধান কী বলে। ব্যক্তিগতভাবে একজন যত অধিক পরিমাণে উৎপাদন ব্যয়ের অংশ বহন করবেন, অন্যজনকে তত অল্প অংশ বহন করতে হবে। যেহেতু যে কোনো পরিমাণের জন্য একজন দামের বেশি অংশ দিলে অন্যজনকে কম অংশ দিতে হবে, সেজন্য একজনের চাহিদা রেখাকে আমরা বাস্তবে অন্যজনের যোগান রেখা হিসাবেও দেখতে পারি।

চিত্র ২.১-এ আমরা হাওয়ার্ড বাওয়েলের সমাধানটি উপস্থিত করছি। এখানে AA ও BB যথাক্রমে শ্রীমতী 'B' র চাহিদা রেখা। তাঁদের মোট চাহিদা রেখা D_{A+B}। সামাজিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে সবাই সমপরিমাণে দ্রব্য ভোগ

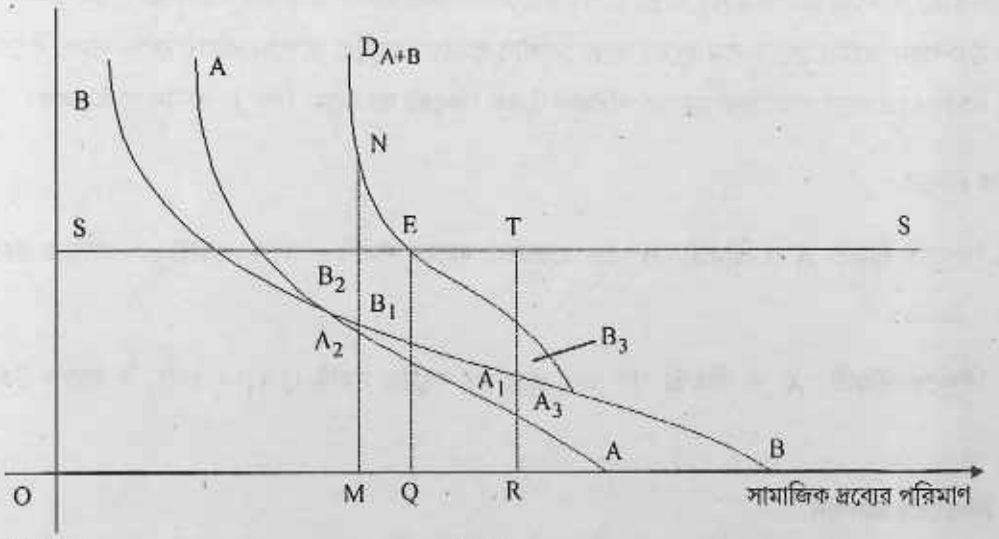

চিত্র ২.১
সামাজিক দ্রব্যের দামবন্টন : বাওয়েনের সমাধান

করেন বলে উল্লম্ব সংযোজনের মাধ্যমে মোট চাহিদা রেখাটি পাওয়া গেছে। এই পদ্ধতিতে সামাজিক দ্রব্যের চাহিদা রেখা নির্ণয় করা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

যোগান রেখাটি হচ্ছে SS। এখানে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে সমহারে প্রতিদানের সূত্র অনুযায়ী সামাজিক দ্রব্যটি উৎপাদিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ প্রভৃতি সামাজিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় অত্যন্ত বেশি, পরিবর্তনশীল বা প্রান্তিক ব্যয় তুলনায় কম হয়। ফলে প্রান্তিক ব্যয়ের সঙ্গে সমানহারে বা এমনকি ক্রমবর্ধমান হারেও উৎপাদন বাড়তে পারে। সেজন্য সামাজিক দ্রব্যের যোগান রেখার ক্ষেত্রে সমহারে প্রতিদানের অনুমান খুব অসঙ্গত নয়। এক্ষেত্রে যোগান রেখা পরিমাণ অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল, অর্থাৎ সমহারে প্রতিদানের কথা ধরা হয়েছে।

উৎপাদন ব্যয় বা দামের বণ্টন হিসাব করার জন্য আমরা মোট চাহিদা রেখা যেখানে যোগান রেখাকে ছেদ করছে, সেই বিন্দু থেকে 'A' এবং 'B' এর চাহিদা রেখার উপর লম্ব টেনে, তার পরিপ্রেক্ষিতে দাম অক্ষ থেকে দাম নির্ণয় করতে পারি। এখানে ভারসাম্য বিন্দু হল E। ঐ বিন্দুতে মোট চাহিদা এবং যোগান সমান। ভারসাম্য বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ OQ এবং দাম QE। দামের অংশ হিসাবে শ্রীমতী A, QA_1 ও শ্রীমতী B, QB_1 বহন করতে প্রস্তুত। তা হলে মোট দাম ($QA_1+QB_1+QA_1+A_1E = QE$), উৎপাদন ব্যয় QE-র সমান হবে। এর থেকে কম পরিমাণে উৎপাদন হলে দুজনের চাহিদা অপূর্ণ থেকে যাবে। যদি উৎপাদন হয় OM তখন উভয়ে যথাক্রমে MA_2 ও MB_2 অর্থাৎ MN দাম দিতে প্রস্তুত থাকবে। এই দাম একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় বা প্রান্তিক ব্যয়ের থেকে বেশি। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, চাহিদার ঘাটতি কমবে। অন্যদিকে যদি যোগানোর পরিমাণ বেড়ে OR হয়ে যায়, A দিতে চাইবে RA_3 ও B, RB_3 তাহলে দ্রব্যটির একক প্রতি দাম একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় বা প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের থেকে কম হবে। ফলে যোগান কমবে। বাড়তি যোগান কমার ফলে দামও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। এভাবে সামাজিক দ্রব্যের পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই ভারসাম্য বিন্দু E তে ফিরে আসবে।

এক নজরে :

N বিন্দুতে শ্রীমতী A ও শ্রীমতী 'B' এর প্রস্তাবিত দামের সমষ্টি = MA_2+MB_2 > প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়।

T বিন্দুতে শ্রীমতী 'A' ও শ্রীমতী 'B' এর প্রস্তাবিত দামের সমষ্টি $QA_1 + QB_1$ = প্রান্তর উৎপাদন ব্যয়।

২.৩.২ লিন্ডলের সমাধান

এরিক লিন্ডল সামাজিক দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বণ্টনের ক্ষেত্রে নীচের অনুমানগুলি করেন :

(১) সামাজিক দ্রব্য থেকে সংখ্যাবাচক পদ্ধতিতে উপযোগিতা মাপা হচ্ছে।

(২) দুজন ব্যক্তির উপযোগিতার মধ্যে তুলনা করা সম্ভব।

(৩) দেশের মোট সম্পদের পরিমাণ স্থির।

(৪) একটিমাত্র সামাজিক দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। সরকার উৎপাদন করছে এবং যোগান দিচ্ছে।

(৫) দেশে দুজন মাত্র ব্যক্তি, শ্রীমতী 'A' ও 'B' আছেন।

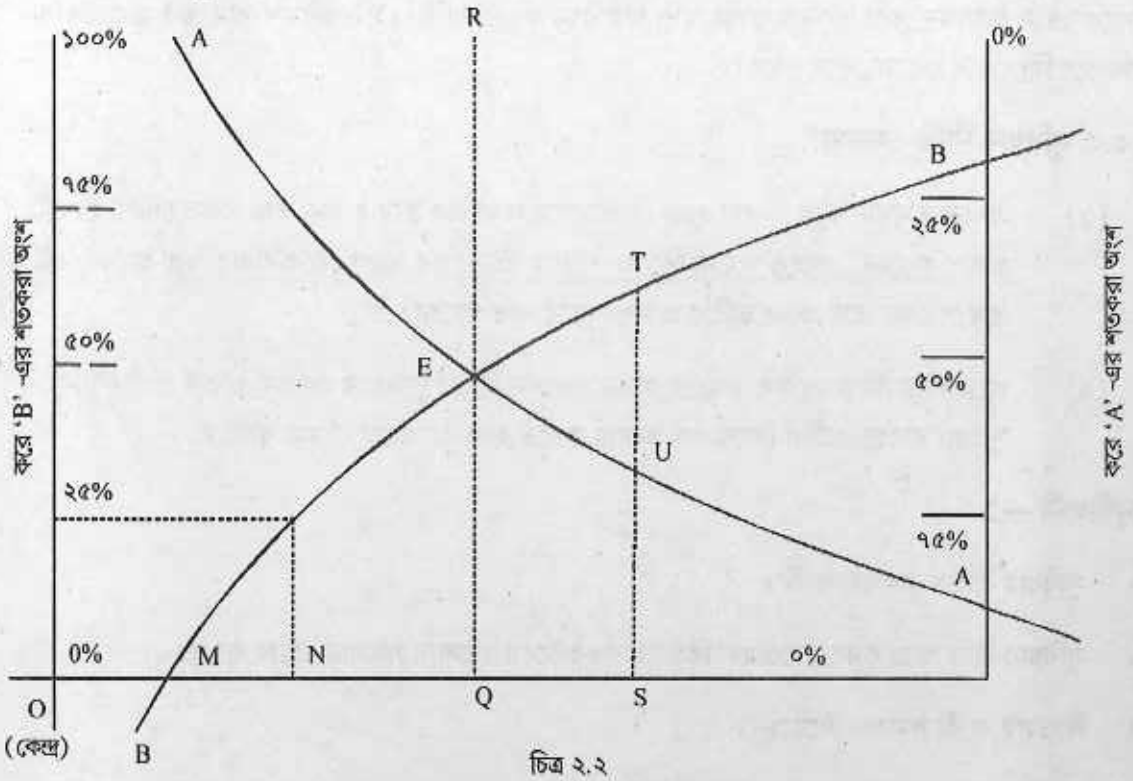

চিত্র ২.২

সামাজিক দ্রব্যের দাম বণ্টন : লিন্ডলের সমাধান

আমরা অনুভূমিক অক্ষে সামাজিক দ্রব্যের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে উৎপাদন ব্যয়ের শতকরা অংশকে উপস্থিত করছি। উল্লম্ব অক্ষের মধ্যে বাঁ দিকে মোট ব্যয়ের শতকরা কত অংশ 'A' বহন করছেন এবং ডানদিকে কত অংশ 'B' বহন করছেন তা দেখান হয়েছে। AA হচ্ছে শ্রীমতী 'A'-র এবং BB, শ্রীমতী 'B'-র চাহিদা রেখা। দামের যত বেশি অংশ 'A' বহন করবেন, তত কম অংশ 'B' কে বহন করতে হবে। এজন্য আমরা দুজনের চাহিদা রেখা দুটি বিপরীত অক্ষে রাখছি। একজনের চাহিদা রেখাকে অন্যজনের যোগান রেখা হিসাবেও দেখা যেতে পারে। যেমন OM পরিমাণের জন্য B ১০০% দাম দিতে প্রস্তুত, সুতরাং 'A' ঐ পরিমাণ দ্রব্য বিনা

পয়সাতেই পাবেন। ON পরিমাণের জন্য 'B' ৭৫% দাম দিতে প্রস্তুত, ফলে আর মাত্র ২৫% দিলেই A ঐ পরিমাণ ভোগ করতে পারবেন। যদিও এই পরিমাণ সামাজিক দ্রব্যের জন্য A আরো বেশি দাম দিতে প্রস্তুত। (N বিন্দু থেকে 'A' এর চাহিদারেখা AA পর্যন্ত লম্ব টানলে জানা যাবে) এখানে পরস্পরের চাহিদা রেখা (বা একজনের চাহিদা ও অন্যের যোগান রেখা) E বিন্দুতে ছেদ করছে বলে E হল ভারসাম্য বিন্দু। তখন সামাজিক দ্রব্যের পরিমাণ OQ। সেখানে 'A', QE এবং 'B', RE শতাংশ ব্যয় বহন করছে। OQ-র থেকে বেশি উৎপাদন করা সম্ভব নয়, কারণ দুজনের মোট ব্যয় বহন ১০০ শতাংশের নীচে নেমে যাচ্ছে। যেমন OS পরিমাণ উৎপাদন করলে TU শতাংশ ঘাটতি পড়ছে। আবার OQ-র থেকে কম পরিমাণে যোগান দেওয়া হলে উৎপাদন ব্যয় হিসাবে যতটা প্রয়োজন, তার তুলনায় তারা বেশি ব্যয় বহন করতে রাজি। ON পরিমাণ সামাজিক দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে ধরে নিয়ে এটা দেখান যেতে পারে।

২.৩.৩ সুবিধার নীতি : সমস্যা

(১) এখানে অনুমান করে নেওয়া হচ্ছে যে প্রত্যেকে সামাজিক দ্রব্যের জন্য তাঁর প্রকৃত চাহিদা রেখাটি প্রকাশ করছেন। যেহেতু দাম না দিলেও কাউকে এই দ্রব্যের ভোগ থেকে বঞ্চিত করা যায় না, তাই বাস্তবে কেউ তার প্রকৃত চাহিদা প্রকাশ করতে নাও পারেন।

(২) অনেক সামাজিক দ্রব্যের ব্যবহার করেন মূলত সমাজের দুর্বলতর এবং দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষ। সুতরাং ব্যবহারকারীর থেকে ব্যয় আদায় করতে হলে তা আরো বৈষম্য বাড়াবে।

অনুশীলনী—১

১। সুবিধার নীতির মূল বক্তব্য কী?

২। সুবিধার নীতি প্রয়োগ করে বাওয়েন কিভাবে করবণ্টনের সমস্যার সমাধান প্রস্তাব করেছেন?

৩। লিন্ডলই বা কী সমাধান দিয়েছেন?

৪। এগুলির প্রয়োগ কতটা বাস্তবসম্মত? কতটাই বা কাম্য?

২.৪ সামর্থ্যের নীতি

সরকারি ব্যয় থেকে কে কতটা সুবিধা পাচ্ছেন সেই অনুপাত নয়, বরং কার কতটা করপ্রদানের সামর্থ্য আছে সেই অনুযায়ী কর ধার্য করা উচিত। বিখ্যাত চিন্তাবিদ জন স্টুয়ার্ট মিশকে আমরা এই বক্তব্যের প্রথম উল্লেখ্য বক্তা বলতে পারি। এই নীতি অনুযায়ী যার সামর্থ্য বেশি, সে বেশি কর দেবে। যেমন উপার্জনকে যদি আমরা করপ্রদানের সামর্থ্যের পরিমাপ হিসাবে ধরি, তাহলে যার উপার্জন বেশি, সে বেশি কর দেবে।

২.৪.১ সামর্থ্য বলতে কী বোঝাবো?

সাধারণত (ক) সম্পদ, (খ) আয় (গ) ভোগব্যয়—এই তিনটি বিষয়কে কোনো করদাতার সামর্থ্যের মাপকাঠি বলে ধরা হয়। কারণ এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতেই ব্যক্তিরা তাঁদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে থাকেন। এর মধ্যে সম্পদ এবং ভোগব্যয়কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার নানান অসুবিধা আছে। যেমন কোনো ব্যক্তির নিজের সামর্থ্যের তুলনায় পোষ্যের বা পরিবারের সদস্যসংখ্যার উপর ভোগব্যয় নির্ভর করে। আবার বিভিন্ন প্রকার সম্পদ থেকে বিভিন্ন প্রকার আয় হতে পারে, যেমন একই সম্পদ থেকে বিভিন্ন প্রকার আয় হতে পারে। এছাড়া সম্পদ হস্তান্তর হয় বলে তা হিসাবের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে।

এ সমস্ত অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ বা ভোগব্যয়ের তুলনায় আয়কে সামর্থ্য পরিমাপের সহজ-সরল মাপকাঠি বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন। অবশ্য আয়কে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করারও কয়েকটি অসুবিধা আছে। সরাসরি আয় নয়, আয় থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে সামর্থ্যের ভিত্তি ধরে আমরা পরবর্তী আলোচনা করবো।

২.৪.২ সামর্থ্য মানে সমান ত্যাগ : সংজ্ঞা

এই নীতি বলছে যার যেমন সামর্থ্য, সে সেই অনুযায়ী ত্যাগ করবে। এই পর্যন্ত একমত হয়েও 'সমান' ত্যাগ বলতে কী বোঝাবে, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। সাধারণভাবে বলা যায়, আয় থেকে যে উপযোগিতা পাওয়া যায়, করপ্রদানের মাধ্যমে সেই উপযোগিতা কতটা হ্রাস পাচ্ছে, সেটাই হবে ত্যাগ স্বীকারের ভিত্তি।

'সমান' ত্যাগের পরিমাপ করতে গিয়ে নীচের অনুমানগুলি নেওয়া হচ্ছে ঃ

(১) আয়ের মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতা পরিমাপ করা হয়।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তি আয় থেকে একইরকম উপযোগিতা পান।

(৩) আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ের মোট উপযোগিতা বাড়ে ও প্রান্তিক উপযোগিতা কমে।

এই অনুমানগুলির সমান ত্যাগের ধারণাটিকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.৪.৩ সম পরিমাণ ত্যাগ

প্রত্যেক করদাতা সমান পরিমাণে উপযোগিতা ত্যাগ করার এবং সেই উপযোগিতাকে টাকায় রূপান্তরিত করে করদাতার করের পরিমাণ-ধার্য করা হবে। ধরা যাক প্রত্যেকে ৫ একক করে উপযোগিতা ত্যাগ করবেন বলে সরকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা তাঁর আয় ২০০ টাকা হোক বা ২০০০ টাকাই হোক। ফলে প্রত্যেককে টাকার মূল্যে ৫ একক উপযোগিতার সমপরিমাণ কর দিতে হবে।

২.৪.৪ সমানুপাতিক ত্যাগ ঃ

করপ্রদানের পর প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নীচের অনুপাতটি সমান হবে।

$$\frac{\text{করারোপের ফলে হারানো উপযোগিতা}}{\text{করারোপের আগে মোট উপযোগিতা}} = K \text{ (যে কোনো ধ্রুবক)}$$

ধরা যাক, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ঐ অনুপাত হল ৫ শতাংশ। সুতরাং যিনি তাঁর আয় থেকে ২০০ একক উপযোগিতা পাচ্ছেন, তিনি দেবেন টাকার অঙ্কে ১০ একক উপযোগিতার সমমূল্যের কর। অন্যদিকে যিনি ২০০০ একক উপযোগিতার পরিমাণ টাকা আয় করছেন, তিনি ১০০ একক উপযোগিতার সমমূল্যের টাকা কর হিসাবে দেবেন।

২.৪.৫ সমান প্রান্তিক ত্যাগ :

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর এমনভাবে কর আরোপ করা হবে যাতে প্রত্যেকের করপরবর্তী আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হবে।

২.৪.৬ সমান ত্যাগ : চিত্রের সাহায্যে

পূর্বোক্ত ক্ষেত্রগুলির মতো আমাদের অর্থনীতিতেও মনে করি শ্রীমতী 'A' ও 'B' দুজন ব্যক্তিই আছে। অনুভূমিক অক্ষে তাঁদের আয় তথা কর এবং উল্লম্ব অক্ষে আয় থেকে প্রাপ্ত উপযোগিতা মাপা হচ্ছে। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পায় বলে আয়-উপযোগিতা রেখাটি ক্রমশ আয় অক্ষের দিকে অবতল হয়ে যাবে। OK হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম আয়, তার উপযোগিতা অসীম।

শ্রীমতী A ও B দুজনেই আয় থেকে সমান উপযোগিতা পায়। ফলে তাঁদের দুজনের আয়-উপযোগিতা রেখাটি একটিই রেখা। শ্রীমতী 'A' বেশি আয় করেন বলে ডানদিকে M বিন্দুতে এবং শ্রীমতী B কম আয় করেন বলে বাঁদিকে N বিন্দুতে আছেন।

২.৪.৭ চিত্রের সাহায্যে আলোচনা : সমান পরিমাণে ত্যাগ

শ্রীমতী 'A' -এর কর-পূর্ব আয় = OI'_A

শ্রীমতী 'B' -এর কর-পূর্ব আয় = OI'_B

শ্রীমতী 'A' -এর কর-পূর্ব উপযোগিতা = OU'_A

শ্রীমতী 'B' -এর কর-পূর্ব উপযোগিতা = OU^1_B

শ্রীমতী 'A' -এর কর-পরবর্তী আয় ও উপযোগিতা হল যথাক্রমে OI^2_A ও OU^2_A, শ্রীমতী 'B' -এর কর-পরবর্তী আয় ও উপযোগিতা হল যথাক্রমে OI^2_B ও OU^2_B।

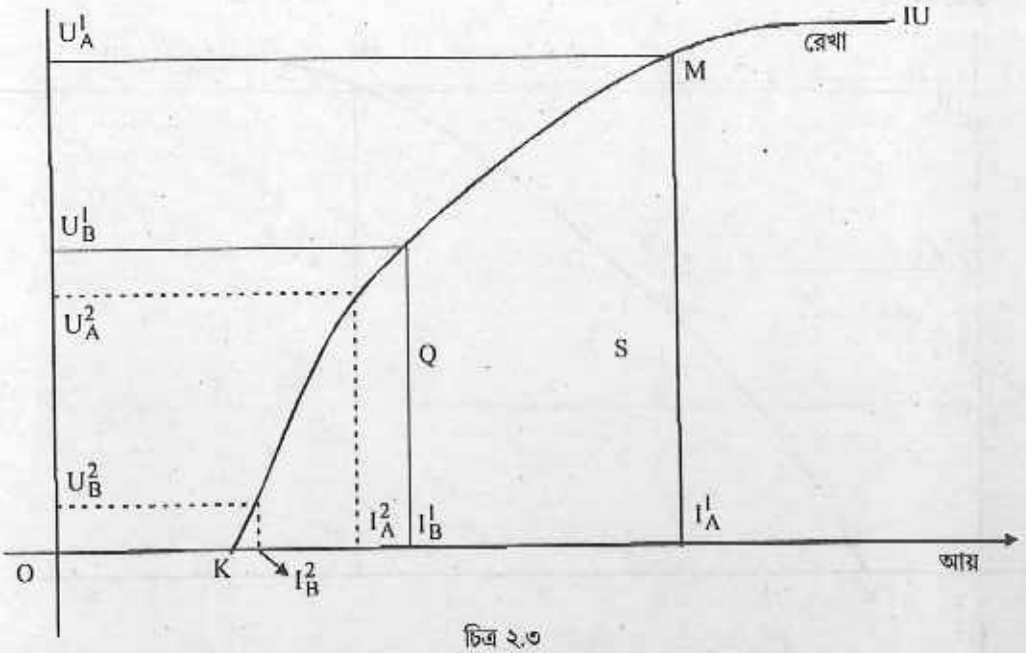

চিত্র ২.৩
সমান পরিমাণ ত্যাগ ও করবণ্টন

টাকার অঙ্কে 'A' এর প্রদত্ত কর = করপূর্ব আয় - করপরবর্তী আয় = $OI^1_A - OI^2_A = I^2_A\ I^1_A$

একইভাবে, 'B' এর প্রদত্ত কর = $OI^1_B - OI^2_B = I^2_B\ I^1_B\ I^1_B$

করনির্ধারণের ভিত্তি হল যে দুজনের প্রত্যেকেই সমপরিমাণ উপযোগিতা হারাচ্ছেন। অর্থাৎ দুজনেই করের মাধ্যমে যে উপযোগিতা হারাচ্ছেন, উপযোগিতার অঙ্কে তা দুজনের জন্যই সমান হবে।

২. **সমান আনুপাতিক ত্যাগ :**

কর আরোপের ফলে দুজনেই সমান অনুপাতে উপযোগিতা হারাচ্ছেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই :

$$\frac{\text{কর পরবর্তী হারানো উপযোগিতা}}{\text{করপূর্ব মোট উপযোগিতা}} = K \text{ (যে কোনো ধ্রুবক)}$$

অর্থাৎ, $U_A^1U_A^2 / OU_A$

$= U_B^1U_B^2 / OU_B^2$

∴ 'A' এর করের পরিমাণ $= OI_A^1 - OI_A^2 = I\frac{1}{A}I_A^2$

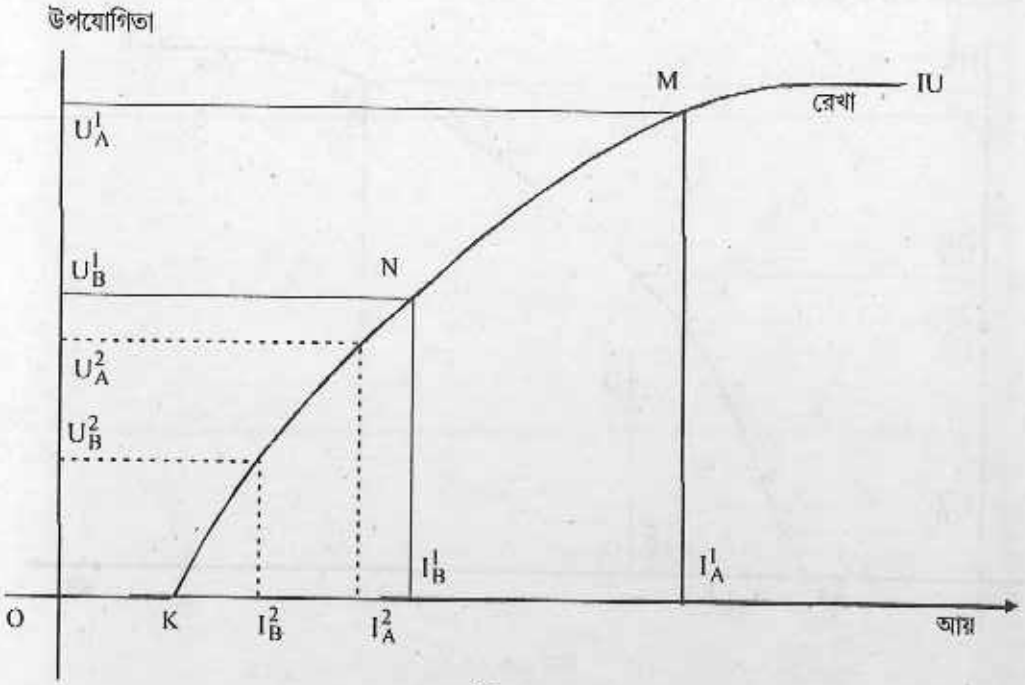

চিত্র ২.৪
সমানুপাতিক ত্যাগ ও করবণ্টন

'B' এর করের পরিমাণ

$= OI_B^1 - OI_B^2 = I_B^1\ I_B^2$

লক্ষণীয় যে সমপরিমাণ ত্যাগের তুলনায় সমানুপাতিক ত্যাগের ক্ষেত্রে 'A' এর করের পরিমাণ বেড়েছে এবং 'B' এর করের পরিমাণ কমেছে।

৩. সমান প্রান্তিক ত্যাগ :

এখানে করারোপের পর দুজনের আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হবে।

আগের চিত্রগুলির মতই শ্রীমতী 'A' বা শ্রীমতী B, E বিন্দুতে অবস্থান করছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত $I_B^1\ I_A^1$ পরিমাণ কর সংগ্রহ করার প্রয়োজন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীমতী B এর উপর কোনো করই ধার্য হচ্ছে না কারণ

তিনি OI^1_B আয় করেন, যা $I^1_B\ I^1_A$ -এর কম। ততক্ষণ শুধুমাত্র শ্রীমতী A এর উপর কর আরোপ করলেই চলবে। যেমন TI^1_A পরিমাণ কর আদায় করতে হলে তা শুধুমাত্র শ্রীমতী 'A' এর থেকে আদায় করলেই চলবে। শ্রীমতী 'A' এর উপর করারোপের ফলে তাঁর মোট উপযোগিতা কমবে, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা বাড়বে। তা সত্ত্বেও P বিন্দুতে শ্রীমতী 'A' এর আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা শ্রীমতী 'B' -এর প্রান্তিক উপযোগিতার তুলনায় কম। চিত্রের ভাষায়, P বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল E বিন্দুর তুলনায় কম। আমরা জানি যে উপযোগ রেখার প্রতিটি বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল ঐ বিন্দুতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয় থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতাকে নির্দেশ করবে। এখানে দেখা

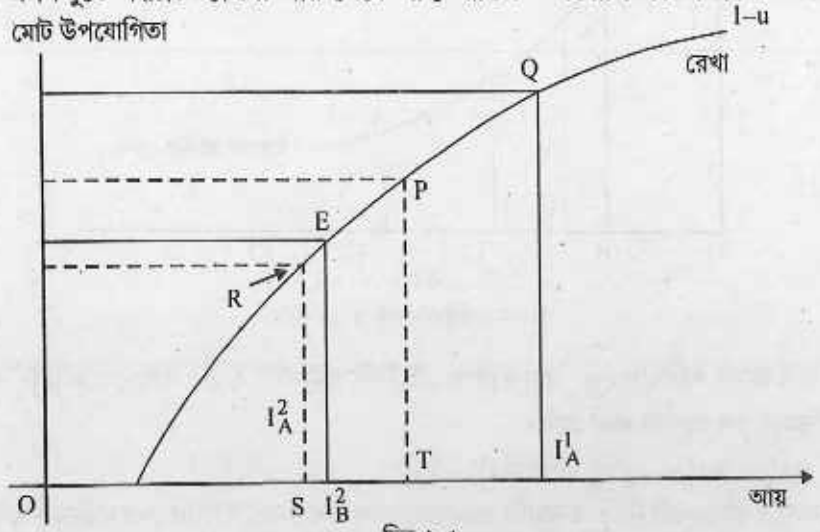

চিত্র ২.৫

সমান প্রান্তিক ত্যাগ ও করবণ্টন

যাচ্ছে যে কর আরোপ করার পর শ্রীমতী 'A' -এর আয় হ্রাস পেয়ে P বিন্দুতে আসা সত্ত্বেও এখনো তাঁর আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা শ্রীমতী 'B' এর আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতার তুলনায় কম। এইভাবে কর আরোপ চলবে যতক্ষণ না শ্রীমতী A ও B এর প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হয়ে যায়।

এরপর যদি করের পরিমাণ আরও বাড়ে, যেমন, ধরা যাক I^1_B বিন্দুর বাঁদিকে যে কোনো পরিমাণ কর সংগ্রহ করতে হয়, তাহলে শ্রীমতী B এর উপর কর বসবে I^1_B এর বাঁদিকে এবার যেটুকু বাড়তি কর বসবে, সেটুকু দুজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে। বাকি $I^1_B\ I^1_A$ পরিমাণ কর শ্রীমতী 'A' কে একাই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে বলা হয় মোট ত্যাগের পরিমাণ সর্বনিম্ন হয়।

এইতত্ত্বটি আমরা একটি বিকল্প চিত্রের সাহায্যেও দেখাতে পারি।

আগের চিত্রের মতোই এই চিত্রে শ্রীমতী 'A' এর আয় OI^1_A ও শ্রীমতী 'B' এর আয় OI^1_B। কিন্তু এখানে উল্লম্ব অক্ষে উভয়ের আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা দেখান হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে আয়ের পার্থক্য থাকলেও দুজনেরই আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা একই এবং একইভাবে কমছে; ধরে নেওয়া হয়েছে। এখন যদি করের

পরিমাণ $T I_A$ ধার্য করা হয় তাহলে পুরো করটাই শ্রীমতী 'A' কে দিতে হবে, শ্রীমতী 'B' কে কোনও কর দিতে হবে না। ধার্য করের পরিমাণ দু'জনের আয়ের পার্থক্য $I_A I_B$ এর থেকে কম। এইক্ষেত্রে সমান প্রান্তিক ত্যাগ নীতি কার্যকর করা যাবে না।

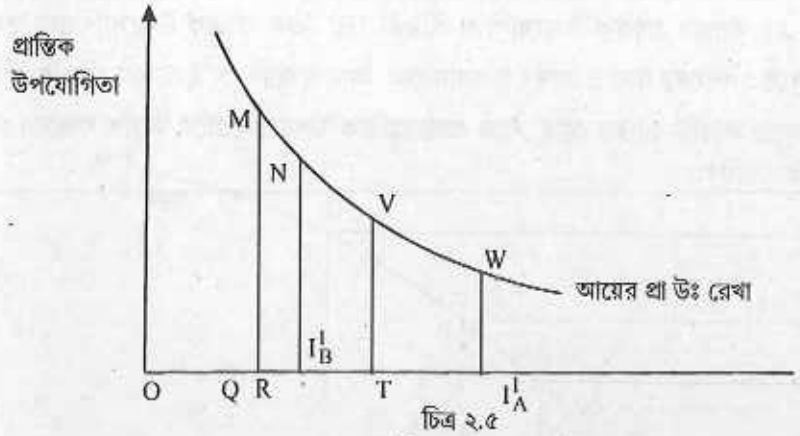

চিত্র ২.৫

সমান প্রান্তিক ত্যাগ ও করবণ্টন

কিন্তু যদি ধার্য করের পরিমাণ QI_A^1 হয় তাহলে এই নীতি অনুযায়ী A এর কাছ থেকে RI_A^1 এবং B এর কাছ থেকে RI_B^1 পরিমাণ কর আদায় করা হবে।

এইক্ষেত্রে $RI_A^1 + RI_B^1 = QI_A^1$ এবং $RI_B^1 = QR$

সংক্ষেপে বলতে গেলে এই নীতি অনুযায়ী এমনভাবে কর বসানো হবে যাতে কর দানের পর উভয় করদাতার একই পরিমাণ আয় (OR) এবং একই পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ (RM) ভোগ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে যখন ধরে নেওয়া হবে যে আয়ের প্রান্তিক উপযোগ আয় বৃদ্ধির সঙ্গে হ্রাস পায়—যেমন আমরা ধরে নিয়েছি—তখন করের হার সব প্রগতিশীল অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেয় করের হারও বৃদ্ধি পাবে।

সমালোচনা :

আপাতদৃষ্টিতে এই তত্ত্ব মনোগ্রাহী হলেও এর বাস্তবে প্রয়োগের কয়েকটি অসুবিধা আছে :

১। উপযোগিতার একমাত্র ভিত্তি আয় নয়। পরিবারের সম্পদ, পোষ্যসংখ্যা প্রভৃতিও দেখা দরকার।

২। মোট এবং প্রান্তিক উপযোগিতা রেখা বাস্তবে অজ্ঞাত থাকে।

৩। দুজনের আয়ের মোট এবং প্রান্তিক উপযোগিতা তুলনীয় নয়।

২.৫ সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি

কর আরোপের ভিত্তি হিসাবে আগের দুটি নীতিই অধিক চর্চিত। এছাড়াও বহু অর্থনীতিবিদ্ করকে সেবাকার্যের দাম হিসাবে দেখেছেন। এতে বলা হচ্ছে সরকার যে যে দ্রব্য ও পরিষেবা যোগান দিচ্ছে, ব্যবহারকারীদের উপর সেই ব্যয় অনুযায়ী কর ধার্য করা হবে।

সুবিধার নীতির সমালোচনাগুলি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রথমত, দরিদ্র এবং সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষরা সরকারি ব্যয় বা সেবাকার্যের সুযোগ বেশি করে নিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের উপর সমানুপাতিক হারে ব্যয়ের বোঝা চাপানো ন্যায়সঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়, প্রতিরক্ষা, প্রশাসন প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক দ্রব্য ও পরিষেবা অভিভাজ্য এবং একজনের জন্য কত খরচ হচ্ছে, তা পৃথকভাবে হিসাব করা সম্ভব নয়।

২.৬ আদর্শ করনীতি

আগের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে করারোপের নীতি নিয়ে মতভেদের যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে। তবে বর্তমান কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সেই করনীতিকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করবে যা

(ক) সম্পদের সঠিক বণ্টনে সাহায্য করে।

(খ) করভার বণ্টনে সাম্য ও ন্যায়ের নীতি প্রয়োগ করে।

(গ) সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বাধিক করসংগ্রহ করে।

অনুশীলনী—১

১। সমান সামর্থ্য বলতে কী বোঝায়?

২। কী কী বিষয় সামর্থ্যের ভিত্তি হতে পারে?

৩। সমান ত্যাগ বলতে কী বোঝায়?

৪। সমপরিমাণ ত্যাগ ও সমানুপাতিক ত্যাগের পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫। সমান প্রান্তিক ত্যাগের ধারণাটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন। আলোচ্য চিত্রে কতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীমতী 'খ'-কে কোনো কর দিতে হবে না।

৬। করারোপের ক্ষেত্রে বাস্তবে কী কী অসুবিধা দেখা দেবে?

৭। সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি কাকে বলে? এই নীতিতে করারোপ কী ন্যায়সঙ্গত?

৮। একটি আদর্শ করনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

২.৭ সরকারি ব্যয়ের নীতি

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা ছাড়াও একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নাগরিকের প্রতি নানান দায়িত্ব আছে। তারমধ্যে সম্পদ বিভাজনে সহায়তা করা, আয়বৈষম্য হ্রাস, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মূল্যস্তরকে স্থিতিশীল রাখা অন্যতম। সেজন্য সরকার ব্যয় নির্ধারণে এই নীতিগুলি অনুসরণ করে থাকে :

(ক) **সর্বাধিক সামাজিক সুবিধার নীতি :** সরকারি ব্যয় এমনভাবে হবে যাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে।

(খ) **সমাজিক উদ্দেশ্যসাধক নীতি :** বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ করার জন্য মন্দার সময় সরকারি ব্যয়বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সময় ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন।

(গ) **ব্যয় সংক্ষেপের নীতি :** সরকারের উচিত অপ্রয়োজনীয় বা অপচয়মূলক ব্যয় না করে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয় করা।

(ঘ) **অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতি :** সরকারের লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে সরকারি ব্যয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়। উন্নতশীল দেশে সরকারি ব্যয়ের এই নীতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী—১

১। কী কী উদ্দেশ্যে সরকারকে ব্যয় করতে হতে পারে?

২। সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কী নীতি অনুসরণ করা হবে?

২.৮ সারাংশ

সরকারকে যেহেতু অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়, তাই সরকারের বিপুল ব্যয় ভার কমানোর জন্য তাকে জনসাধারণের উপর কর আরোপ করতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার কতটা কর আরোপ করবেন? কর আরোপের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়, যথা সুবিধার নীতি, সামর্থ্যের নীতি এবং সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি। সুবিধা নীতিতে বাওয়েনের সমাধান হল, সামাজিক দ্রব্য থেকে যে সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, সেই সুবিধার অনুপাতে ভোক্তারা কর প্রদান করবে এবং জনসাধারণই সামাজিক দ্রব্যের ব্যয় বহন করবে, সরকার নয়। লিন্ডেলও একই বক্তব্য পেশ করেছেন। কিন্তু সুবিধা নীতির মূল অসুবিধা হচ্ছে, সাধারণ সামাজিক দ্রব্য ব্যবহার করেন সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষ, সুতরাং ব্যবহারকারীদের থেকে ব্যয় আদায় করতে গেলে তা আরো বৈষম্য বাড়াবে। এই সমস্যা দূর করার জন্য কর আদায়ের ক্ষেত্রে সামর্থ্যর নীতি গ্রহণ করতে হয়। এর মূল বক্তব্য যে ব্যক্তির উপার্জন বেশি, তিনি বেশি কর দেবেন। এখানে সমস্যা হল যে ব্যক্তি কর প্রদান করছেন, তাঁর উপযোগিতার একমাত্র ভিত্তি আয় নয়, পরিবারের সম্পদ এবং পোষ্য সংখ্যার উপরও উহা নির্ভরশীল। তা ছাড়া মোট এবং প্রান্তিক উপযোগিতা রেখাও বাস্তবে অজ্ঞাত। সেইকারণে আদর্শ করনীতির মূল বক্তব্য হল, করভার বণ্টনে সাম্য এবং ন্যায়ের নীতি প্রয়োগ করা এবং সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বাধিক কর সংগ্রহ করা।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave : Public Finance in Theory and Practice; McGraw Hill International, 1989. Chapter-13.

(২) Subrata Ganguly : Public Finance : A Normative approach; Nababharat Publishers. Calcutta, 1991. Chapters 3, 4.

একক ৩ ❐ করের ভিত্তি আয়, ব্যয়, মূলধনী লাভ, কর্মপ্রয়াস, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর আয়করের প্রভাব

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ প্রত্যক্ষ কর

৩.৩ করের ভিত্তি

৩.৩.১ আয়

৩.৩.২ ব্যয়

৩.৩.৩ সম্পদ

৩.৪ মূলধনী লাভ কী আয়

৩.৪.১ বৈশিষ্ট্য

৩.৪.২ মূলধনী লাভের উপর করারোপ

৩.৫ আয়করের প্রভাব

৩.৫.১ কর্মপ্রয়াসের উপর

৩.৫.২ ঈর্ষার প্রভাব

৩.৫.৩ সঞ্চয়ের উপর

৩.৫.৪ বিনিয়োগের উপর

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়লে জানা যাবে :

- প্রত্যক্ষ কর বলতে কী বোঝায়?
- করের ভিত্তি কী কী বিষয় হতে পারে; যথা—আয়, ব্যয় ও মূলধনী লাভ।
- কর্মের প্রয়াস, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের উপর আয়করের কী প্রভাব পড়তে পারে।

৩.১ প্রস্তাবনা

সরকার রাজস্ব সংগ্রহের জন্য যে কর আরোপ করতে পারে, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় প্রকার হতে পারে। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করের বোঝা সরাসরি করদাতার ঘাড়েই পড়ে অর্থাৎ করচালন সম্ভব হয় না। কিন্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই করের বোঝাটি পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে অন্যের ঘাড়ে চালান করে দেওয়া যায়। অর্থাৎ করচালন সম্ভব হয়। এই অধ্যায়ে আমরা প্রত্যক্ষ কর নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথমেই আসবে প্রত্যক্ষ কর কী, কিসের ভিত্তিতে ঐ কর আরোপ করা যেতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা। আয়, ব্যয় বা সম্পদ প্রত্যক্ষ করের ভিত্তি হতে পারে। আমরা এই তিনটি ভিত্তির তুলনামূলক আলোচনা করবো। ভিত্তি হিসাবে পূর্বোক্ত যে তিনটি বিষয় নেওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে আয় বা ব্যয়কে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক প্রভৃতি সময়ের এককের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করা হয়। সম্পদের পরিমাপের সঙ্গে সময়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই একে মজুত চলক বলা হয়। সেইসঙ্গে মূলধনী লাভকে আয় হিসাবে দেখানো হবে কি না, তার উপর কী পরিপ্রেক্ষিতে কর আরোপ করা হবে, তা নিয়েও আমরা এই এককে আলোচনা করবো। এর মধ্যে আমরা সবেচেয়ে প্রচলিত করটিকে, অর্থাৎ আয়করকে বেছে নিয়ে ব্যক্তির কর্মের উদ্যোগ, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের উপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। মনে রাখতে হবে পূর্বোক্ত তিনটি বিষয়ই একটি অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য একান্ত অপরিহার্য। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ কর অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন দিককে কীভাবে প্রভাবিত করে, তা আয়করের দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচিত হবে।

৩.২ প্রত্যক্ষ কর

আয় এবং সম্পদের উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপিত হয়। আয়কে সাধারণত আমরা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করি। অর্থাৎ আয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক প্রভৃতি সময়ের ব্যবধানে পাওয়া যেতে পারে।

বিপরীতে সম্পদের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। চলতি সময়ে উৎপাদনের উপাদান সরবরাহ করে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাকেই আয় বলে উল্লেখ করবো। যেমন মজুরি ও মাহিনা, মুনাফা, খাজনা, সুদ বা লভ্যাংশ। পাশাপাশি সম্পদ বলতে বুঝবো জমি, বাড়ি, শেখার বস্তু প্রভৃতিকে। সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ হল ব্যক্তি বা কোম্পানির উপর আরোপিত কর, ব্যয় কর, সম্পদ কর, উত্তরাধিকার কর, উপহার কর, মূলধনী লাভের উপর কর প্রভৃতি।

৩.৩ করের ভিত্তি

সাধারণত আয়-ব্যয় এবং সম্পদকে প্রত্যক্ষ করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

৩.৩.১ আয়

আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে কোনও ব্যক্তির আয়কে, বা ব্যয়ের তুলনায় তাঁর করপ্রদানের ক্ষমতা পরিমাপের সহজতর মাপকাঠি বলে ধরা হয়। হেনরি সি সাইমন্স (Henry C. Simons) আয়ের সংজ্ঞায় বলেছেন যে কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট ভোগের পরিমাণের সঙ্গে নীট সম্পদের পরিবর্তনে যোগ করলে আয় পাওয়া যাবে। আয় এই মুহূর্তে খরচ করা যেতে পারে অথবা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য জমিয়ে রাখা যেতে পারে।

উৎস বা ব্যবহার— যে কোনো একটি দিক থেকে আমরা আয়ের হিসাব করতে পারি। উৎসের দিক থেকে ধরলে কোনও ব্যক্তি আলোচিত সময়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে উৎপাদনের উপাদান বিক্রি করে এবং সরকার বা অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে হস্তান্তর আয় হিসাবে যে অর্থ পান এবং তিনি যে সম্পদের মালিক, সেগুলির যা মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে—সবকিছুকে একত্রে যোগ করলে যে অর্থের পরিমাণ পাওয়া যাবে তাই হল ব্যক্তিটির মোট আয়। এখানে আলোচিত সময় বলতে দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস প্রভৃতিকে বোঝাবে।

বিপরীতে, আয়কে ব্যবহারের দিক থেকে ধরলে, ভোগব্যয় বা দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য মোট ব্যয়ের সঙ্গে সঞ্চয়কে যোগ দিলে মোট আয় পাওয়া যাবে। সঞ্চয় বলতে বোঝাবে কোনো ব্যক্তির সম্পদের নীট মূল্যের বৃদ্ধি। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে দায় বাদ দিয়ে যা থাকে, তাকেই আমরা তার নীট মূল্য বলে গ্রহণ করবো। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক, দুই ই হতে পারে। এছাড়া দৈহিক বা মানসিক শ্রম ব্যবহার করে অর্জিত আয়কে উপার্জিত এবং সম্পত্তি থেকে জাত আয়কে অনুপার্জিত আয় বলা হয়।

সাইমন্স প্রদত্ত আয়ের সংজ্ঞাটিকে আমরা নীচের সমীকরণের সাহায্যে দেখাতে পারি।

আয় = ভোগ + সম্পদের নীট মূল্যের পরিবর্তন

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, উৎসের দিক থেকে যে আয় পাওয়া যাবে তা ব্যয়ের দিক থেকে পরিমাপ করে যে আয় পাওয়া যাবে তার সঙ্গে সাধারণত সমান হবে।

আয় পরিমাপের সময় মনে রাখতে হবে :

- করযোগ্য আয় পরিমাপের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জিত আয়ই করের হিসাবের জন্য গৃহীত হবে।
- করযোগ্য আয় পরিমাপ করতে হলে উপার্জন বাবদ যা খরচ হবে তা বাদ দিতে হবে।
- করযোগ্য আয় পরিমাপের সময় জীবনযাত্রার জন্য ন্যূনতম যে ব্যয়, তা বাদ দিতে হবে।
- করযোগ্য আয় পরিমাপের সময় করদাতার পরিবারের আয়তন, পোষ্যের সংখ্যা, আয় নিয়মিত না অনিয়মিত, মুদ্রাস্ফীতির হার ধরে নিয়ে প্রকৃত বা বাস্তব আয় কত, এ সমস্ত বিষয়কে বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।
- করযোগ্য আয় পরিমাপের সময় মনে রাখতে হবে উপার্জিত আয়ে বেশি পরিমাণে কর আরোপ করলে ব্যক্তির পরিশ্রম করার ইচ্ছা হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু অনুপার্জিত আয়ের কর কর্মের উদ্যোগকে বা ইচ্ছাকে ততটা হ্রাস করবে না।

৩.৩.২. করের ভিত্তি : ব্যয়

১৯৫৫ সালে অর্থনীতিবিদ নিকোলাস ক্যালডর (Nicholas Kaldor) প্রথম জোরের সঙ্গে উল্লেখ করলেন যে আয়ের তুলনায় কর পরিমাপের অনেক বাস্তব ভিত্তি হল ব্যয়। অন্যদিকে ব্যয়ের উপর কর হল বাস্তবে আয়ের উপরই কর, শুধু সঞ্চয়ের পরিমাণটুকু সেখানে বাদ যাচ্ছে। যেমন, কেউ আয় ফাঁকি দিতে চাইলে সে সঞ্চয়ের পরিমাণ অন্তহীনভাবে বাড়িয়ে যেতে পারে। সেখানে তার আয়ের উপর কোনো কর চাপবে না। সেই সঞ্চয়কে টাকাকড়িতে রূপান্তরিত করে ব্যয় করতে গেলেই তবে কর চাপবে। কিন্তু জীবনধারণের জন্য কিছু-না-কিছু ব্যয় করতেই হবে। সুতরাং সে সঞ্চয় করে আয়করকে কিছুটা ফাঁকি দিতে পারলেও ব্যয়করকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

আয় থেকে ব্যয় না করে সঞ্চয় করলে ব্যক্তি নিজেকে বর্তমান ভোগ থেকে বঞ্চিত করছে। কিন্তু সঞ্চয়ের ফলে দেশের মূলধনের ভাণ্ডার বাড়ে, তার সঙ্গে বাড়ে ভবিষ্যৎ ভোগের পরিমাণ। ক্যালডরের মতে সঞ্চয় করলে

বর্তমান ভোগ থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে ব্যক্তির কল্যাণে হয়তো একটু ঘাটতি পড়ে ঠিকই, কিন্তু সঞ্চয়ের ফলে ভবিষ্যৎ ভোগের যোগান বাড়ে বলে সবাই লাভবান হয়।

এছাড়া ব্যয়করের পক্ষে আরেকটি যুক্তি হল এই যে আয়করের মতো সঞ্চয়ের উপর এই কর দু দুবার আরোপিত হয় না। চলতি আর্থিক বছরে যখন আয়কর আরোপিত হচ্ছে, তখন আয়ের অংশ হিসাবে সঞ্চয়ের উপরও কর আরোপিত হচ্ছে। আবার সঞ্চয় করে করদাতা ভবিষ্যতে যে সুদ পাচ্ছেন, তার উপরও কর আরোপিত হচ্ছে। কিন্তু ব্যয়করের ক্ষেত্রে সেই সঞ্চয় যখন টাকায় রূপান্তরিত হয়ে ব্যয় হচ্ছে, তখনই শুধুমাত্র তা করের আওতায় আসছে। ফলে ব্যয়করের ক্ষেত্রে দু'দুবার কর আরোপের সম্ভাবনা নেই।

ব্যয়কর : মনে রাখার বিষয়

- পারিবারিক প্রয়োজনেই করদাতা ভোগব্যয় করবেন। নিজস্ব প্রয়োজন বা পছন্দ-অপছন্দের তুলনায় ব্যক্তির পরিবারের সদস্যসংখ্যার উপর ব্যক্তির ভোগব্যয় নির্ভর করবে।
- কোনো ব্যক্তি ব্যয় সম্বন্ধে গোপনীয়তা রক্ষা করতে চাইতেই পারেন বা অসত্য তথ্য দিতে পারেন।

৩.৩.৩. করের ভিত্তি : সম্পদ

রানি এলিজাবেথের সময় ইংল্যান্ডে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশগুলিতে করপ্রদানের সামর্থ্য সম্পদের ভিত্তিতেই পরিমাপ করা হত। কিন্তু সমাজ ক্রমশ শিল্পভিত্তিক হয়ে ওঠায় এবং অর্থের প্রচলন বাড়ার সম্পদ নয়, আয়ই ক্রমশ করের ভিত্তি হিসাবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে করযোগ্য সম্পদ হবে সে যে টাকাকড়ি, ব্যাঙ্ক আমানত, শেয়ার এবং জমি-বাড়ি প্রভৃতি স্থাবর সম্পদের মালিক। এর থেকে যে সমস্ত ধার বা দেয় বাকি আছে, সেগুলি বাদ দিলে নীট সম্পদ পাওয়া যাবে। আয়ের মতো কায়িক বা মানসিক শ্রম দিয়ে সম্পদ উপার্জিত হয়নি। তাই সম্পদকেই করের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা অধিকতর সঙ্গত বলে মনে করেন বহু অর্থনীতিবিদ্।

আবার অনেকের মতে সম্পদের বণ্টন খুবই অসম, বিশেষত আয় বণ্টনের তুলনাতে অনেক বেশি অসম। যেমন দক্ষিণ আমেরিকা, বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে সম্পদের বণ্টন খুবই অসম। সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সম্পদের সিংহভাগ রয়েছে। সে সমস্ত দেশে উচ্চ সম্পদ কর সম্পদ বণ্টনের অসমতাকে হ্রাস করতে সাহায্য করবে বলে অনেকেই এই করের পক্ষে।

অনদিকে বহু সম্পদ আকারে বৃহৎ হয়েও যে সমস্ত সম্পদ থেকে খুব সামান্য আয় হয়। আবার এমন অনেক ব্যক্তি থাকতে পারেন যাঁদের আয় স্বল্প, কিন্তু তাঁরা একটি বিরাট বাড়ির মতো কোনো সম্পদের মালিক। যেমন : অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক পেনসনভোগী মানুষদের মধ্যে অনেকেই এধরনের সম্পদের অধিকারী। সেক্ষেত্রে এ ধরনের সম্পত্তির মালিকদের উপর সম্পদকর অধিক বোঝা চাপাবে যা আয়কর চাপাবে না।

সবমিলিয়ে বলা যায় সম্পদের তুলনায় মানুষের জীবনযাত্রার প্রাথমিক নির্দেশক আয়কেই করের মূল ভিত্তি বলে ধরা হয়। তবে বহু দেশেই আয়ের সঙ্গে কিছুকিছু ধরনের সম্পদও করযোগ্য বলে গৃহীত।

অনুশীলনী—১

১। কী কী বিষয়ের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির করযোগ্য আয় হিসাব করা যেতে পারে?

২। আয়ের সংজ্ঞা কী?

৩। করযোগ্য আয় পরিমাপ করার সময় কী কী বিষয় মনে রাখা দরকার?

৪। করের ভিত্তি হিসাবে ব্যয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি করে যুক্তি দিন।

৫। কী কী কারণে আয়ের তুলনায় সম্পদকে করের অধিকতর কাম্য ভিত্তি বলে মনে করা হয়েছে? যে কোনো দুটি যুক্তি দিন।

৩.৪ মূলধনী লাভ কী আয়

বাড়ি-জমি, গয়না, শেয়ার, বন্ড প্রভৃতি যে দামে কেনা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তার তুলনায় দাম বাড়তে বা কমতে পারে। সুতরাং নিজস্ব কোনো অবদান ছাড়াই ঐ সম্পদের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান হতে পারেন। অবশ্য শেয়ার প্রভৃতির ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির ফলে দাম বাড়া ছাড়াও কোম্পানির উৎপাদনশীলতা বা মুনাফাবৃদ্ধির ফলেও শেয়ার বা বন্ডের দাম বাড়তে পারে।

এই ধরনের মূলধনীলাভের ফলে জাত উপার্জনকে অনেকেই আয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে অনিচ্ছুক। মূলধনী লাভকে অর্থনীতিবিদরা গাছের ফল নয়, গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করে বলছেন যে এক্ষেত্রে শুধু আর্থিক আয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সামগ্রিকভাবে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সামগ্রিকভাবে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাবার ফলে মূলধনী লাভ ঘটলেও প্রকৃত আয় বাড়ছে না। অবশ্য মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য আয়ও কমবেশি প্রভাবিত হতে পারে। তাই অনেকের মতে মূলধনী লাভকে আয়ের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের একটি বিষয় বলে ভাবাটা ঠিক নয়।

৩.৪.১ মূলধনী লাভের বৈশিষ্ট্য

মূলধনী লাভ আয় হলেও অন্যান্য আয়ের সঙ্গে তার কতকগুলি পার্থক্য আছে।

- প্রথমত, অন্যান্য আয়ের থেকে মূলধনী লাভ অনেক বেশি অনিয়মিত এবং অনিশ্চিত।
- দ্বিতীয়ত, মূলধনী লাভ টাকায় পরিণত হলেই তবে করের আওতায় আসবে। সুতরাং মূলধনী লাভের মালিক মূলধনী লাভকে টাকায় পরিণত না করে সারাজীবন ধরে তাকে হাতে রেখে দিয়ে কর দেওয়া এড়াতে পারেন।
- তৃতীয়ত, মূলধনী লাভকে সহজেই ভিন্ন ধরনের আয়ে পরিণত করা যেতে পারে।
- চতুর্থত, মূলধনী লাভের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে তা ঋণাত্মক বা ধনাত্মক দুই-ই হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য আয় কখনই ঋণাত্মক হয় না।
- পঞ্চমত চরম মুদ্রাস্ফীতির সময়ে মূলধনী লাভের ফলে বাস্তব আয়ে প্রায় কোনো পরিবর্তন হয় না।

৩.৪.২. মূলধনী লাভের উপর করারোপ

মূলধনী লাভ অনিয়মিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ বলে আয়করের তুলনায় মূলধনী লাভের ক্ষেত্রে অনেক কম হারে কর আরোপ করা হয়। অনেক অর্থনীতিবিদের মতে উচ্চ আয়কর ঝুঁকিবহন তথা বিনিয়োগের প্রবণতা হ্রাস করবে, যদিও এর পক্ষে যে সমস্ত সাক্ষপ্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলি খুবই বিতর্কিত। তাই তাঁরা ঝুঁকিবহনের দিকে তাকিয়ে মূলধনী লাভকে কম হারে কর আরোপ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত কম হারে মূলধনী লাভের উপর কর আরোপ করলে ঝুঁকিবহন ও বিনিয়োগের উপর আয়করের সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিছুটা হ্রাস পাবে।

অন্যদিকে এই আয়কে অন্যভাবে দেখা হলে হিসাব রাখার প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিরা মূলধনী লাভকে সারা জীবন টাকায় রূপান্তরিত না করে অবসরের আগে টাকায় রূপান্তরিত করতে চান বলে কর থেকে প্রাপ্য সরকারি আয় কমে যায়।

সংশোধনের প্রস্তাব :

প্রত্যেক বছরে যে মূলধনী লাভ ঘটছে, তাকে বছরের আয়ের মধ্যে ধরে করের হিসাব করার প্রস্তাব দিয়েছেন অনেক অর্থনীতিবিদ। এই মতের বিরোধীরা বলছেন যে প্রতি বছর বন্ড, সিকিউরিটিসহ সমস্ত সম্পত্তির মূলধনীলাভ হিসেব করতে গেলে অর্থনীতির উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি হবে।

অনুশীলনী

১। মূলধনী লাভ কী আয়?

২। মূলধনী লাভের বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

৩.৫ আয়করের প্রভাব

আয়কর আরোপ করলে ব্যক্তির কর্মের উদ্যোগ হ্রাস পেতে পারে। বেশি আয় করলে সরকারকে বেশি কর দিতে হবে জানলে তার কাজ করার ইচ্ছা কমে যেতে পারে। একইভাবে করদাতার সঞ্চয় বা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হতে পারে। আমরা এবার এই তিনটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর আয়করের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করবো।

৩.৫.১ কর্মোদ্যোগ বা কর্মপ্রয়াসের উপর আয়করের প্রভাব

আমরা জানি প্রতিটি দিনই ২৪ ঘণ্টার। যেকোনো ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টার সময়টিকে উপার্জন এবং অবসর এই হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন—এই দুটির মধ্যে যে কোনো একটি সমন্বয় তিনি তাঁর পছন্দমত বেছে নিতে পারেন। আয় এবং অবসর দুটিই স্বাভাবিক দ্রব্য। দিনের ২৪ ঘণ্টা নির্দিষ্ট বলে তিনি যদি উপার্জনের জন্য এক ঘণ্টা বেশি সময় ব্যবহার করেন, তাঁর অবসর এক ঘণ্টা হ্রাস পাবে। আবার অবসর এক ঘণ্টা বাড়লে তাঁর উপার্জনের জন্য বরাদ্দ সময় ১ ঘণ্টা হ্রাস পাবে। আয় এবং অবসর দুটিই স্বাভাবিক দ্রব্য বলে দুটির প্রান্তিক উপযোগিতাই ধনাত্মক কিন্তু ক্রমহ্রাসমান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আয় বা অবসর—যে কোনটির এক একক বাড়লেই তাঁর উপযোগিতা বাড়ে। কিন্তু দিনটির ২৪ ঘণ্টা যেহেতু নির্দিষ্ট, দুটিই একসঙ্গে বাড়বে না।

অন্যদিকে মজুরির হার স্থির থাকলে উপার্জনের সময় বাড়লে আয় বাড়বে কিন্তু অবসর হ্রাস পাবে। কোনো মানুষের পক্ষেই ২৪ ঘণ্টার পুরোটাই উপার্জন বা ২৪ ঘণ্টার পুরোটাই অবসরের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি উপার্জন এবং অবসরের নানা সমন্বয় ব্যবহার করতে পারেন। যেমন ৮ ঘণ্টা কাজ, ১৬ ঘণ্টা অবসর; ১০ ঘণ্টা কাজ, ১৪ ঘণ্টা অবসর প্রভৃতি। সেই অনুযায়ী উপার্জন এবং আয়ের মধ্যে আমরা একটি নিরপেক্ষ রেখা আঁকতে পারি। এই নিরপেক্ষ রেখাও অন্যান্য রেখার অনুরূপ হবে। এর প্রতিটি বিন্দু হবে আয় এবং অবসরের নানান্ সমন্বয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে একই উপযোগ দেবে। সাধারণ নিরপেক্ষ রেখার ন্যায় এগুলিও কেন্দ্র বিন্দুর দিকে উত্তল আকৃতির হয় এবং উপরে অবস্থিত নিরপেক্ষরেখা তলার নিরপেক্ষরেখার থেকে অধিকতর তৃপ্তি নির্দেশ করে।

এখানে আরো অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে ২৪ ঘণ্টার দিনটি আয় এবং অবসর ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না। এছাড়া মনে করা হচ্ছে যে শ্রম করা ছাড়া আয়ের আর কোনো উৎস নেই।

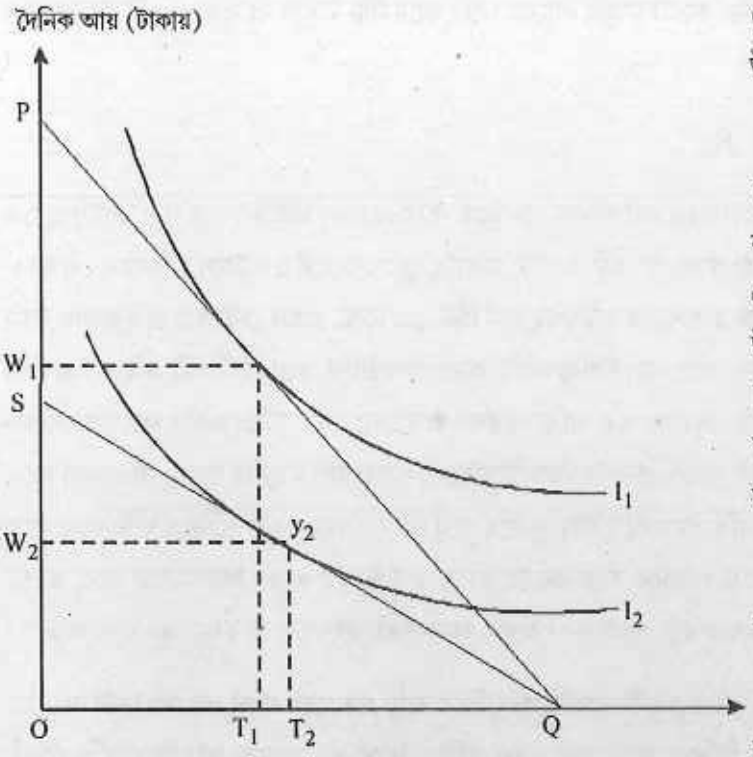

চিত্র ৩.১
কর্মের উদ্যোগের উপর আয়করের প্রভাব

মনে করি PQ হল ব্যক্তির বাজেট রেখা। তিনি পুরো ২৪ ঘণ্টা আয় করার কাজে নিযুক্ত থাকলে পাবেন OP আয়, এবং ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ OQ অবসর উপভোগ করলে পাবেন শূন্য আয়। PQ রেখার অন্য যে কোনো বিন্দুতে ব্যক্তির আর্থিক আয় হবে মোট মজুরির সমান।

মনে করি, W = মজুরির হার T = অবসরের ঘণ্টা।

∴ আয় = $W(24 - T)$ = মোট মজুরি।

অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা থেকে অবসরের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টুকুকে মজুরির হার দিয়ে গুণ করলে মোট মজুরি পাওয়া যাবে, যা কি না আয়ের সমান।

কোনো ব্যক্তির পক্ষেই যেহেতু ২৪ ঘণ্টা উপার্জন করা বা ২৪ ঘণ্টা অবসর যাপন করা সম্ভব নয়, সুতরাং তিনি PQ বাজেট রেখার P বা Q বিন্দুতে থাকবেন না। সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর উপযোগিতা সর্বোচ্চ করবেন কীভাবে? যেখানে বাজেট রেখা PQ সর্বোচ্চ নিরপেক্ষ রেখা I_1-কে স্পর্শ করবে। সেখানে আয়কারীর আয় ও অবসরের সমন্বয় থেকে উপযোগিতা সর্বাধিক হবে। আলোচ্য চিত্রে (৩.১) তা ঘটবে E_1 বিন্দুতে।

E_1 বিন্দুতে অবসরের ঘণ্টা = OT_1

E_1 বিন্দুতে কাজের সময় = T_1Q অর্থাৎ $OQ - OT_1$

E_1 বিন্দুতে আয় = OT_1।

এবার ধরা যাক আয়ের উপর 'R' শতাংশ কর আরোপিত হল। এর ফলে যদি মজুরির হারে কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে এই ব্যক্তির আয় রেখা বাঁদিকে 'R' শতাংশ অনুপাতে S বিন্দুতে নেমে আসবে। SQ রেখা দেখাবে কর দেবার পর এই ব্যক্তি কতটা মজুরি পাবেন। সেক্ষেত্রে নীট মজুরি বা করপরবর্তী মজুরি হতে মোট মজুরির তুলনায় R শতাংশ কম।

∴ নীট মজুরি = মোট মজুরি (1–R)

এখন মজুরি হ্রাস পাবার ফলে অবসরের আপেক্ষিক দাম হ্রাস পাবে। যেমন মজুরির হার যদি ঘণ্টাপিছু ১০ টাকা থেকে ৮ টাকায় নেমে আসে, তাহলে আগে তিনি ১ ঘণ্টা অবসর ভোগ করলে ১০ টাকা হারাতেন। এখন ৮ টাকা হারাবেন। অর্থাৎ আগে তাঁর কাছে অবসরের ঘণ্টাপিছু দাম ছিল ১০ টাকা, এখন সেই আপেক্ষিক দাম কমে হল ঘণ্টাপিছু ৮ টাকা। পরিবর্ত প্রভাব বলে ব্যক্তি সবসময়ই আপেক্ষিকভাবে সস্তা জিনিষটি চাইবে। এখানে অবসরের আপেক্ষিক দাম হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং এই ব্যক্তি পরিবর্ত প্রভাবের ফলে দামি (অর্থাৎ কাজের ঘণ্টায়) দ্রব্যটির পরিবর্তে আপেক্ষিকভাবে সস্তা (অর্থাৎ অবসর) দ্রব্যটি চাইবে। পাশাপাশি মজুরির হার হ্রাস পাবার ফলে সমপরিমাণ অর্থ পেতে তাঁকে আরো বেশি সময় ধরে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ আগে এই ব্যক্তি ৪ ঘণ্টা কাজ করে (১০ × ৪) = ৪ টাকা পেতেন। এখন ঐ পরিমাণ আয় করতে তাঁকে ৫ ঘণ্টা (৫ × ৮) শ্রম করতে হবে, তবেই তিনি পূর্বের সমান, অর্থাৎ ৪০ টাকা আয় করতে পারবেন। অর্থাৎ আয় প্রভাবের ফলে তাঁর কাজের ঘণ্টা বাড়বে।

একদিকে পরিবর্ত প্রভাবের ফলে কাজের ঘণ্টা কমবে, অন্যদিকে আয় প্রভাবের ফলে কাজের ঘণ্টা বাড়বে। এই কমা-বাড়ার নীট ফল কী হবে তা নিশ্চিত করে বলা বেশ কঠিন। তবে এই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াগুলি ঘটতে পারে :

১। আগের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার চেষ্টা প্রবলতর হলে কাজের ঘণ্টা বাড়বে;

২। কর্মস্থলে সম্মান, গুরুত্ব, দায়িত্ব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে কর বসলেও কাজের ঘণ্টা না-ও কমতে পারে। বিশেষত ন্যূনতম কাজের ঘণ্টার অধিকাংশ সময়ে নির্দিষ্ট করা থাকে, ফলে ন্যূনতম সেই সময়টুকু কাজ করতেই হবে।

৩। তবে করারোপের ফলে শ্রমের যোগান বা কাজের ঘণ্টা অন্যভাবে কমতে পারে—কর্মস্থলে অনুপস্থিতির হার বাড়তে পারে, কমতে পারে ওভারটাইমের আগ্রহ।

উপরের চিত্রে কর বসাবার পর ব্যক্তি y_2 বিন্দুতে ভারসাম্যে এসেছেন অর্থাৎ তিনি এখন OT_2 অবসর এবং OW_2 আয় পছন্দ করছেন। এবং তিনি T_2O ঘণ্টা কাজ করছেন। অর্থাৎ তাঁর কর্মোদ্যোগ কমছে।

৩.৫.২ ঈর্ষার প্রভাব

কর আরোপ করার ফলে বাস্তবে উপার্জনকারীর মজুরি কমছে। তা মজুরির হার হ্রাসের সমান। কিন্তু করারোপের ফলে মজুরি হ্রাসকে আক্ষরিকভাবে মজুরির হারে হ্রাসের সঙ্গে একভাবে দেখতে রাজি নন বহু উপার্জনকারী। অর্থনীতিবিদ্ রিচার্ড মাসগ্রেভ বলেছেন যে উপার্জনকারী আয়করকে এতোটাই অপছন্দ করতে পারে যে সে সরকারি কোষাগারে যাতে টাকা না যায়, সেজন্য ইচ্ছে করে কাজের সময় কমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মজুরির হার হ্রাস পেলে তার প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হত না। সে তখন এভাবে কাজের সময় কমাতো না। আয়করের ফলে কাজের ঘণ্টার যে বাড়তি হ্রাস হচ্ছে, তাকেই মাসগ্রেভ বলেছেন ঈর্ষার প্রভাব।

অনুশীলনী—১

১। আয়করের ক্ষেত্রে কর্মোদ্যোগের উপর পরিবর্ত প্রভাব কী হতে পারে?

২। এই কর আরোপের আয়প্রভাবই বা কী হতে পারে?

৩। কর্মোদ্যোগের উপর আয়কর আরোপের চূড়ান্ত ফলাফল কীভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে? ঐ চূড়ান্ত ফলাফল সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় কী?

৪। করারোপের ফলে নতুন ভারসাম্যে কী কাজের ঘণ্টা কমে যাবে?

৫। ঈর্ষার প্রভাবে করারোপের ফলে কাজের ঘণ্টা কমবে না বাড়বে?

৩.৫.৩ আয়করের প্রভাব : সঞ্চয়ের উপর

এখানে সঞ্চয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করার সময় ধরে নিচ্ছি যে কর্মপ্রয়াস বা কর্মোদ্যোগে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। এই আলোচনায় আমরা শুধু দুটি সময়কালকে আলোচনায় আনছি। প্রথম সময়কালে (বর্তমানে) ভোক্তার উপার্জিত আয় বর্তমান সময়েই ব্যয় হতে পারে অথবা তা দ্বিতীয় সময়কালে (ভবিষ্যতে) ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত থাকতে পারে। বর্তমান সময়ে ভোগের জন্য যে পরিমাণ আয় পাওয়া যাচ্ছে, চলতি সুদের হারে হিসাব করলে ভবিষ্যতে তার থেকে বেশি ব্যয়যোগ্য আয় পাওয়া যাবে।

ধরা যাক কেউ বর্তমান মুহূর্তে 'D' পরিমাণ টাকা আয় করলো। সেই টাকা সে বর্তমান সময়ে ব্যয় করলে তার ব্যয়যোগ্য আয় হবে D। কিন্তু যদি সে ঐ পরিমাণ (বা তার একাংশ) টাকা বর্তমান সময়ে ব্যয় না করে r শতাংশ সুদে বিনিয়োগ করে, তাহলে ভবিষ্যতে সে (D + Dr) বা (D(1 + r) পরিমাণ টাকা ব্যয় করতে পারবে। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শুধুমাত্র প্রথম সময়কালে মজুরি পাওয়া যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় সময়কালে কোনো আয় উপার্জিত হচ্ছে না। এছাড়া আরো অনুমান করে নেওয়া হচ্ছে যে নিছক সঞ্চয়ের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতে ভোগ করার জন্যই বর্তমান সময়ে টাকা সঞ্চিত রাখা হচ্ছে। সেজন্য বর্তমানের সঞ্চয়কে আমরা ভবিষ্যতের ভোগ ব্যয়

হিসাবেও দেখতে পারি। শুধুমাত্র বর্তমান বা ভবিষ্যতের ভোগের জন্যই আয় ব্যবহার হচ্ছে বলে আমরা আয়ের রেখাটিকে ভোগ সম্ভাবনা রেখাও বলতে পারি।

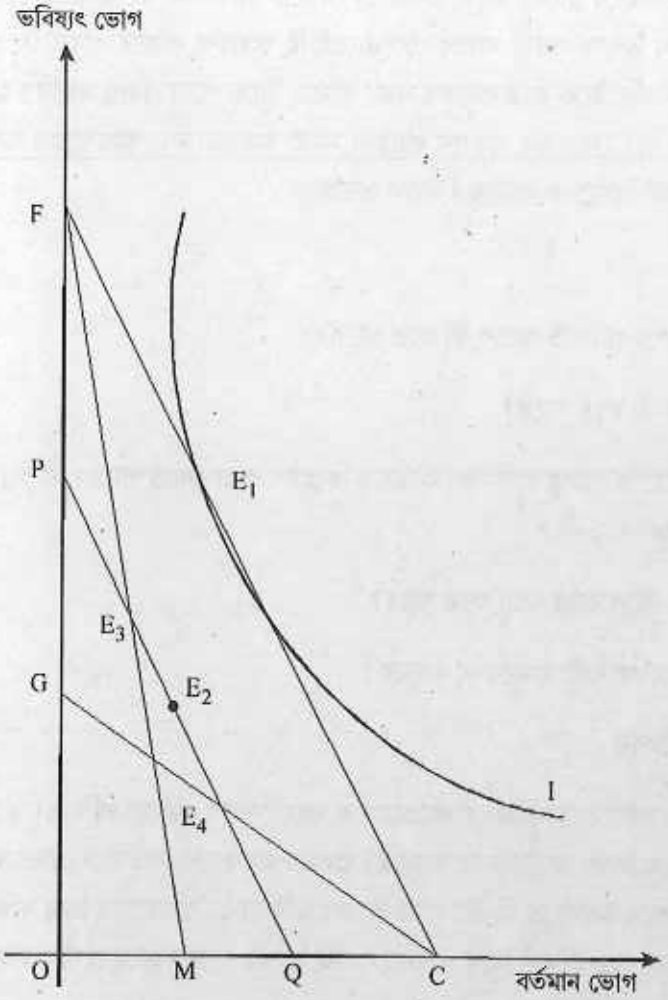

চিত্র ৩.২
সঞ্চয়ের উপর আয়করের প্রভাব

চিত্র ৩.২-তে বর্তমান (প্রথম সময়কালের) আয় বা ভোগকে অনুভূমিক অক্ষে এবং ভবিষ্যৎ আয় বা ভোগ পর্বে উল্লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা হচ্ছে। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ভবিষ্যৎ বা বর্তমান ভোগ, উভয় ক্ষেত্রেই আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভোগের মধ্যে নিরপেক্ষ রেখাটি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে উৎসের দিকে উত্তল। ধরা যাক OC হচ্ছে প্রথম সময়কালের (বা বর্তমানের) আয়। আলোচ্য ব্যক্তি এই আয় প্রথম সময়কালে ব্যয় করতে পারে। অথবা দ্বিতীয় সময়কাল পর্যন্ত সঞ্চয় করতে পারে। যদি সুদের হার r শতাংশ হয়, তবে বর্তমানে OC আয় হবে ভবিষ্যতের $(1 + r)$ OC আয় = OF আয়।

$\therefore$ OF = $(1 + r)$ OC

বা বর্তমানের আয় = সুদসহ ভবিষ্যতের আয়

$\therefore$ FC রেখার ঢাল = OF/OC = $1 + r$

এক্ষেত্রে সুদের হার r হবে (OF – OC)/OC

এবার ধরা যাক আয়কর আরোপিত হল। এই কর নানান ভিত্তিতে আরোপিত হতে পারে, বর্তমান আয়,

ভবিষ্যৎ আয়, বর্তমান বা ভবিষ্যতের ব্যয়, অর্জিত সুদ, সুদসহ বা সুদ-ব্যতীত ভবিষ্যতের আয় প্রভৃতি। এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে করের ভিত্তির প্রভাব হবে ভিন্ন।

ক. মনে করি এমন একটি আয়কর আরোপিত হল যা বর্তমান ভবিষ্যৎ আয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না, শুধু সুদকে কর থেকে ছাড় দেয়। অর্থাৎ বর্তমান সঞ্চয়ের উপর ভবিষ্যতে যে সুদ পাওয়া যেতো, তা করের আওতার বাইরে থাকছে। ফলে ভোগ সম্ভাবনা রেখা, করের পরিমাণ অনুযায়ী সমান্তরালভাবে বাঁ দিকে PQ অবস্থানে চলে আসবে। এইক্ষেত্রে করের হার হবে QC/OC। E_2 হবে নতুন ভারসাম্য। যেখানে নিরপেক্ষ রেখা ঐ PQ কে E_2 বিন্দুতে স্পর্শ করে। ঐ বিন্দুতে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় ভোগব্যয়ই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে করদাতারা বর্তমানের ভোগ কমিয়ে ভবিষ্যতের ভোগ বাড়ানো বা বিপরীত কিছু করার কথা ভাববে না। কারণ এখানে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভোগ ব্যয় উভয়ের উপরেই সমভাবে কর আরোপিত হচ্ছে।

খ. শুধুমাত্র বর্তমান ভোগব্যয়ের উপর কর আরোপিত হলে ভোগ সম্ভাবনা রেখা FC থেকে FM -এ সরে আসবে। E_3 হবে নতুন ভারসাম্য। যেখানে FM PQ কে ছেদ করেছে এবং সেখানে নিরপেক্ষ রেখা FC কে স্পর্শ করেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগ ব্যয় উভয়েই করদাতার কাছে স্বাভাবিক দ্রব্য হলে E_3 সবসময়ই E_2 এর বাঁ দিকে থাকবে। অর্থাৎ আয়করের পরিবর্তে সমপরিমাণে ব্যয়কর বসালে করদাতাদের বর্তমান ভোগের প্রবণতা কমতো এবং ভবিষ্যৎ ভোগ বা সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়তো।

গ. সবশেষে শুধুমাত্র সঞ্চয়ের উপর কর আরোপিত হলে এর অর্থ দাঁড়াবে ভবিষ্যতের ভোগের উপর কর। এইক্ষেত্রে ভোগ সম্ভাবনা রেখা CG তে সরে যাবে এবং কর-পরবর্তী নতুন ভারসাম্য বিন্দু হবে E_4। এই বিন্দুতে CQ, PQ কে ছেদ করেছে এবং CG নিরপেক্ষ রেখাকে স্পর্শ করেছে। এই বিন্দুতে CQ, PQ কে ছেদ করেছে এবং নিরপেক্ষ রেখাকে স্পর্শ করেছে। E_4 সবসময়ই E_2 -এর ডানদিকে থাকবে কারণ এক্ষেত্রে করদাতারা সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়ে বর্তমান ভোগের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে।

অনুশীলনী

১। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আয়ের বাজেট রেখাটি কীভাবে পাওয়া যাবে?

২। এক্ষেত্রে আবশ্যিক অনুমানগুলি কি?

৩। কেন E_1, E_2 -বিন্দুর বাঁ দিকে এবং E_4-E_2 বিন্দুর ডানদিকে থাকবে?

৩.৫.৪ আয়করের প্রভাব : বিনিয়োগের উপর

শুধুমাত্র সঞ্চয় হলেই যে আর্থিক উন্নয়ন হবে তা নয়, ঐ সঞ্চয়কে বিনিয়োগে পরিণত করতে হবে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ অপেক্ষক থেকে পরিমাপ করা যাবে। এখানে বিনিয়োগ অপেক্ষক সুদের হারের উপর এবং সঞ্চয় অপেক্ষক আয়ের পরিমাণ ও সুদের হারের উপর নির্ভর করবে।

চিত্র ৩.৩-এ I_1 ও I_2 যথাক্রমে কর-পূর্ববর্তী মোট বিনিয়োগ রেখা, যা সুদের হারের সঙ্গে ঋণাত্মক সম্পর্কে আবদ্ধ। বিভিন্ন বিন্দুতে প্রতিদানের বিভিন্ন স্তরে বিনিয়োগের বিভিন্ন হার দেখানো হয়েছে। S_1 এবং S_2 হল

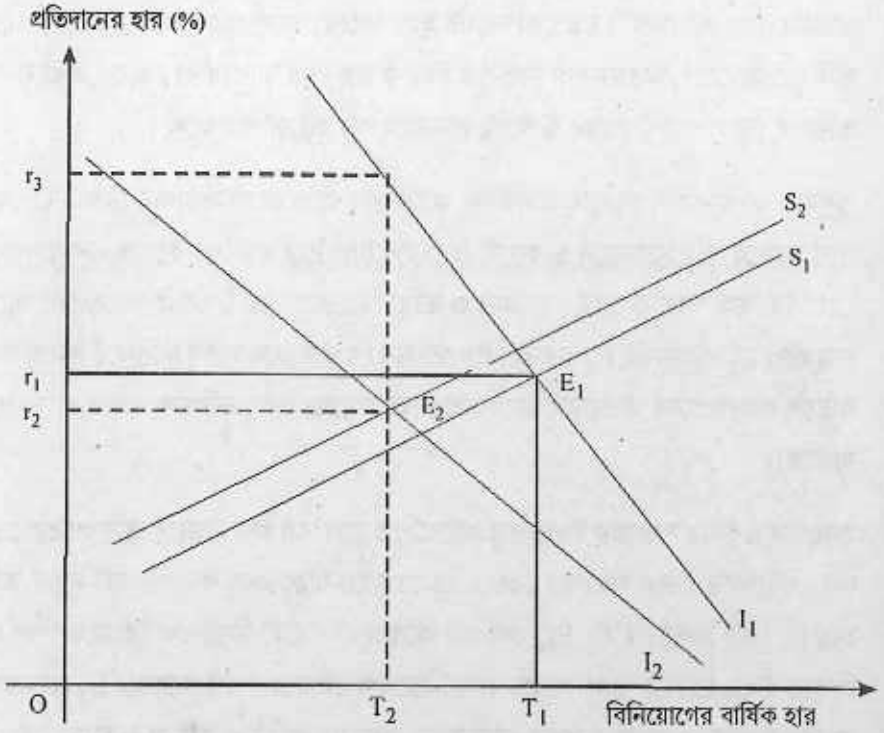

চিত্র ৩.৩
বিনিয়োগের উপর আয়করের প্রভাব

বিভিন্ন সুদের হারে যথাক্রমে কর পূর্ববর্তী ও কর পরবর্তী সঞ্চয়ের যোগানের পরিমাণ। সুদের হার বাড়লে সঞ্চয়ের পরিমাণ তথা বিনিয়োগের জন্য তহবিলের যোগান বাড়বে।

কর আরোপের আগে ভারসাম্য বিন্দু ছিল E_1 এখন যদি মুনাফা বা প্রতিদানের উপর r_1r_3/Or_2 হারে কর বসে, বিনিয়োগ রেখা বাঁ দিকে I_2 তে সরে যাবে এবং সঞ্চয় রেখা উপরে সরে যাবে। বিনিয়োগের পরিমাণ কমছে

বলে ভারসাম্যে মোট প্রতিদানের হার বেড়ে হয় Or_3। কিন্তু করের পরিমাণ বাদ দিলে নীট প্রতিদানের হার হল Or_2। এখন প্রকৃত প্রতিদানের হার আগের তুলনায় কমেছে, যদিও আপাতভাবে মোট প্রতিদানের হার আগের তুলনায় বেড়েছে। নূতন ভারসাম্য বিন্দু বিনিযোগের পরিমাণ এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ OT_1 থেকে OT_2 -তে মে আসবে।

সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ রেখাটি যত বেশি সুদ (প্রতিদানের হার) স্থিতিস্থাপক (চিত্রের ভাষায় ঢালু) হবে, বিনিয়োগের পরিমাণ তত বেশি হ্রাস পাবে।

এখানে আমরা বিনিয়োগের উপর আয়করের প্রভাবটিকে অত্যন্ত সরল করে হাজির করেছি যা বাস্তবসম্মত নয়। বাস্তবে সুদ বা প্রতিদানের হার আলোচিত ক্ষেত্রের মতো নির্দিষ্ট থাকে না। বরং সেখানে বিনিয়োগ করে বাস্তবে কতটা কী হারে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা নির্দিষ্ট থাকে না বলে একটা ঝুঁকি থেকেই যায়। আমরা আমাদের আলোচনায় ঝুঁকির বিষয়টি আনিনি।

অনুশীলনী—১

১। কর আরোপের পর বিনিয়োগের হার বাড়বে না কমবে?

৩.৬ সারাংশ

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, সরকার রাজস্ব সংগ্রহের জন্য যে কর আরোপ করে, তাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করের বোঝা করদাতাকেই সরাসরি বহন করতে হয়, কিন্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে এই বোঝা অন্যকে স্থানান্তর করা যায়। সাধারণত আয়-ব্যয় এবং সম্পদকেই প্রত্যক্ষ করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। কোন ব্যক্তির কর প্রদানের ক্ষমতা তার আয়ের উপর নির্ভর করে বলে আমাদের কর যোগ্য আয়ের কথা বিবেচনা করতে হবে। করযোগ্য আয় পরিমাপের সময় আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে করের বোঝা বাড়ালে, ব্যক্তির ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস পাবে, এবং তা ব্যক্তির পরিশ্রমের ইচ্ছা হ্রাস করে দিতে পারে।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সরকার কর আরোপ করে থাকে, তা হল মূলধনী লাভ। কিন্তু উহা আয়কর বড়ই অনিশ্চিত। তবে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারের মূল অস্ত্র। কিন্তু অতিরিক্ত আয়করে

ব্যক্তির ব্যয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সে কর্মের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। আবার এতে তার সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়তে পারে, কিন্তু সঞ্চয় বাড়লেও কর আরোপের ফলে বিনিয়োগের হার কমবে।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Richard A. Musgrave & Peggy B Musgrav : Public Finance in Theory and Practice; McGraw Hill International, 1989, Chapter 17.

(২) John F. Due & A. F. Fried Iaender : Government Finance : Economics of the Public Sector, AITBS Publishers, New Delhi, 1994. Chapter-12.

একক ৪ ❐ পরোক্ষ কর—বিক্রয় কর ও উৎপাদন শুল্ক, পরোক্ষ করের বাড়তি বোঝা, করভার ও করচালন।

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ পরোক্ষ কর

৪.৩ বিক্রয় কর

৪.৩.১ একক পিছু কর

৪.৩.২ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে

৪.৩.৩ একচেটিয়া বাজারে

৪.৩.৪ মূল্যানুযায়ী কর

৪.৪ উৎপাদন শুল্ক

৪.৫ করের বাড়তি বোঝা

৪.৬ করভার ও করচালন

৪.৬.১ করচালনের রকমফের

৪.৬.২ করভারের পরিমাপ

৪.৬.৩ করচালন নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

৪.৭ সারাংশ

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন :

- পরোক্ষ কর কাকে বলে?
- বিক্রয়করের কী প্রভাব পড়ে?
  - প্রতিযোগিতামূলক বাজারে
  - একচেটিয়া বাজারে
- উৎপাদন শুল্কের প্রভাব
- পরোক্ষ করের বাড়তি বোঝা
- পরোক্ষ করের করপাত, করচালন ও করভার

৪.১ প্রস্তাবনা

আমরা এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কর নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ধরনের কর যার উপর আরোপিত হয়, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটিই করটি দেবে। কিন্তু সমস্ত করের ক্ষেত্রে তা ঘটেনা। বহু ক্ষেত্রে যার উপর কর আরোপ করা হল, সে অন্যের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে। যে সমস্ত করের ক্ষেত্রে এইভাবে করের বোঝা স্থানান্তর করা যায়, সে ধরনের করকে বলে পরোক্ষ কর। বিক্রয়কর এবং উৎপাদনশুল্ক হল এ ধরনের করের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এধরনের করের ফলে দ্রব্য ও পরিষেবার বাজার দাম প্রভাবিত হয়। ধরা যাক, সুতোর উপর কর বসলো, তাহলে কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। ফলে চাহিদা কমতে পারে। এর ফলে কাপড়ের ভারসাম্য দাম বৃদ্ধি পেতে পারে। পরোক্ষ করের ফলে দেখা যায় বাজারবিশেষে ভোক্তা এবং উৎপাদক উভয়ের উপরেই করের বাড়তি বোঝা চাপে। উভয়ের উদ্বৃত্ত হ্রাস পায়। সেজন্য পরোক্ষ করের আলোচনায় এ ধরনের বাড়তি বোঝার আলোচনা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। বিপরীতে, পরোক্ষ কর যার উপর আরোপিত হয়, সে করের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। যেমন বিক্রয়কর বিক্রেতার দেবার কথা। সে ক্রেতার থেকে ঐ কর আদায় করে নিতে পারে। এই পুরো প্রক্রিয়াটা ঘটে করচালনের মাধ্যমে। এর পাশাপাশি বাজারের প্রকৃত প্রভেদে বিক্রয়করের তুলনামূলক

প্রভাব দেখা যায়। সেজন্য আমরা মেটলিক দুটি বাজারের ধরন যথা প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং একচেটিয়া কারবারকে বেছে নেবো। আমরা এই এককে এই বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

৪.২ পরোক্ষ কর

যার উপর কর আরোপিত হল, সে না দিয়ে যদি অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পূর্ণ বা আংশিক মাত্রায় কোনো করের বোঝা বহন করে, সেই করকে আমরা পরোক্ষ কর বলবো। সাধারণত দ্রব্য ও পরিষেবা ক্রয়বিক্রয়ের সময় বিক্রয় কর বসে। এই কর দেওয়ার কথা বিক্রেতার। কিন্তু বিক্রেতা যদি ক্রেতাকেই করটি অংশত বা পুরোটা দিতে বাধ্য করে, তাহলে তা হবে পরোক্ষ করের উদাহরণ। যদি সে নিজে পুরোটাই বহন করে, তবে তা হবে প্রত্যক্ষ কর। সহজভাবে বললে বলা যায় যে প্রত্যক্ষ কর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর এবং বিক্রয়কর দ্রব্য ও পরিষেবার উপর আরোপিত হয়।

৪.৩ বিক্রয় কর

বিক্রয় কর দ্রব্য ও পরিষেবার উপর আরোপিত হয়। সরকার আয়বৃদ্ধির জন্য বা বিশেষ কোনো দ্রব্য বা পরিষেবা ভোগ করা থেকে ভোক্তাকে নিরুৎসাহ করতে বিক্রয় কর আরোপ করতে পারে। যেমন কাপড়ের উপর বিক্রয়কর সরকারি কোষাগারকে সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু মদ বা সিগারেটের উপর কর ঐ দ্রব্যগুলির দাম বাড়িয়ে ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোগ করা থেকে নিরুৎসাহ করতে চেষ্টা করবে।

বিক্রয়করের রকমফের : বিক্রয়কর এককপিছু বা মূল্যানুযায়ী হতে পারে। একক পিছু কর বলে সর্বস্তরে অর্থাৎ সবকটি এককের উপর সম হারে হবে, যেমন ধরা যাক সর্বস্তরে একক প্রতি কর হল ৫ টাকা। অন্যদিকে মূল্যানুযায়ী কর হলে দামের একটি শতাংশ কর হিসাবে ধার্য হবে, ধরা যাক সর্বস্তরে ৫ শতাংশ। এককপিছু করের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে সমান পরিমাণে (অর্থাৎ ৫ টাকা) সরকারের রাজস্ব হিসাবে আদায় হবে। মূল্যানুযায়ী করের ক্ষেত্রে সমান অনুপাতে (অর্থাৎ ৫%) সরকারের রাজস্ব আয় হবে।

৪.৩.১ এককপিছু করের ফলাফল

দুটি করের তুলনামূলক ফলাফল আলোচনা করার জন্য আমরা চাহিদা ও যোগানরেখা দুটি সরলরৈখিক বলে ধরে নিচ্ছি। চাহিদারেখা নিম্নাভিমুখী এবং যোগানরেখা ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা। এই করের ফলে উৎপাদন ব্যয় সর্বস্তরে সমান পরিমাণে বাড়ছে, সেজন্য আমরা ধরে নিতে পারি এই করের ফলে গড় ব্যয় রেখা সমান্তরালভাবে উপরে উঠে যাচ্ছে, বা গড় আয় রেখা সমান্তরালভাবে নেমে আসছে।

বাজারের চাহিদা রেখাটি শিল্প (পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে) বা ফার্মের (একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে) গড় আয় রেখা। কর আরোপের ফলে এই চাহিদারেখাটি প্রকৃতপক্ষে নেমে আসছে। কারণ তখন ক্রেতা যে দাম দিচ্ছে, সেই দামের পুরোটা আর উৎপাদক পাচ্ছে না। বিক্রেতা দাম পাচ্ছে কর-পরবর্তী চাহিদা রেখা অনুযায়ী, মধ্যবর্তী অংশটি সরকারি কোষাগারে যাচ্ছে। ফলে কর বসার আগে বাজারের চাহিদা রেখাটি হচ্ছে DD_1। কিন্তু কর বসার পরে বাস্তব চাহিদা রেখাটি হচ্ছে CC_1। ফলে ক্রেতা কী দাম দেবে তা নির্ধারিত হবে বাজারের চাহিদা রেখা অনুযায়ী, কিন্তু ক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হবে প্রকৃত চাহিদা রেখা অনুযায়ী।

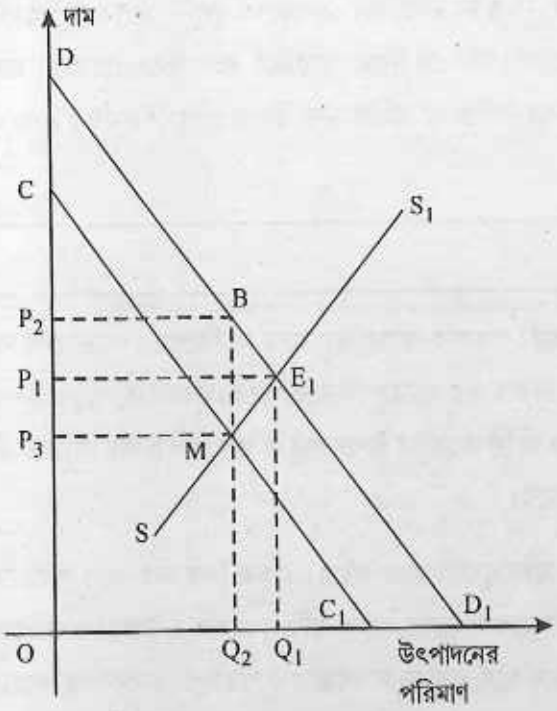

চিত্র ৪.১
প্রতিযোগিতামূলক বাজার

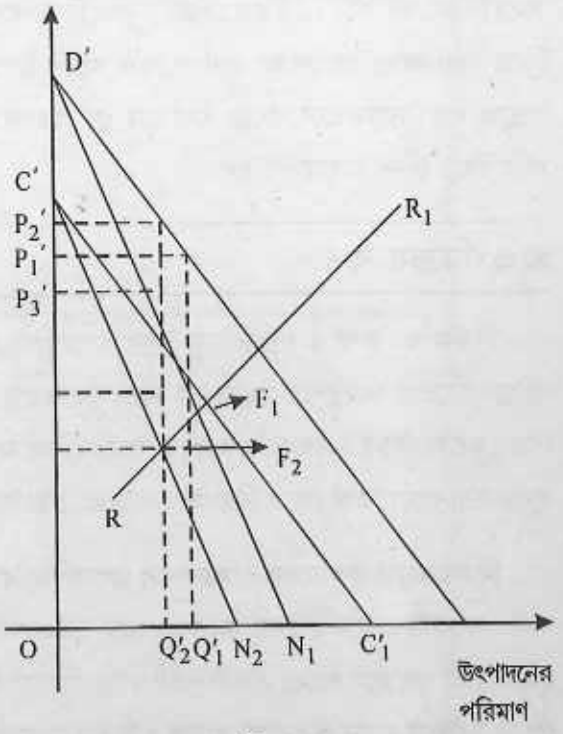

চিত্র ৪.২
একচেটিয়া বাজার

একককপিছু কর আরোপের প্রভাব

৪.৩.২ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে

ধরা যাক প্রাথমিক অবস্থায় চাহিদা রেখা ছিল DD_1, তা যোগান রেখা SS_1 কে E_1 বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং ভারসাম্য দাম P_1 ও ভারসাম্য পরিমাণ হল Q_1। ধরা যাক এককপিছু CD পরিমাণ কর আরোপের ফলে চাহিদা রেখাটি বাঁদিকে সমান্তরালভাবে স্থান পরিবর্তন করলো। ধরা যাক CC_1 হলো নতুন চাহিদা রেখা। DD_1

ও CC_1 এর মধ্যে উল্লম্ব দূরত্বই হল ঐ পরিমাণ উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর। নতুন চাহিদা রেখাটি যোগান রেখাকে M বিন্দুতে ছেদ করেছে। নতুন ভারসাম্য পরিমাণ Q_2 ও ভারসাম্য দাম P_2। লক্ষণীয় যে চাহিদা রেখাটি বাঁ দিকে সরে গেলেও দাম পূর্বতন চাহিদা রেখা থেকে এবং পরিমাণ নতুন চাহিদা রেখা থেকে নির্ধারিত হল। আরো লক্ষণীয় যে Q_2 পরিমাণে উৎপাদিত হলে এককপিছু কর হবে $CD = P_2P_3$। কিন্তু দাম বৃদ্ধি পেয়েছে P_2P_1 পরিমাণে। অর্থাৎ দামবৃদ্ধির P_1P_2 অংশটি ক্রেতারা এবং P_1P_3 অংশটি বিক্রেতারা বহন করবে।

৪.৩.৩ একচেটিয়া বাজারে

DD_1' ও $D_1'N_1$ হলো একচেটিয়া কারবারির যথাক্রমে গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা। একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বাধিক করা। এখানে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ পেতে গেলে প্রথমে প্রান্তিক ব্যয় রেখা যে বিন্দুতে প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করেছে তা নির্ধারণ করতে হবে। মনে করি কর বসার আগে ভারসাম্য বিন্দু ছিলো F_1। ঐ বিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ OQ'। দাম নির্ধারণের জন্য ভারসাম্য বিন্দু থেকে চাহিদা রেখা পর্যন্ত লম্ব টেনে দাম অক্ষ থেকে দাম হিসাবে পাওয়া গেল OP_1'।

$C'D'$ পরিমাণ কর আরোপের পর একচেটিয়া কারবারির চাহিদা DD_1' থেকে CC_1'-এ নেমে আসবে। করের আগে ভারসাম্য বিন্দু ছিল P_1'। এরপর কর আরোপ করার ফলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মতোই একচেটিয়া কারবারির গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা করের পরিমাণ অনুযায়ী সর্বস্তরে সমানহারে হ্রাস পাবে। চিত্রের ভাষায় বললে $C'D'$ পরিমাণ কর আরোপ করার ফলে গড় আয় সর্বস্তরে $C'D'$ পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। $C'C_1'$ হবে নতুন চাহিদা রেখা, তা $D'D_1'$ এর সঙ্গে সমান্তরাল হবে। দুটি রেখার মধ্যে উল্লম্ব দূরত্ব (=$C'D'$) হল এককপিছু করের পরিমাণ। গড় আয় হ্রাস পাবার ফলে প্রান্তিক আয়ও সমপরিমাণে হ্রাস পাবে। চিত্রের ভাষায় প্রান্তিক আয় রেখাও করের সমান পরিমাণে সমান্তরালভাবে, নীচে নেমে আসবে। পুরনো প্রান্তিক ব্যয় রেখা RR_1 ও নতুন প্রান্তিক আয় রেখার $C'N_2$ র ছেদবিন্দুটি হবে নতুন ভারসাম্য বিন্দু। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কমে হবে Q_2'। দ্রব্যটির দাম P_1' থেকে বেড়ে হবে P_2'। প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মতোই এখানে পুরানো চাহিদা রেখা থেকে ক্রেতার দেয় দাম নির্ধারিত হবে এবং নতুন চাহিদা রেখা থেকে উৎপাদকের প্রাপ্য আয় নির্ধারিত হবে এবং নতুন চাহিদা রেখা থেকে পরিমাণ নির্ধারিত হবে। এখানেও কর আরোপের পরিমাণ $C'D' = P_3'P_2'$। কিন্তু দামবৃদ্ধির পরিমাণ হলো $P_1'P_2'$। অর্থাৎ $P_1'P_2' < P_3' - P_2'$; বা দামবৃদ্ধির পরিমাণ < করের পরিমাণ। তার কারণ হল করের বোঝার $P_1'P_3'$ অংশটি উৎপাদকরা বহন করছে বলে বাড়তি দামের মধ্যে সেই অংশটি প্রবেশ করছে না।

অনুশীলনী—১

১। পরোক্ষ কর কাকে বলে?

২। মূল্যানুযায়ী কর আর এককপিছু করের পার্থক্য কী?

৩। বাজারের চাহিদা রেখা আর বাস্তব চাহিদা রেখা কর বসানোর পর পৃথক হয়ে যায় কেন?

৪। একক পিছু করারোপের প্রভাব প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কী হবে?

৫। একচেটিয়া বাজারেই বা কী হবে?

করের বোঝা

আমরা দেখলাম যে পরোক্ষ কর আরোপিত হলে তার একটা অংশ ক্রেতারা এবং অন্য অংশটি বিক্রেতারা বহন করছে। করের বোঝা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হবে? এই বোঝার বণ্টন চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করবে। যেমন কেরোসিন তেলের মতো অত্যাবশ্যক পণ্যের চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলে করের পুরো বোঝাটাই ক্রেতার উপর পড়বে। চিত্রের ভাষায় তা যোগান ও চাহিদা রেখার পারস্পরিক ঢালের উপর নির্ভর করবে। সেই অনুযায়ী বিক্রেতারা স্থির করবে কোনো বিক্রয় করের কতটা তারা ক্রেতার উপর চাপিয়ে দিতে পারবে। সাধারণভাবে বলা যায় বাজারে করভার ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার অনুপাতে বণ্টিত হয়।

$$\frac{\text{করভারে ক্রেতার অংশ}}{\text{করভারে বিক্রেতার অংশ}} = \frac{\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা}}{\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা}}$$

৪.৩.৪ মূল্যানুযায়ী কর

এককপিছু করের ক্ষেত্রে আমরা সর্বক্ষেত্রে সমান পরিমাণে করের কথা বলেছি। এবার সমান অনুপাতে করের কথা আলোচনা করছি। এক্ষেত্রে বাকি সবকিছু এক থাকবে, শুধু নতুন চাহিদা রেখাগুলি সমান্তরালভাবে বাঁদিকে সরে আসার পরিবর্তে করের অনুপাত অনুযায়ী কৌণিকভাবে সরে আসবে। যেমন চিত্র ৪.৩-এ PQ চাহিদা রেখা হয় ও অনুভূমিক অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ মাপা হচ্ছে। OQ যখন উৎপাদনের পরিমাণ, তখন দাম অক্ষ থেকে দামের পরিমাণ হবে শূন্য (0)। t শতাংশ কর আরোপ করা হলে করের পরিমাণ $0 \times t = 0$ (শূন্য)। এরপর এককপিছু দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে করের অনুপাত এক থাকলেও মোট করের পরিমাণ বাড়বে। সর্বোচ্চ দামে, অর্থাৎ দাম যখন OP, তখন PP"/OP অনুপাতে কর আরোপিত হবে, তখন করপরবর্তী চাহিদা বা গড় আয় রেখা PQ থেকে P"Q তে নেমে যাবে। করের হার হবে ∠PQP"। এর পাশাপাশি এককপিছু সমপরিমাণ করের

ক্ষেত্রে চাহিদা রেখা সমান্তরালভাবে বাঁ দিকে P'Q' এ সরে আসবে। সমপরিমাণ করের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণের উপর করের পরিমাণ নির্ভর করবে না, সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণের উপর করের পরিমাণ নির্ভর করবে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে বাকি বিশ্লেষণ একই থাকবে।

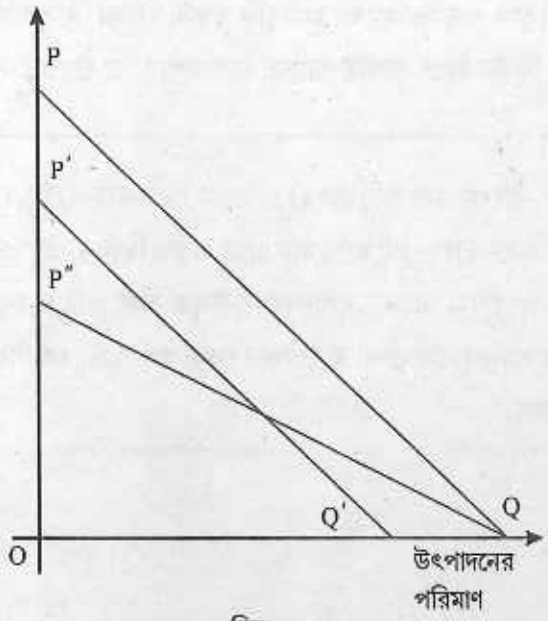

চিত্র ৪.৩
চাহিদা রেখার উপর একক পিছু ও মূল্যানুযায়ী করের প্রভাব

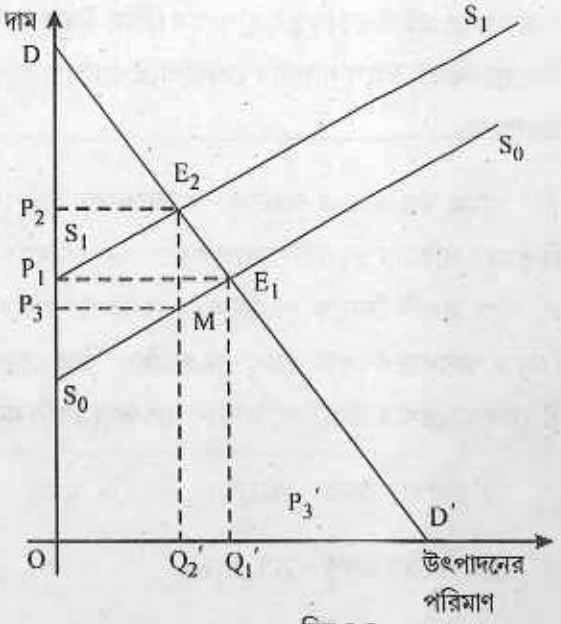

চিত্র ৪.৪
উৎপাদনশুল্কের প্রভাব

৪.৪ উৎপাদন শুল্ক

এ পর্যন্ত আমরা বিক্রয়করের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। এই বিশ্লেষণ প্রতিযোগিতামূলক এবং একচেটিয়া—দুধরনের বাজারের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এবার আমরা উৎপাদন শুল্কের আলোচনায় আসছি।

সরলীকরণের জন্য ধরে নেওয়া যায় এককপিছু উৎপাদন শুল্ক স্থির রয়েছে। চাহিদা ও যোগান পূর্বের মতোই সরলরেখা, যথাক্রমে নিম্ন ও উর্ধ্বমুখী। এবার মনে করি চাহিদা রেখা DD'-কে যোগান রেখা O, E_1 বিন্দুতে ছেদ করেছে। এর জন্য চিত্র ৪.৪ দেখুন। এই চিত্রে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ Q_1, ভারসাম্য দাম P_1। উৎপাদন ব্যয়ের উপর S_0S_1 পরিমাণ কর আরোপ করায় প্রতিস্তরে উৎপাদন ব্যয় সমপরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নতুন যোগান রেখা হবে S_0S_0-এর সমান্তরালভাবে উপরে S_1S_1, নতুন ভারসাম্য বিন্দু হবে E_2। ভারসাম্য দাম = OP_2, ভারসাম্য পরিমাণ = OQ_2। এক্ষেত্রে দামবৃদ্ধি হয়েছে P_1P_2, যদিও কর আরোপের পরিমাণ P_3P_2। করারোপের মধ্যে ক্রেতার দেয় অংশ = P_1P_2 ও বিক্রেতার অংশ = P_1P_3।

৪.৫ করের বাড়তি বোঝা

ভারসাম্য উৎপাদনের বিন্দুতে সাধারণত উৎপাদক ও ক্রেতা উভয়ই কিছুটা উদ্বৃত্ত ভোগ করে। কর আরোপ করার ফলে এই উদ্বৃত্ত কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু উদ্বৃত্ত যতটা হ্রাস পায় সরকারের আয়বৃদ্ধি ততটা হয় না। হ্রাসপ্রাপ্ত উদ্বৃত্তের কিছুটা অংশ সরকারি কোষাগারে গেলেও বাকি কিছুটা অংশ কেউই পায়না, না সরকার, না ক্রেতা, না উৎপাদক।

যেমন চিত্র ৪.৪-এ করারোপের আগে দাম ছিল P_1, উৎপাদনের পরিমাণ Q_1। তখন ভোক্তারা ΔDP_1E ত্রিভুজের পরিমাণ উদ্বৃত্ত উপভোগ করছিলেন। যে সমস্ত ভোক্তা DP_1-এর মধ্যে দাম দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁরাও P_1 দামে দ্রব্যটি কিনতে পারছিলেন। বিপরীতে পুরনো ভারসাম্য দামে উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত ছিল $\Delta S_0P_1E_1$ ত্রিভুজ, কারণ তখন তারা OP_1 দাম পাচ্ছিল, কিন্তু তাদের প্রান্তিক ব্যয় রেখা বা যোগান রেখা হল S_0S_0। অর্থাৎ ঐ যোগান রেখার উপরে বাকি অংশ হল তার উদ্বৃত্ত মুনাফা।

$\therefore$ ক্রেতার উদ্বৃত্ত = ΔDP_1E_1

উৎপাদকের উদ্বৃত্ত = $\Delta S_0P_1E_1$

উভয়পক্ষের মোট উদ্বৃত্ত = ΔS_0DE_1

এবার উৎপাদন শুল্ক আরোপের পর নতুন দাম ও পরিমাণ হল যথাক্রমে OP_2 ও OQ_2। এবার দাম নির্ধারিত হবে নতুন যোগান রেখা S_1S_1 থেকে কারণ বাজারে ঐ দামটিই ক্রেতাকে দিতে হবে। কিন্তু বিক্রেতা কর দেবার পর যে দাম পাবে, তা পাওয়া যাবে S_0S_0 রেখা থেকে। এখন ভোক্তার উদ্বৃত্ত ΔP_1E_1D এই ত্রিভুজ থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ΔP_2DE_2। অন্যদিকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ছিল উৎপাদন শুল্ক আরোপের পর ভারসাম্য দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন কমে হয়েছে OQ_2। ফলে বিক্রেতার উদ্বৃত্ত মুনাফা নেমে এসেছে ΔS_0BM ত্রিভুজে। পূর্বে ক্রেতা ও উৎপাদক দুজনের মোট উদ্বৃত্ত ছিল ΔS_0DE_1। এখন উল্লম্ব দূরত্ব হল করের পরিমাণ। এখন নতুন ভোগ উদ্বৃত্ত, নতুন ক্রেতার উদ্বৃত্ত এবং কর রাজস্বের পরিমাণ যোগ করে পাই $\Delta DP_2E_1 + \Delta S_0P_3M + P_2E_2MP_3$। এটি পূর্বের ΔS_0DE_1-এর তুলনায় ΔME_2E_1 কম। এই অংশটি কেউই পাচ্ছেনা—তাই এটি হল পরোক্ষ করের বাড়তি বোঝা।

যে অংশটি কেউই ব্যবহার করতে পারছে না, তাকে বলে করের বাড়তি বোঝা। এমনিতেই উৎপাদন শুল্ক আরোপ করার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কমছে এবং দাম বাড়ছে। ফলে সমাজ কম পরিমাণে উৎপাদন ও ভোগ করছে। যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন কমছে, সরকার সেই অংশটির উপর কোনো কর আরোপ করতে পারে না।

ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার উদ্বৃত্ত যতটা কমলো, সেটুকু সরকারও রাজস্ব হিসাবে ভোগ করতে পারলো না। সেজন্যই এই অংশটিকে পরোক্ষ করের বাড়তি বোঝা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অনুশীলনী—১

১। ভোক্তার আর ক্রেতার উদ্বৃত্ত কীভাবে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন?

২। বিক্রয়করের বাড়তি বোঝা বলতে কী বিষয়কে বোঝাবেন? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।

৪.৬ করভার ও করচালন

কর আরোপ করার ফলে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে করের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বোঝা বহন করতে হবে, তাকেই বলে করভার। সরকারিভাবে প্রথম যার উপর কর আরোপিত হল, বা যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর করটি প্রথম আরোপিত হল, তাকে বলে করপাত। যার উপর কর আরোপিত হল, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি করটাকে যদি অন্য কোনো পক্ষের উপর স্থানান্তর করে দিতে পারে, তাহলে করের চূড়ান্ত ভার বহন করবে সেই তৃতীয় পক্ষ। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করপাত এবং করভার একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর থাকে। যেমন আয়কর যার উপর আরোপিত হয়, তাকেই দিতে হয় বলে এটি একটি প্রত্যক্ষ কর। আবার উৎপাদনশুল্ক বা বিক্রয়কর কোনো তৃতীয় পক্ষের উপর আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে চাপানো সম্ভব। এই প্রক্রিয়া সম্ভব হয় করচালনের মাধ্যমে। তবে সবসময় যে করচালন করা যায় তা নয়, তখন করপাত ও করভার উভয়ই একই পক্ষকে বহন করতে হবে।

৪.৬.১ করচালন দুরকমের হতে পারে

সম্মুখবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী করচালন। ধরা যাক উৎপাদকের উপর উৎপাদনশুলি আরোপিত হল। সে দামবৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রব্যটির করের ভার ক্রেতার উপর স্থানান্তর করতে পারলে তা হবে সম্মুখবর্তী করচালন। আবার ঐ উৎপাদকই যদি করের বোঝা উৎপাদনের উপকরণের বিক্রেতাদের উপর চাপিয়ে দেয়, অর্থাৎ কম দামে উৎপাদনের উপকরণগুলি কিনতে পারে, তবে তা পশ্চাৎবর্তী করচালনের উদাহরণ।

৪.৬.২ করভারের পরিমাপ

করারোপ এবং করচালনের ফলে দ্রব্যের উৎপাদক, উৎপাদনের উপকরণের বিক্রেতা এবং ক্রেতা সকলেরই দ্রব্য ও পরিষেবাসংক্রান্ত ক্রয়বিক্রয়ের সিদ্ধান্তে পরিবর্তন ঘটে থাকে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সমস্ত অর্থনৈতিক কাজকর্মই প্রভাবিত হয়। আবার একটি করের পরিবর্তে অন্যকর আরোপিত বলে এক পক্ষের উপর বোঝা কমে

অন্য পক্ষের উপর বাড়ে। এইজন্য রিচার্ড মাসগ্রেভ করভারের এক সরলীকৃত পরিমাপ উপস্থিত করেছেন। তিনি কোনো পরিবারের খরচযোগ্য বাস্তব আয় বলে নিম্নলিখিত সম্পর্কটি উপস্থিত করেছেন :

$$\text{খরচযোগ্য বাস্তব আয়} = \frac{\text{করপরবর্তী আর্থিক আয়}}{\text{বাজার দাম}} = \frac{\text{আয় – আয়কর}}{\text{উৎপাদনমূল্য + বিক্রয়কর}}$$

এখানে করপ্রদানের পর যে আর্থিক আয় থাকছে, তাকে বাজার দাম দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাচ্ছে করপরবর্তী বাস্তব আয়। সেই আয়কে খরচযোগ্য বাস্তব আয় বলা হচ্ছে। অন্য দিকে করপরবর্তী আর্থিক আয় পাওয়া যাবে আয় থেকে আয়করকে বাদ দিলে। বাজার দাম পাওয়া যাবে উৎপাদনমূল্যের সঙ্গে বিক্রয়করকে যোগ দিলে।

ফলে এই সম্পর্কটির মাধ্যমে একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, দুইরকম করের প্রভাবকেই পরিমাপ করা যাবে। এখানে আয়কর হল প্রত্যক্ষকর এবং বিক্রয়কর পরোক্ষকর। এই সূত্রের মাধ্যমে এককভাবে আয়কর বা বিক্রয়কর পরিবর্তিত হলে তার শতকরা প্রভাব পরিমাপ করা যাবে। আবার একটি করের পরিবর্তে অন্য কর আরোপিত হলে তার শতকরা পরিবর্তনের প্রভাবও পরিমাপ করা যাবে।

৪.৬.৩ করচালন নির্ধারণকারী প্রধান বিষয়সমূহ :

কতটা করচালন করা যাবে বা আদৌ যাবে কিনা, তা নীচের বিষয়গুলির উপর নির্ভর করবে :

(১) **চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা :** কর আরোপ করা হলে দ্রব্যের দাম কতটা বাড়বে তার উপর করপাত ও করচালন নির্ভর করে। দ্রব্যের দাম বাড়া আবার নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। স্থিতিস্থাপকতা বেশি হলে বেশি করচালন করা যায় না।

(২) **বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতি :** বিকল্প দ্রব্য বাজারে থাকলে কর আরোপের পর ক্রেতারা সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির ক্রয় কমিয়ে দিয়ে বিকল্প দ্রব্যটি কিনতে পারে। সেক্ষেত্রে বিক্রেতা করের বোঝা ক্রেতার উপর স্থানান্তর না করে নিজেই বহন করবে।

(৩) **উৎপাদন ব্যয়, বাজারের প্রকৃতি, স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালীন প্রভাবের কথা ভাবা হচ্ছে :** ইত্যাদি প্রশ্নের উপরেও করপাত, করচালন ও করভার নির্ভর করে।

অনুশীলনী

১। করপাত ও করভারের পার্থক্য নির্ণয় করুন। উপযুক্ত উদাহরণ দিন।

২। করভারকে কীভাবে পরিমাপ করা যায়?

৩। করচালন কী? তা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৪.৭ সারাংশ

অতএব পরোক্ষকরের ক্ষেত্রে যার উপর করের বোঝা আরোপ করা হয়, তিনি নিজে তা না বহন করে, অন্যের উপর স্থানান্তরিত করতে পারেন। বিক্রয় কর হল পরোক্ষকরের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে, কতটা কর বিক্রয়কারী ক্রেতাদের উপর স্থানান্তরিত করতে পারবেন তা নির্ভর করে যোগান রেখার স্থিতিস্থাপকতার উপর। যোগানরেখা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হবে, করভারে ক্রেতার অংশ তত বৃদ্ধি পাবে। পরোক্ষ কর আরোপের ফলে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই ভোগ উদ্বৃত্ত হ্রাস পায়, কিন্তু সরকারের রাজস্ব সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়না। যার ফলে পরোক্ষ করের কিছু বাড়তি বোঝা অর্থনীতিকে বহন করতে হয়। অবশেষে আমরা আলোচনা করলাম করভার এবং করপাতের পার্থক্য নিয়ে। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে, করভার এবং করপাত একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর থাকে, কিন্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ঐ করভার এবং করপাত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উপর বর্তায়।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Richard A. Musgrave & Peggy B Musgrav : Public Finance in Theory and Practice (5th edition) McGraw Hill USA, 1989. PP 239-241; 250-266; 279-294.

(২) Richard A. Musgrave : The Theory of Public Finance; McGraw Hill, Tokyo,1961. pp 205-231; 287-295.

(৩) Subrata Ganguly : Public Finance–A Normative Approach Nababharat Publishers, Calcutta. pp 153-163; 170-172.

দ্বিতীয় পর্যায় : সরকারি আয়-ব্যয় (Principles of Public Finance)

এই পর্যায়ে তিনটি এককের মাধ্যমে সরকারি আয়-ব্যয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকের আলোচনা করা হয়েছে। সরকার তার প্রশাসনিক কাজকর্ম মেটাবার জন্যে বা দেশের স্বার্থে কিছু নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেবার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এই অর্থ সাধারণত সংগ্রহ করা হয় নানা রকমের কর বসিয়ে (যেমন আয় কর, বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক ইত্যাদি) অথবা কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে (যেমন সরকারি স্থাবর সম্পত্তির আয় থেকে অথবা সরকারি ব্যবসায়ের লাভ থেকে) যদি আয়-ব্যয়ের সমতা না থাকে তাহলে সরকারের বাজেটে হয় উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি দেখা দেবে। এই বাজেট মারফত আগের বছর কী ধরনের আয় ও ব্যয় করা হয়েছে এবং পরের বছরে সরকার কী ধরনের ব্যয় করতে চান এবং এই ব্যয় মেটাবার জন্যে কীভাবে আয় করার কথা ভাবছেন তার বিস্তারিত বিবরণও জানা যায়। সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া দরকার। যদি সরকারের বাজেটে ঘাটতি থাকে তাহলে সরকার এই ঘাটতি মেটাবার জন্যে দেশের অভ্যন্তর থেকে বা বিদেশ থেকে ঋণ সংগ্রহ করেন।

দেশের অর্থনীতির পক্ষে এই বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বাজেট থেকে সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত নীতিগুলি জানা যায়; শুধু তাই নয়, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কী রকম এবং ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতি কী রূপ নিতে পারে তাও জানতে পারা যায়। তাছাড়া আধুনিক কালে সরকার যখন বাজেট মারফত তার আয়-ব্যয় নীতি স্থির করেন তখন সরকারের সামনে কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে।

প্রথম এককে বর্ণনা করা হয়েছে রাজস্ব নীতি বা ফিসকাল নীতি বলতে কী বোঝানো হয় এবং কী উদ্দেশ্যে এই নীতি ব্যবহার করা হয়। এখানে দেখানো হয়েছে রাজস্ব নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনের হাত থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করা। সরকার তার আয় ও ব্যয়কে পরিবর্তন করে কীভাবে এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারেন তাও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতির ভূমিকার কথাও এখানে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় এককের আলোচ্য বিষয় হলো সরকারি ঋণ। সরকার যখন ঋণ গ্রহণ করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঋণের ওপর নিয়মিত সুদ দেবার এবং মেয়াদ অন্তে আসলটি ফেরত দেবার দায়ত্বটিও কাঁধে তুলে নেন। এই ঋণের বোঝা কীভাবে বহন করা হয়, কতটা ঋণভার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর তুলে দেওয়া যায়, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের গুণগত পার্থক্য কী, ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গ সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে শাসন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যেমন একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা বিভাজন নীতি থাকে, তেমনি সরকারি আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এই ধরনের কিছু নীতি থাকা প্রয়োজন। তৃতীয় এককে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় নীতি বা রাজস্ব নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ১ ❐ রাজস্ব নীতি—উদ্দেশ্য, বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধী রাজস্ব নীতি, আর্থিক উন্নয়নের জন্যে রাজস্ব নীতি

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ রাজস্ব নীতির অর্থ

১.২.১ রাজস্ব নীতির লক্ষ্য

১.২.২ রাজস্ব নীতি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়

১.৩ বাণিজ্য চক্র বিরোধী রাজস্ব নীতি

১.৩.১ স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক রাজস্ব নীতি **(Built-in** বা **Automatic Stabiliser)**

১.৩.২ বিবেচনামূলক রাজস্ব নীতি **(Discretionary Fiscal Policy)**

১.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজস্ব নীতি

১.৫ রাজস্ব নীতির মূল্যায়ন

১.৬ সারাংশ

১.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

১.৮ উত্তরমালা

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককের পাঠ শেষ হলে আপনারা জানতে পারবেন—

- ফিসকাল নীতি বা রাজস্ব নীতি বলতে কী বোঝায়।
- এই নীতি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়।
- কী উদ্দেশ্যে রাজস্ব নীতি ব্যবহার করা হয়।
- এই নীতি প্রয়োগ করে কীভাবে বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনের হাত থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করা যায়।
- যে সব দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে চেষ্টা করছে সেখানে রাজস্ব নীতি কীভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১.১ প্রস্তাবনা

একটা সময় ছিল যখন মনে করা হতো যে দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সরকারে কোনও ভূমিকা নেই—সরকার কেবল দেখবেন দেশের আইন-শৃঙ্খলা ঠিক মতো আছে কিনা, দেশের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, ইত্যাদি। কিন্তু দেশে কী ধরনের দ্রব্যসামগ্রী হবে, কাদের জন্য হবে, সেগুলি কী দামে কেনা-বেচা হবে বা মোট উৎপাদন কীভাবে বণ্টিত হবে—দেশের অর্থনীতি সংক্রান্ত এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মীমাংসা সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্ভব হবে। অর্থশাস্ত্রের জনক নামে অভিহিত অ্যাডাম স্মিথের মতে, যদি বাজারে চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলি ঠিক মতো কাজ করতে পারে তাহলে সঠিক জিনিষ অর্থাৎ যে সব দ্রব্য সামগ্রী লোকে ব্যবহার করতে চায়, সেগুলি সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপন্ন হয়ে সঠিক দামে কেনা-বেচা হবে, সম্পদের কোনও অপচয় ঘটবে না এবং দেশে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা থাকবে। এখানে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই।

কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গেল যে, সরকারের কার্যাবলী অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল যে রাষ্ট্রচালনার পরিধিই বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সরকারের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটা কারণ হল অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান সবসময় বাজারের মারফত হয় না। অনেক দ্রব্যসামগ্রী যেগুলি সামাজিক প্রয়োজন মেটায়—যেমন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, স্কুল-কলেজ স্থাপন বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা—সেগুলির উৎপাদন বাজার থাকা সত্ত্বেও, হচ্ছে না; কেবল তাই নয়, সম্পদের অপচয় হচ্ছে, শ্রমিক বেকার থেকে যাচ্ছে, জিনিষপত্রের দাম খুব বেশি ওঠানামা করছে। সেইজন্যে বর্তমানে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অন্তত এক-তৃতীয়াংশের দায়িত্বে আছে সরকার। এখন সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হয় জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সামাজিক দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হচ্ছে কিনা, দেশের মধ্যে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আছে কিনা, সাধারণ মূল্যস্তর খুব বেশি ওঠা-নামা করছে কিনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক মতো চলছে কিনা। তাছাড়া আয়বণ্টনকে মোটমুটি কাম্য স্তরে রাখাও সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

বাজারের ব্যর্থতা ছাড়াও আরো দু'টি কারণে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমত ১৯৩০ সালে যখন পৃথিবীব্যাপী মন্দা অবস্থা (Depression) দেখা দিয়েছিল—বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, তখন দেখা গেল সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া ঐ মন্দা অবস্থা দূর করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যখন ভারত সহ আরো অনেক সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ গ্রহণ করল, তখন সরকারি কার্যাবলীর গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেল। ফলে সরকারের রাজস্ব নীতির প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সরকার তার বিভিন্ন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্যে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্যে তাঁর রাজস্ব নীতির প্রয়োগ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যে সব লক্ষ্য পূরণের জন্যে রাজস্ব নীতি ব্যবহার করা হয়, তার অনেকগুলিই সরকার অন্যান্য নীতির সাহায্যে করতে পারেন। যেমন মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রাখার জন্যে সরকার কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্ক মারফত আর্থিক নীতির সাহায্য নিতে পারেন, বা চরম ক্ষেত্রে মজুরি নীতি বা মূল্যনীতির প্রয়োগ করতে পারেন। তবে ১৯৩০ সালের মন্দা অবস্থা কাটানোর ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতির অভাবনীয় সাফল্য এসেছিল। সেইজন্যে ১৯৬০/৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নত দেশে রাজস্ব নীতির বেশি প্রয়োগ হতো। পরবর্তী কালে রাজস্ব নীতির বিভিন্ন লক্ষ্য পূরণের কার্যকারিতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রীডম্যানের (Milton Friedman) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এ ব্যাপারে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি এবং রাজস্ব নীতির এখনও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা আছে।

১.২ রাজস্ব নীতির অর্থ

ফিসকাল নীতি বা রাজস্ব নীতির অর্থ হল সরকারের রাজকোষ সংক্রান্ত নীতি অর্থাৎ সরকারের আয়-ব্যয় ও ঋণসংক্রান্ত নীতি।

যে কোনও সরকারকেই শাসনকার্য চালনা করবার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং এর জন্যে অর্থের সংস্থান করতে হয়। যদি দেশের অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে সরকারের যথেষ্ট আয় না হয় তাহলে সরকারকে ঋণ নিতে হয়। কীভাবে সরকার আয় করেন এবং কীভাবে সরকার ব্যয় করেন এবং সরকারের ঋণ গ্রহণের তাৎপর্য কী—এইগুলিই হল রাজস্ব নীতির বিষয়বস্তু।

সুতরাং রাজস্ব নীতির অর্থ বুঝতে গেলে সরকারি আয়, সরকারি ব্যয় এবং সরকারি ঋণের প্রকৃতি জানা দরকার।

(ক) সরকারি আয়

সরকারি আয় বা রাজস্বের উৎসগুলিকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়—কর রাজস্ব এবং কর বাদে অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত রাজস্ব।

কর আবার দু'রকমের, প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর। আয় কর, দান কর, সম্পত্তি কর ইত্যাদি হল প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ। এই কর সাধারণত যাঁর ওপর ধার্য করা হয় তাঁকেই করের ভারটিও বহন করতে হয়, অর্থাৎ পুরো করটাই দিতে হয়। আর পরোক্ষ করের উদাহরণ হল বিক্রয় কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি। এই করগুলি যাঁদের ওপর ধার্য করা হয় তারা করের ভার কিছুটা অন্য কারোর ঘাড়ে সরিয়ে দিতে পারে। যেমন একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে বিক্রয় কর বসানো হয় তার বোঝা কিছুটা হয়তো ক্রেতা আর কিছুটা হয়তো বিক্রেতা নিজেই বহন করতে পারেন।

কর ছাড়া অন্যান্য যে সব সূত্র থেকে সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারেন সেগুলি হল সরকার দ্বারা পরিচালিত কারবার থেকে আয়, জরিমানা, লাইসেন্স ফি, রেজিস্ট্রী ফি, সরকারি জমিজমা সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে পাওয়া অনুদানও সরকারি আয়ের অন্যতম সূত্র। যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুদান পেয়ে থাকেন।

(খ) সরকারি ব্যয়

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার বা বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন ধরনের শাসনকার্য বা জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্যে যে ব্যয় করেন তাকেই বলা হয় সরকারি ব্যয়।

সরকারকে সরকারি কর্মচারীদের মাহিনা, অবসর ভাতা ইত্যাদির জন্যে এবং শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে নিয়মিত কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই ধরনের ব্যয়কে চলতি খাতে ব্যয় (Current Expenditure) বলা যেতে পারে। এছাড়া রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিল্প স্থাপন, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সম্পদ সৃষ্টি করার জন্যেও কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই ধরনের ব্যয়কে মূলধনী খাতে ব্যয় (Capital Expenditure) বলা হয়।

আধুনিক কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে, প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির জন্যে, মূল্যস্তরের বৃদ্ধির জন্যে বা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক কাজের তাগিদে সরকারি ব্যয় খুব বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) সরকারি ঋণ

সরকারের যদি আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হয় তাহলে সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাবে, যাকে আমরা সরকারের বাজেট বলি, তাতে ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি মেটাবার জন্যে সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এই ঋণ দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের কাছ থেকে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণপত্র বিক্রয় করে সংগ্রহ করা যেতে পারে, অথবা বিদেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে। যখন আমরা পোস্ট অফিস থেকে জাতীয় সঞ্চয় পত্র (National Saving Certificate) ক্রয় করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা সরকারকে ঋণ দিই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সরকার যখন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেন, তখন দেশে মোট চালু অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়।

রাজস্ব নীতির এই তিন হাতিয়ারকেই সরকার প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেন। সরকারের আয়-নীতি, ব্যয়-নীতি বা ঋণ-নীতির যে কোনও একটির বা একসঙ্গে সব কটির পরিবর্তন হলে দেশের অর্থনীতির উপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

সরকার কী ধরনের পরিবর্তন আনবেন অর্থাৎ রাজস্ব নীতি ঠিক কি রূপ নেবে তা নির্ভর করছে সরকার কী উদ্দেশ্যে এই নীতি ব্যবহার করতে চাইছেন। সুতরাং দেখতে হবে রাজস্ব নীতি কী কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১.২.১ রাজস্ব নীতির লক্ষ্য

যে কোনও সরকারের রাজস্ব নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে চালনা করা, অর্থাৎ সরকার এমনভাবে কর রাজস্ব সংগ্রহ করবেন এবং এমন এমন ক্ষেত্রে ব্যয় করবেন যাতে দেশবাসী কোন স্বল্পকালীন ভিত্তিতে নয় দীর্ঘকালীন ভিত্তিতেও উপকৃত হন। তবে সাধারণভাবে রাজস্ব নীতি কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্যে ব্যবহার করা হয়।

প্রথমত, সরকার তার আয় এবং ব্যয়কে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন যাতে বেসরকারি দ্রব্যসামগ্রীর (Private Goods) উৎপাদনে এবং সামাজিক বা গণভোগ্য (Public Goods) দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে দেশের সম্পদের কাম্য বিভাজন হয়। বেসরকারি দ্রব্যসামগ্রী বলতে সেইসব দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝানো হয় যেগুলি সম্বন্ধে ক্রেতাদের পছন্দ অর্থাৎ তাঁরা কী দামে কত কিনবেন, তা জানা যায়, যেমন চাল, ডাল, কাপড়, বাড়ি ইত্যাদি। আর এইসব দ্রব্যসামগ্রীর যোগানেরও কোন অসুবিধে নেই কারণ এগুলি যাঁরা সরবরাহ করবেন তাঁরা জানেন এগুলি থেকে মুনাফা করা যাবে। সুতরাং যদি বাজারে চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলি ঠিক মতো কাজ করে তাহলে এদের উৎপাদন সবসময় কাম্য স্তরে থাকবে। কিন্তু গণভোগ্য দ্রব্যগুলির বৈশিষ্ট্য হল এগুলি সবাই একসঙ্গে ভোগ করতে পারেন এবং একজনের ভোগ অন্যজনের ভোগকে সঙ্কুচিত করে না। যেমন পার্ক, রাস্তাঘাট, প্রতিরক্ষা এইসব পরিষেবার সুবিধে সবাই পেতে পারেন এবং একজনের ভোগ মোট পরিষেবাতে কোনও প্রভাব ফেলে না। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামান্য মূল্য দিয়ে এইসব পরিষেবা সরবরাহ করা হয়। যেমন, ব্রীজ পার হওয়ার সময় পথকর (Toll Tax) চাওয়া হতে পারে। কিন্তু কোনও ভোগক্রেতাই এইসব দ্রব্যের জন্যে কতটা মূল্য দিতে রাজী আছেন তা প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ এই ধরনের দ্রব্যের জন্য ভোগক্রেতারা তাঁদের পছন্দ প্রকাশ করেন না। সুতরাং এঁদের চাহিদাও অজানা থেকে যায় এবং বাজার মারফত উৎপাদন বা মূল্য নির্ধারিত হয় না। সুতরাং দেশের কতটা সম্পদ এগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত হবে এবং এই উৎপাদন ব্যয় মেটাবার জন্য ভোগক্রেতাকে কতটা কর দিতে হবে তা সরকারকেই ঠিক করতে হয়। তার রাজস্ব নীতি দ্বারা।

দ্বিতীয়ত, রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য হল দেশের মধ্যে শ্রমিকের নিয়োগকে পূর্ণ নিয়োগের স্তরে না হলেও এমন একটি স্তরে রাখা, যাতে সব কর্মক্ষম ও প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কোনও না কোনও কাজে নিযুক্ত থাকেন। যেমন আমরা দেখব যদি কখনও দেশে মন্দাভাব দেখা দেয় এবং বহু শ্রমিক বেকার বসে থাকেন তখন সরকার তার ব্যয় বাড়িয়ে নতুন কর্ম সৃষ্টি করতে পারেন।

তৃতীয়ত, সরকারের অনত্যম কর্তব্য হল দেশের মূলস্তরে যেন খুব বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি না হয় অর্থাৎ দেশে একটি স্থিতিশীল মূল্যস্তর থাকে সেদিকে নজর রাখা। রাজস্ব নীতির প্রয়োগের দ্বারা এই উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়। যেমন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য যদি খুব বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকে, অর্থাৎ দেশে যদি মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাহলে সরকার করের হার বৃদ্ধি করে বা সরকারি ব্যয় হ্রাস করে কার্যকরী চাহিদা হ্রাস করার চেষ্টা করেন।

চতুর্থত, রাজস্ব নীতির সাহায্যে দেশের উন্নয়নের হারকে একটি আশানুরূপ স্তরে রক্ষা করা হয় এবং লক্ষ্য রাখা হয় এই উন্নয়নের হার দেশের বাণিজ্য বা লেনদেনের উদ্বৃত্তকে অনুকূলভাবে প্রভাবিত করছে কি না।

পঞ্চমত, দেশের অর্থনীতি যখন বাণিজ্য চক্রের ওঠানামার ভেতর দিয়ে যায়, তখনই দেশের মূল্যস্তর, নিয়োগ বা মোট জাতীয় উৎপাদনের হারে উল্লেখযোগ্য ওঠানামা হয়। এগুলির থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করার

জন্যে রাজস্ব নীতিকে একটি বাণিজ্য চক্রবিরোধী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। (পরবর্তী অংশে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।)

ষষ্ঠত, গত পঞ্চাশ বছর ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের আর্থিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্যে রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করছে। (পরে এটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)।

সবশেষে, প্রত্যেক দেশই চায় দেশের মধ্যে আয়বণ্টন একটি কাম্য স্তরে থাকুক। এই কাম্য স্তর বা ন্যায্য স্তর কী হবে অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয় সম্পদের বণ্টনে কী ধরনের পার্থক্য থাকবে—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন রাষ্ট্রনেতারা—অর্থনীতিবিদরা নন। কিন্তু একবার কাম্যস্তরটি জানা থাকলে সরকার তার রাজস্ব নীতিকে ব্যবহার করে অর্থাৎ করের পরিবর্তন বা ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি করে দেশের আয়বণ্টনকে সেই স্তরে নিয়ে আসতে পারে।

আধুনিককালে রাজস্ব নীতির এই বিবিধ লক্ষ্যের মধ্যে দু'টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে : একটি হল বাণিজ্য চক্রের হাত থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করার লক্ষ্য, অপরটি হল উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্য।

১.২.২ রাজস্ব নীতি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়

সাধারণত রাজস্ব নীতি প্রয়োগের মাধ্যম হল সরকারি বাজেট। প্রতিটি আর্থিক বছরের শুরুতে সরকার সেই বছরে কী কী ব্যয় করতে চান এবং সেই ব্যয় মেটাবার জন্যে কীভাবে আয় করতে পারেন তার একটি সম্ভাব্য হিসেব দেশবাসীর কাছে পেশ করেন। একেই বলা হয় বাজেট। এই বাজেটে শুধু বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের হিসেবই থাকে না বিগত বছরে বিভিন্ন খাতে কতটা ব্যয় হয়েছে এবং কতটা আয় হয়েছে এবং আয়-ব্যয়ের কতটা ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত আছে তারও বিস্তারিত বিবরণ থাকে।

আগে মনে করা হত সরকারের বাজেট যত ছোট হবে ততই ভাল অর্থাৎ সরকারের বেশি অর্থনৈতিক কার্যাবলীর কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, আরো মনে করা হত বাজেটে সবসময় আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকা দরকার। পরবর্তী কালে সরকারের কার্যাবলীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজেটের আয়তনও বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং বাজেটে ঘাটতি দেখা দিতে আরম্ভ করল। এখন সরকার আগে দেখেন আগের অংশে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্যে তাঁর কতটা ব্যয় করার প্রয়োজন; তারপর সেই ব্যয় মেটাবার জন্যে অর্থসংস্থানের কথা চিন্তা করেন। এর ফলে বাজেটে ঘাটতি থাকাটা এখন অনেক দেশেই স্বাভাবিক ব্যাপার।

বাজেটে যে হিসেব দেওয়া হয় তার দুটি অংশ থাকে—চলতি খাত (Current Account) ও মূলধনী খাত (Capital Account)। যে সমস্ত আয় সরকারের দায় বাড়ায় (যেমন, সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ) তা মূলধনী খাতের এবং যেগুলি দায় বাড়ায় না (যেমন, কর রাজস্ব) সেগুলি চলতি খাতের অন্তর্গত। আর যে সমস্ত ব্যয় সরকারের দায় কমায় (যেমন, দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের ব্যয়) তা মূলধনী খাতের অন্তর্গত। আর যে সমস্ত ব্যয় সরকারের দায় কমায় (যেমন, দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের ব্যয়) তা মূলধনী খাতের এবং যেগুলি দায় কমায় না (যেমন, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয়) সেগুলি চলতি খাতের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থনীতিবিদ Musgrave-এর মতে বাজেটের তিনটি শাখা থাকে। এগুলি হল (ক) বিভাজন শাখা (Allocation Branch), (খ) স্থিতিকরণ শাখা (Stabilisation Branch) এবং (গ) বণ্টন শাখা (Distribution Branch)। আগের অংশে আলোচিত রাজস্ব নীতির লক্ষ্যগুলির প্রথম লক্ষ্যটি পূরণের দায়িত্ব হল বিভাজন বাজেটের (নিয়োজন) শাখার। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম লক্ষ্যটি পূরণের ভার থাকে বাজেটের স্থিতিকরণ শাখার। বাজেটের বণ্টন শাখার সাহায্যে রাজস্ব নীতির সর্বশেষ লক্ষ্যটি পূরণ করার চেষ্টা হয়। আর ষষ্ঠ লক্ষ্যটি অর্থাৎ উন্নয়নশীন দেশে উন্নয়নের সব কটি শাখাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অনুশীলনী—১

১। সঠিক বাক্যটিতে (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) সরকারি কর্মচারীদের মূলধনী খাতে ব্যয়ের অন্তর্গত। (সঠিক/ ভুল)

(খ) সম্পত্তির উপর করকে প্রত্যক্ষ কর বলা যেতে পারে। (সঠিক/ভুল)

(গ) গণভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন ও মূল্য বাজারের চাহিদা নির্ধারণে ও যোগান শক্তি কার্যকর হয় না। (সঠিক/ভুল)

(ঘ) সরকারি বাজেটে ঘাটতি থাকা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। (সঠিক/ভুল)

২। রাজস্ব নীতির লক্ষ্যগুলি দশটি বাক্যে বর্ণনা করুন।

৩। রাজস্ব নীতি কীভাবে প্রয়োগ করা হয়? (১০০টি শব্দের মধ্যে লিখুন)

১.৩ বাণিজ্য চক্র বিরোধী রাজস্ব নীতি

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, কয়েক বছর অন্তর অন্তর দেশের অর্থনীতিতে পর্যায়ক্রমে চারটি অর্থনৈতিক অবস্থা বা দশা দেখা যায়—সমৃদ্ধি (Boom), অবনতি (Recession), মন্দা (Depression) ও পুনরুন্নতি (Recovery)। কখনও দেখা যায় সামগ্রিক ব্যবসায়িক কাজকর্মের প্রসার ঘটছে—বিনিয়োগ, মূল্যস্তর, মুনাফার হার, শ্রমিকের নিয়োগ প্রভৃতিতে ঊর্ধ্বগতি শুরু হয়েছে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অর্থনীতি ক্রমশ সমৃদ্ধির একটি ঊর্ধ্বসীমা স্পর্শ করেছে। এই অবস্থায় শ্রমিকের নিয়োগ প্রায় পূর্ণ নিয়োগ স্তরে পৌঁছে গেছে এবং দেশের মোট উৎপাদনও আর বৃদ্ধি না হবার দিকে, সুতরাং মূল্যস্তরও বৃদ্ধির দিকে। ঊর্ধ্বগতির এই শীর্ষবিন্দুতে কিছুদিন থাকার পর অর্থনীতিতে শুরু হয়ে যায় অবনতি—ব্যবসায়ীদের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার জায়গায় দেখা যায় হতাশা, বিনিয়োগ, মুনাফা, জাতীয় আয়, সবই হ্রাস পেতে থাকে, শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়, মূল্যস্তরও হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে অর্থনীতিতে একটি সামগ্রিক মন্দা অবস্থার সৃষ্টি হয়—কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, নতুন বিনিয়োগ করতে কেউ উৎসাহ পান না। মন্দা অবস্থায় নিম্নবিন্দুতে কিছুদিন অবস্থানের পর আবার অর্থনীতিতে শুরু হয় পুনরুন্নতি—বিনিয়োগ, শ্রমিকের নিয়োগ, মুনাফার হার, মূল্যস্তর, সবই আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার আর একটি সমৃদ্ধির দিকে অর্থনীতির যাত্রা শুরু হয়। সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাজকর্মের সংকোচন ও প্রসারণ—মন্দাভাব ও তেজীভাব—

যা একটির পর একটি এইভাবে চক্রাকারে কিছুদিন পর পর (চক্রাকারে) ঘুরে ফিরে আসে তাকেই বলা হয় বাণিজ্য চক্র (Business Cycle)। সমৃদ্ধির এক শীর্ষবিন্দু থেকে আর এক শীর্ষবিন্দুতে বা মন্দা অবস্থার এক নিম্নবিন্দু থেকে পরবর্তী মন্দা অবস্থার নিম্নবিন্দুতে আসতে যে সময় লাগে তা থেকে বাণিজ্য চক্রের দৈর্ঘ্য জানা যায়। কিন্তু সব বাণিজ্য চক্রের দৈর্ঘ্য সমান হয় না।

বাণিজ্য চক্রের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে একাধিক তত্ত্ব আছে কিন্তু অর্থনৈতিক গর্যাবলীর এই উত্থান-পতন দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা আনে, তা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। ব্যবসা - বাণিজ্য অনিশ্চয়তা থাকলে, বিনিয়োগেও অনিশ্চয়তা আসবে এবং জাতীয় আয়ের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির হার সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। সুতরাং যে কোনও সরকারই বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনের প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্যে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেন।

আমরা আগেই বলেছি যে গত শতাব্দীর তিনের দশকে বিশ্বব্যাপী যে মন্দা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা রোধ করা সম্ভব হয়েছিল, কেইন্‌সীয় অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত রাজস্ব নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারা। কেইন্‌সের আয় ও নিয়োগতত্ত্ব নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দেশে বেকারত্ব বা অপূর্ণ নিয়োগ স্তরে ভারসাম্য দেখা যায় প্রধানত কার্যকরী চাহিদার অভাবের জন্যে। অর্থনীতিতে মন্দা অবস্থায় লোকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বা একদম থাকে না। ফলে সামগ্রিক কার্যকরী চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, জিনিষপত্র অবিক্রীত পড়ে থাকে, ফলে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগও হ্রাস করে। এই অবস্থা থেকে অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে গেলে কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার জন্যে লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এটি সম্ভব হবে যখন সরকার সম্প্রসারণমূলক নিয়োগ সৃষ্টিকারী কর্মসূচী গ্রহণ করবেন এবং করের হার হ্রাস করবেন।

আবার কখনো কখনো অর্থনীতিতে অস্বাভাবিক রকম তেজীভাব দেখা যায়—দেশে খুব দ্রুত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় কিন্তু সে বৃদ্ধি হয় অনেকটা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি ভিত্তিহীন আশাব্যঞ্জক ধারণা অনুযায়ী। তাছাড়া মূল্যস্তর খুব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকের নিয়োগ পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছাবার উপক্রম করে। অর্থনীতির এই অস্বাভাবিক সম্প্রসারণ রোধ করার জন্যে সরকারের উচিত ব্যয় সঙ্কুচিত করা এবং করের হারকে বৃদ্ধি করা।

কীভাবে সরকারি ব্যয় ও কর রাজস্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাণিজ্য চক্রের প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করা যায় তা আলোচনা করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে পরিপূরক বা বাণিজ্য চক্রবিরোধী। রাজস্ব নীতি দু'রকমের হতে পারে। স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক রাজস্ব নীতি এবং স্ববিবেচনামূলক রাজস্ব নীতি।

১.৩.১ স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক রাজস্ব নীতি

সরকারের বাণিজ্য চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতির প্রধান দুটি হাতিয়ার হল সরকারি ব্যয় এবং সরকারি কর। এইগুলিরই পরিবর্তন করে বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনের প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করা হয়।

সরকারের রাজস্ব নীতি যদি এমন হয় যে সরকারের ব্যয় বা কর সংগ্রহের পরিমাণ বাইরের কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, বাণিজ্য চক্রজনিত অর্থনীতির উত্থান বা পতনের বিরুদ্ধে আপনা আপনি কিছু বিরোধী শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে তাহলে সেই রাজস্ব নীতিকে স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক রাজস্ব নীতি বলা হয়। এই ধরনের সরকারি ব্যয় বা কর রাজস্ব নীতিকে অন্তর্জাত (endogenous) বলা যেতে পারে। এরা নিজেরা অর্থনীতিতে কোনও পরিবর্তনের সূত্রপাত করে না কিন্তু রাজস্ব নীতিতে এদের অন্তর্ভুক্তির ফলে, অর্থনীতিতে কোনও পরিবর্তন হলে এরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অর্থনীতিতে এদের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব পড়ে।

আধুনিককালে সরকারের রাজস্ব কাঠামোয় দু'ধরনের স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। একটি হল আয়কর আর একটি হল হস্তান্তর পাওয়া (Transfer Payment)।

ধরা যাক অর্থনীতি বাণিজ্য চক্রের তেজী অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। শ্রমিকের নিয়োগ পূর্ণ-নিয়োগের স্তরে এসে গেছে, লোকের চাহিদা মতো দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়তো আর সম্ভব হবে না এবং মূল্যস্তরও বৃদ্ধির দিকে। এই অবস্থায় স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক উপাদানগুলি বাইরের কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় সংকোচন আনতে পারবে।

দেশে যদি ব্যক্তির ওপর এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর প্রগতিশীল হারে আয়কর ধার্য করা থাকে, তাহলে যে হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে আয়কর রাজস্বের সংগ্রহের পরিমাণ তার থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে তেজী অবস্থায় যখন আয় এবং লোকের ক্রয়ক্ষমতাও দ্রুত বৃদ্ধি পায় তখন আয়কর বাবদ সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ তার থেকে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে বেসরকারি ক্ষেত্রের নীট ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পায় এবং চাহিদারও প্রয়োজনীয় সংকোচন হয়। ফলে অর্থনীতিতে প্রত্যাশিতভাবে তেজীভাব হ্রাস পেতে থাকে।

আবার দেশের অর্থনীতিতে যদি মন্দাভাব চলে, আয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি হ্রাস পেতে থাকে তখন আয়কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বও হ্রাস পায় কেবল তাই নয়, যে হারে আয় হ্রাস পায় তার থেকে দ্রুত হারে কর রাজস্ব হ্রাস পায়। এর ফলে বেসরকারি ক্ষেত্রে যে ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে তার ফলে নীট চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতির মন্দা অবস্থার দিকের অধোগতি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিষ্ঠানের ওপর ধার্য করা আয়কর অপেক্ষা ব্যক্তিগত আয়কর অনেক বেশি ফলপ্রসূ। কারণ প্রতিষ্ঠানের ওপর যে আয়কর ধার্য করা হয়, তার প্রভাব সরাসরি ব্যক্তিগত আয়ের ওপর পড়ে না; তাছাড়া, রাজস্ব সংগ্রহের দিক থেকেও এটির গুরুত্ব ব্যক্তিগত আয়করের থেকে কম।

দ্বিতীয়, স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারকের মধ্যে পড়ে নানা রকমের সরকারি কল্যাণমূলক ব্যয়। অনেক দেশেই কর্মহীন শ্রমিকদের বেকার ভাতা দেবার ব্যবস্থা আছে। মন্দা অবস্থার সময়, কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দেয় বেকার ভাতা হিসাবে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে অর্থনীতিতে সামগ্রিক ক্রয়ক্ষমতা এবং চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থনীতির ওপর একটি সম্প্রসারণমূলক প্রভাব পড়ে।

আবার অর্থনীতির তেজী অবস্থায়, বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেকার ভাতা বাবদ দেয় সরকারি ব্যয়ও হ্রাস পায় এবং অর্থনীতিতে একটি সংকোচনমূলক প্রভাব পড়ে।

স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক রাজস্ব নীতি বাণিজ্য চক্রের প্রকোপ থেকে অর্থনীতিকে কিছুটা রক্ষা করলেও বাণিজ্য চক্রের গুরুত্ব বা তীব্রতা যদি খুব বেশি হয়, অর্থাৎ মন্দা অবস্থা বা তেজী অবস্থা যদি অর্থনীতিতে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাহলে এই ধরনের স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক রাজস্ব নীতি খুব একটা কার্যকর হয় না। এইগুলিকে বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনের বিরুদ্ধে প্রথম সারির আত্মরক্ষার উপায় হিসেবেই গণ্য হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধের জন্য সরকারকে বিবেচনামূলক রাজস্ব নীতি গ্রহণ করতে হয়—প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারণশীল বা সংকোচনমূলক রাজস্ব নীতি গ্রহণ করতে হয়।

১.৩.২ বিবেচনামূলক রাজস্ব নীতি

বিবেচনামূলক রাজস্ব নীতির বৈশিষ্ট্য হল, বাণিজ্য (পতনের) চক্রের উত্থান-পতনের সময় সরকার নিজের ইচ্ছামতো বাজেটে আয় ব্যয়ের পরিবর্তন করে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করে। স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক রাজস্ব নীতিতে একটি স্বয়ংক্রিয় নমনীয়তা থাকে—বাণিজ্য চক্র রোধ করার প্রয়োজনে কর ও কিছু কিছু সরকারি ব্যয়ের আপনা আপনি পরিবর্তন হয়। কিন্তু বিবেচনামূলক রাজস্ব নীতিতে যে নমনীয়তা থাকে তাকে বলা যেতে পারে সূত্রে বাঁধা নমনীয়তা অর্থাৎ সরকারকে অনেক চিন্তা ভাবনা করে বাজেটে প্রস্তাবিত কর ও ব্যয়ের পরিবর্তন করতে হয়। সেইজন্যে অনেক অর্থনীতিবিদ চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতিকে পূরণমূলক রাজস্ব নীতি (Compensatory Fiscal Policy) বলে থাকেন।

মন্দা অবস্থায় দেশের অর্থনীতি কী ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই অবস্থায় সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। লোকের হাতে টাকা থাকলে লোকের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়বে। ব্যবসায়ীরা নতুন উৎসাহে উৎপাদন করবেন, শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আসবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাবে ও মন্দাভাব কাটতে শুরু করবে।

কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্য সরকার বাজেটে বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে সরকারি ব্যয় প্রধানত দু'রকমের হয়। একটি হল নিয়োগ সৃষ্টিকারী জনকল্যাণমূলক উৎপাদনের জন্য ব্যয়, আর একটি হল হস্তান্তর ব্যয়।

প্রথম ধরনের ব্যয়ের ক্ষেত্রে মন্দার সময় সরকার চালু সরকারি প্রকল্পগুলিতে সরকারি বিনিয়োগ বা ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারেন অথবা নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে জনহিতকর দ্রব্যের উৎপাদনে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। এর ফলে নিয়োগ ও আয়, উভয়ই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন সড়ক নির্মাণ, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পতিত জমির উদ্ধার, পার্ক, জলাধার, হাসপাতাল নির্মাণের জন্যে সরকারি ব্যয় শুরু হলে সরাসরি শ্রমনিয়োগ ও আয় বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত আয়ের একটি প্রধান অংশ ভোগ ব্যয়ে ব্যবহৃত হয়, ফলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা উৎপাদন, উভয়ই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আমরা কেইন্‌সীয় আয় নিয়োগ তত্ত্ব আলোচনা করার সময় দেখেছি অন্যান্য সবকিছু স্থির থেকে যদি সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে দেশের আয়, যে পরিমাণ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে কয়েকগুণ বেশি বৃদ্ধি পাবে। প্রকৃত বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করবে কেইনসীয় আয় নিয়োগ গুণকের মানের ওপর। যেমন সাধারণ কেইন্‌সীয় মডেলে, যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $^{১}/_{২}$ হয় তাহলে সরকার যদি ১০০ টাকার ব্যয় বৃদ্ধি করেন তাহলে আয় বৃদ্ধি পাবে $১০০ \times \left(\frac{১}{১ - \frac{১}{২}} \right) = ২০০$ টাকা।

দ্বিতীয় যে ধরনের ব্যয় সরকার পরিবর্তন করতে পারে তা হল হস্তান্তর ব্যয়। সরকারকে এমন কিছু ব্যয় করতে হয় যার ফলে হয়ত দেশে কোনও স্থায়ী সম্পদের সৃষ্টি হয় না কিন্তু কিছু কিছু সামাজিক প্রয়োজন মেটে। পেনসন, বেকার ভাতা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদির জন্য ত্রাণমূলক ব্যয় ইত্যাদি হস্তান্তর ব্যয়ের উদাহরণ। এদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যয়, যেমন বেকার ভাতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মন্দা অবস্থায় বৃদ্ধি পায় কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সেইজন্যে মন্দার সময় সব ধরনের হস্তান্তর ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই ব্যয়ের ফলে যাঁরা উপকৃত হন তাদের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি থাকায়, ব্যয় বৃদ্ধি হলে, অনেকগুণ বেশি আয় বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা থাকে। (গুণকের মান উচ্চ হওয়ার জন্যে) তবে এই ধরনের সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কর্মসূচী একবার গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে মন্দা অবস্থা কেটে গেলেও, ব্যয় হ্রাস করা সরকারের পক্ষে সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে।

মন্দা অবস্থায় কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধির জন্যে সরকার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করের হার হ্রাস করতে পারেন, মাথা পিছু দেয় মোট করের পরিমাণ কমাতে পারেন অথবা কিছু কর প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। এর ফলে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির মতোই লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এবং এখানেও যে হারে কর রাজস্ব কমবে বা করের হার কমবে সামগ্রিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ সেই পরিমাণে হবে না—কতটা আয় বৃদ্ধি পাবে তা নির্ভর করবে একটি গুণকের ওপর।

সাধারণত সরকার মন্দা অবস্থা কাটাবার জন্যে (সরকার) যে সম্প্রসারণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন তার ফলে বাজেটে আয়ের থেকে ব্যয় বেশি দেখানো হয় অর্থাৎ বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি কেইন্‌সীয় আয় নিয়োগ তত্ত্বে কয়েকটি অনুমান সাপেক্ষে সরকার যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় মেটাবার জন্যে সমপরিমাণ কর-রাজস্ব সংগ্রহ করেন অর্থাৎ সরকারের বাজেটে যদি ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত কিছুই না থাকে, তাহলেও জাতীয় আয়-ব্যয় বা কর-রাজস্বের সমপরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এখানে গুণকটিকে সুষম বাজেট গুণক (Balanced Budget Multiplier) বলা হয় এবং এর মান ১-এর সমান হয়।

মন্দার সময় সরকার একই সঙ্গে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং কর হ্রাসের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। এই অবস্থায় সরকারের কাছে যে সব বিকল্প খোলা থাকে সেগুলি হল—

(ক) এককালীন দেয় করের পরিমাণ স্থির রেখে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি

(খ) আয়কর এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ করের হার স্থির রেখে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি

(গ) কর-রাজস্বের পরিমাণ স্থির রেখে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি

(ঘ) সরকারি ব্যয় স্থির রেখে কর-রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করা

(ঙ) সরকারি ব্যয় স্থির রেখে প্রত্যক্ষ করের হার হ্রাস করা

(চ) সরকারি ব্যয় স্থির রেখে এককালীন দেয় করের পরিমাণ হ্রাস করা

(ছ) সরকারি ব্যয়ের সমপরিমাণ কর-রাজস্ব বৃদ্ধি করা

(জ) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে কর-রাজস্ব হ্রাস করা

প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় কিন্তু কতটা বৃদ্ধি পায় তা নির্ভর করে গুণকের মানের উপর।

তেজী অবস্থায় সরকারের চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতির মূল উদ্দেশ্য হল মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করা এবং দেশে যে অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয় তাকে সঙ্কুচিত করা। এখানেও সরকার রাজস্ব নীতির অন্তর্জাত (endogenous) স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক উপাদানগুলির ওপর নির্ভর না করে বিচার-বিবেচনা করে রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করেন। মন্দা অবস্থায় রাজস্ব নীতি যেভাবে প্রয়োগ করা হয় এখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ সরকার তাঁর নানারকম ব্যয় হ্রাস করে বা বিভিন্নভাবে কর বৃদ্ধি করে লোকের হাতে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা কমিয়ে দেন। ক্রয়ক্ষমতা কমাবার সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক চাহিদাও সঙ্কুচিত হয় ফলে উৎপাদন ও আয় কমতে থাকে। এক্ষেত্রেও সরকার যে পরিমাণ ব্যয় হ্রাস করেন বা কররাজস্ব বৃদ্ধি করেন জাতীয় আয় তার থেকে বেশি হ্রাস পায়। কারণ কেইন্‌সীয় গুণক বৃদ্ধি এবং হ্রাস উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়।

অনুশীলনী—১

১। সঠিক বাক্যটিকে (✓) চিহ্ন দিন

(ক) সরকারের কল্যাণমূলক ব্যয় স্বয়ংক্রিয় রাজস্ব নীতির উদাহরণ। (সঠিক/ভুল)

(খ) মন্দার সময় প্রত্যক্ষ করের হার হ্রাস করা প্রয়োজন। (সঠিক/ভুল)

(গ) অর্থনীতিতে তেজী অবস্থায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন (সঠিক/ভুল)

(ঘ) কেইন্‌সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী চাহিদার অভাব মন্দা অবস্থার কারণ। (সঠিক/ভুল)

২। বাণিজ্য চক্রের অবনতির সময় অর্থনীতিতে কী কী পরিবর্তন আসে? (পাঁচটি বাক্যে লিখুন)

৩। স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক রাজস্ব নীতির সঙ্গে স্ববিবেচনামূলক রাজস্ব নীতির পার্থক্যগুলি ১০০টি শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন।

১.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজস্ব নীতি

উন্নত দেশে সরকার রাজস্ব নীতিকে ব্যবহার করেন প্রধানত অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্যে। এইসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল, যে হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই হারকে বজায় রাখা। সরকার (তার) বাজেটে করের হার বা সরকারি ব্যয়ের পরিবর্তন করে, সাধারণ মূল্যমানের স্থিরতা রক্ষা

করেন এবং লক্ষ্য রাখেন যাতে শ্রমিকের নিয়োগ মোটামুটি পূর্ণ নিয়োগ স্তরে থাকে। অর্থাৎ এইসব দেশে বাজেটের স্থিতিকরণ শাখাই (Stabilisation Branch) বেশি প্রয়োজনীয়। আধুনিককালে অবশ্য উন্নত দেশে রাজস্ব নীতিকে আরো ব্যবহার করা হয় অধিক উন্নয়নজনিত সমস্যা দূর করে দেশবাসীর জীবনযাত্রায় একটি গুণগত উন্নতি আনার জন্যে। যেমন পরিবেশ দূষণ রোধে রাজস্ব নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের সমস্যাটি একটু অন্য ধরনের। প্রথমত, এইসব দেশে মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মাথাপিছু আয় এত কম যে অধিকাংশ লোকই দারিদ্রসীমার নীচে বা কাছকাছি জীবনযাপন করেন। দ্বিতীয়ত, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, উচ্চহারে শিশুমৃত্যু, অপুষ্টি, স্বল্প আয় ইত্যাদির জন্যেও সাধারণ লোকের জীবনযাপন খুবই নিম্নমানের। তৃতীয়ত, এখানে স্বল্প উৎপাদনের জন্যে বেশ কিছু লোক বেকার বা অর্ধবেকার অবস্থায় থাকে এবং কৃষিজমি, খনিজ সম্পদের ন্যায়, অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপকরণগুলিও অব্যবহৃত পড়ে থাকে। চতুর্থত, আয় বণ্টনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায় অর্থাৎ খুব ধনী ব্যক্তি এবং খুব দরিদ্র ব্যক্তির আয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে দেশের মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে দেশের অধিকাংশ সম্পদ কেন্দ্রীভূত থাকে।

এইসব দেশে উন্নয়নের অর্থ হল—(১) দেশের সম্পদের সুষ্ঠু নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ও মাথাপিছু দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করা, (২) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যেগুলির উপর মানবসম্পদের উন্নয়ন নির্ভর করে সেগুলিতে বেশি করে অর্থ বিনিয়োগ করা এবং (৩) আয় বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করা।

এই ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে গেলে রাষ্ট্রকেই একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি উদ্যোগের থেকে সরকারি উদ্যোগের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই সময় যে ধরনের বিনিয়োগ উন্নয়নের স্বার্থে করা প্রয়োজন সেই ধরনের বিনিয়োগ নানা কারণে বেসরকারি উদ্যোগের দ্বারা করা সম্ভব হয় না। যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করা অথবা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ উৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগ করার (যেমন, ভারী শিল্প গঠন করার) ক্ষমতা বা ইচ্ছা সাধারণত বেসরকারি উদ্যোগের থাকে না। এই সবের উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়া আয়বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্র উন্নয়নে অংশ নিয়ে শুধু উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিতই করে না, সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ঠিক পথে চালনাও করে।

এর জন্য সরকারের বাজেট উন্নয়নশীল দেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের স্বার্থে সরকারকে বাজেটের বিভাজন শাখা (Allocation Branch) এবং বণ্টন শাখা (Distribution Branch)-র উপর বেশি নির্ভর করতে হয়। তবে মনে রাখা দরকার বাজেটের স্থিতিকরণ বিভাগেরও (Stabilisation Branch) কিছু ভূমিকা আছে, কারণ দেশে যদি মূল্যস্তরের স্থিরতা না থাকে তাহলে উন্নয়নের সুফলগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

বিনিয়োগের জন্যে অর্থ সংস্থান

উন্নয়নশীল দেশের প্রধান সমস্যা হল মূলধন গঠনের জন্যে যে সম্পদের প্রয়োজন সেই সম্পদের অভাব। রাজস্ব নীতি কীভাবে এই সম্পদ সংগ্রহে সাহায্য করে তা আলোচনা করার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে কোন দেশেই অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের জন্যে যে সম্পদের দরকার হয় তা পাওয়া যায় প্রধানত দুটি উপায়ে—প্রথমত, দেশের সামগ্রিক সঞ্চয় থেকে এবং দ্বিতীয়ত, বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নীট বৈদেশিক আয় থেকে। শেষোক্ত ক্ষেত্র থেকে সম্পদ সংগ্রহ অনেক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, ফলে পাওয়াটা অনেক অনিশ্চিত। সেইজন্য অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টা করে। এর জন্যে কর নীতির সাহায্যে দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি ও সঞ্চয় সংগ্রহ খুবই গুরুত্ব পায়।

কোনও একজন ব্যক্তির সঞ্চয় যেমন নির্ভর করে তিনি কতটা আয় করছেন এবং কতটা ব্যয় করছেন তার ওপর, তেমনি জাতীয় স্তরেও সঞ্চয় (S) নির্ভর করে ভোগ ব্যয় (C) বাদ দিয়ে মোট জাতীয় আয়ের (Y) কতটা উদ্বৃত্ত হচ্ছে তার ওপর। সমীকরণের সাহায্যে দেখালে $S = Y - C$।

এই সঞ্চয়ই ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে বিনিয়োগ করা হয়। সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পাবে, মূলধন গঠনের হারও বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হবে।

উন্নয়নশীল দেশের প্রধান সমস্যা হল এই সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি করা এবং সেটিকে উৎপাদনশীল কর্মে বিনিয়োগ করা। উপরের সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে সঞ্চয়কে বৃদ্ধি করতে হলে হয় জাতীয় আয় Y-কে বৃদ্ধি করতে হবে অথবা C বা ভোগব্যয়কে হ্রাস করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করাই প্রধান সমস্যা সুতরাং সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য ভোগ ব্যয় হ্রাসই একমাত্র বিকল্প।

জাতীয় স্তরের ভোগব্যয়কে দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়—সরকারি ভোগব্যয় এবং বেসরকারি ভোগব্যয়। সরকারি ব্যয়ের অনেকটাই হ্রাস করা সম্ভব হয়। সেগুলি অধিকাংশই সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন, যেমন সরকারের শাসনব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্যে যে ব্যয় হয়, সেই ব্যয় বা প্রতিরক্ষা ব্যয় অথবা বিশেষ বিশেষ সেবামূলক দ্রব্যসামগ্রীর (যেমন, রাস্তাঘাট, স্কুল, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, হাসপাতাল ইত্যাদি) জন্যে ব্যয়।

সুতরাং সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্যে সরকারকে বেসরকারি ভোগব্যয় হ্রাস করার ওপরই গুরুত্ব দিতে হয়। এবং এর জন্যে সরকারকে নির্ভর করতে হয় করনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ, উভয় প্রকার করের সাহায্যেই বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যয়যোগ্য প্রকৃত আয় এবং ভোগব্যয় হ্রাস করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে বেসরকারি ভোগব্যয় হ্রাস করা অনেক সহজ—এখানে সরকার যে শুধু দ্রব্যের দামই নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন তাই নয়, কী পরিমাণের দ্রব্যসামগ্রী একজন ভোগক্রেতা ক্রয় করতে পারবেন তাও নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে সেটি সম্ভব নয়। সেইজন্য এইসব দেশে প্রধানত করনীতির প্রয়োগের দ্বারা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের জন্যে সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। এখানে যেটি

লক্ষণীয় তা হল এই যে, অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে কর রাজস্ব ও মোট জাতীয় আয়ের অনুপাত খুবই কম। ১৯৭০ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এই অনুপাত প্রায় ১৪, যেখানে উন্নত দেশে এই অনুপাতটি হল ৪০। আরো দেখা গেছে যে আদায়ীকৃত কর রাজস্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই সংগ্রহ করা হয়েছে অপ্রত্যক্ষ কর মারফত। গত তিরিশ বছরে অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। যেমন ভারতবর্ষে কর রাজস্ব ও জাতীয় আয়ের অনুপাতটি হল ১০-এর কাছাকাছি এবং এই রাজস্বের অধিকাংশই (৬.৫ অংশ) অপ্রত্যক্ষ কর মারফত সংগৃহীত হয়। যদি ধরেও নেওয়া যায় এইসব দেশে অধিকাংশ লোকেরই কর দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাহলেও একথা অনস্বীকার্য যে কর রাজস্ব বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ আছে।

কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে কর নীতিকে ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করতে গেলে কর ব্যবস্থার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। সেগুলি হল—

১। করগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে শুধুমাত্র দেশের সঞ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে আয় বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং বিনিয়োগকারীরা আরো বিনিয়োগ করতে উৎসাহ পাবেন।

২। প্রত্যক্ষ কর এমনভাবে প্রয়োগ করা দরকার যাতে করের বোঝা প্রধানত উচ্চ আয়বিশিষ্ট লোকদেরই বহন করতে হয়। শুধু তাই নয়, করগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, দেয় করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেয় কর ও আয়ের অনুপাতও বৃদ্ধি পাবে। এর অর্থ হল আয়কর ও সম্পদ করকে প্রগতিশীল করা।

৩। প্রত্যক্ষ কর প্রধানত রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হলেও এই করগুলি—উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয়কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক—সম্পদ বণ্টনে অসাম্য দূর করতে সাহায্য করে। যে সব দ্রব্য কেবল উচ্চ আয়বিশিষ্ট লোকেরাই ব্যবহার করেন, (যেমন টিভি, ফ্রীজ, ক্যামেরা, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি বিলাসদ্রব্য) সেগুলির ওপর উচ্চ হারে কর বসালে রাজস্ব সংগ্রহ এবং অসাম্য দূরীকরণ, উভয় উদ্দেশ্যই পূরণ হয়।

৪। কর বসানোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বেসরকারি উদ্যোক্তা উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হন এবং কোনওভাবেই যেন তাঁরা নতুন বিনিয়োগ করার আগ্রহ হারিয়ে না ফেলেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, খুব প্রগতিশীল আয়করের ক্ষেত্রে, আয়ের সর্বোচ্চ স্তরে করের হার এত বেশি যে বিনিয়োগকারীরা উৎপাদনে আরও অর্থ বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত আয় করতে উৎসাহী হন না। সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসা বা কৃষিতে উৎপাদনে, আয় বা মুনাফার ওপর আলাদা আলাদাভাবে কর না বসিয়ে একটি প্রগতিশীল থোক টাকাকে দেয় কর হিসেবে ধার্য করা যেতে পারে। যেমন কৃষির ক্ষেত্রে জোতের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এককালীন দেয় করের পরিমাণও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তাছাড়া বিনিয়োগকারীদের কিছু দিনের জন্যে করদান থেকে রেহাই (Tax Holiday) দেওয়া যেতে পারে।

৫। সাধারণত উচ্চ আয়বিশিষ্ট লোকেরাই সঞ্চয় বেশি করেন কারণ তাঁদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা খুব কম। এঁদের ওপর বা বেসরকারি ব্যবসার ওপর উচ্চহারে আয়কর বা মুনাফা কর বসালে এঁদের সঞ্চয় হ্রাস পায়।

তাছাড়া কর ফাঁকি দেবার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এঁরাই, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বিলাসদ্রব্যগুলির প্রধান ক্রেতা। সেইজন্যে অনেকে বলেন উন্নয়নশীল দেশের উচিত আয়ের উপর উচ্চহারে প্রগতিশীল কর না বসিয়ে একটি প্রগতিশীল ব্যয় কর বসানো। অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি, দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার জন্যে যে ব্যয় করবেন, সেই ব্যয়ের উপর বর্ধিত হারে কর দিতে হবে—ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেয় করের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য এই ধরনের ব্যয় কর পরিচালনা করা অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

৬। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশে কর ব্যবস্থার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। যেমন সারল্য অর্থাৎ যাঁরা কর সংগ্রহ করবেন এবং যাঁরা কর প্রদান করবেন তাঁদের উভয়পক্ষেরই কর নিয়ে কোনও সংশয় থাকবে না। দ্বিতীয়ত, শুধু প্রগতিশীল আয় বা মুনাফা করের সাহায্যেই কর রাজস্বকে আয়-স্থিতিস্থাপক করলে হবে না, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বা দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে এককালীন দেয় করের পরিমাণও যাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিনিয়োগের ধরনে করনীতির ভূমিকা

সরকারের কর নীতি কেবল উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে না, বিনিয়োগের ধরনকে প্রভাবিত করে। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের যৌথ ভূমিকা থাকে, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং উৎপাদনকে ঠিক পথে বা কাম্য পথে চালনা করার দায়িত্বও সরকারকে গ্রহণ করতে হয়। এর জন্যে সরকারকে কর ও ভর্তুকি (যাকে ঋণাত্মক কর বলা যেতে পারে) উভয়ের উপরই নির্ভর করতে হয়। যেমন, আমরা দেখেছি উন্নয়নের স্বার্থে বিলাসদ্রব্যের উপর উচ্চহারে অপ্রত্যক্ষ কর বসানো এবং সঙ্গে সঙ্গে এইসব দ্রব্য যাঁরা ভোগ করেন তাঁদের আয়ের ওপর প্রগতিশীল হারে আয়কর বা মুনাফা কর বসানো বিশেষ প্রয়োজন। এর সঙ্গে সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনের উপর ভর্তুকি (Subsidy) দেবারও ব্যবস্থা করা উচিত। সরকারি হস্তক্ষেপ যদি না থাকত, যদি বাজারের চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলি কী ধরনের উৎপাদন হবে, তা নির্ণয় করত তাহলে, বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনই হত, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির অভাব দেখা দিত, কারণ বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনে মুনাফা অর্জন করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই ক্ষেত্রে সরকারি কর নীতির প্রয়োগের ফলে বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, উন্নয়নের প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হবে, সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাবেন এবং জাতীয় সম্পদের অপচয় (বিলাস দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োগ হলে যা হত) বন্ধ হবে।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল দেশে প্রথম দিকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্যে বিদেশের আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সেইজন্যে দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আমদানি করা বিদেশী দ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসানো একটি বহুল প্রচলিত প্রথা। পৃথিবীর সব দেশই কোনও না কোনও সময়ে এই ধরনের শুল্ক নীতির সাহায্যে আমদানির বিকল্প শিল্প গড়ে তুলেছে। উন্নয়নশীল দেশেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে এই ধরনের শুল্ক নীতির ছত্রছায়ায় এমন শিল্প না গড়ে ওঠে যেগুলি শুধু অদক্ষই নয়, উন্নয়নের স্বার্থের পরিপন্থী, যেমন অনেক বিলাসদ্রব্য যেগুলি অধিকাংশ লোকের কোনও প্রয়োজনে আসে না। সেইজন্যে কর নীতির সাহায্যে শিল্প গঠনের সময়, সম্পদের অপচয় বন্ধ করার জন্যে কী ধরনের উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ হবে তাও সরকারের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে এমন কিছু দ্রব্যের উৎপাদন হওয়া প্রয়োজন যেগুলি বৈদেশিক মূলধন বা প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। সেই জন্যে আমদানি শুল্ককে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন যাতে ঐ ধরনের শিল্প গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতির অংশের আমদানির ওপর শুল্কের হার কম হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্যে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করের সুবিধে বা ভর্তুকি দেওয়াও দরকার।

সরকারি ব্যয়ের ভূমিকা

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমরা আগে দেখেছি যে দেশের মোট ভোগব্যয়ের একটি অংশ হল সরকারি ভোগব্যয়। বেসরকারি ব্যয়ের ন্যায় সরকারি ব্যয়ও যদি হ্রাস করা যায় তাহলে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। এই সরকারি ব্যয় হ্রাস করার জন্যে সরকারকে অপ্রয়োজনীয় ও পরিহারযোগ্য ব্যয়কে চিহ্নিত করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কারণে সরকারকে অনেক ব্যয় করতে হয় যা দেশের বৃহত্তম স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বর্জন করা উচিত। অনেক দেশে সরকার চাষের জন্যে প্রয়োজনীয় সারের ওপর ভর্তুকি বসিয়ে থাকেন যাতে চাষীরা কম দামে সার পায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই সুবিধাটি মূলত ভোগ করেন বৃহৎ জোতের মালিকেরা—ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা এই সুবিধে থেকে বঞ্চিত হন। এই ধরনের ব্যয় সংকোচন করলে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় হ্রাস করার থেকে বেশি প্রয়োজনীয় হল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা।

প্রথমত, যে সব দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কার্যসূচী রূপায়ণের জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে, সেইসব দেশে পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য সরকারকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির মূল কাঠামোর বেশ কিছু পরিবর্তন না হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। যেমন, একটি কৃষি প্রধান দেশকে শিল্পে অগ্রসর করতে গেলে সরকারকে বেশ কিছু শিল্প গঠনে অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে উন্নত দেশে যে বেকার সমস্যা দেখা দেয় তা হল প্রধানত কার্যকরী চাহিদার অভাবের জন্যে, সুতরাং সরকারি ব্যয় যদি চাহিদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তাহলে বেকার সমস্যা আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে যে বেকার সমস্যা দেখা যায় তার কারণ হল মূলত কাঠামোগত যেমন অনগ্রসর কৃষি, শিল্পের অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধা—সুতরাং সরকারি ব্যয় মারফত এই কাঠামোর পরিবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, উন্নয়নের জন্যে যে পরিকাঠামোর প্রয়োজন—রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি—তা গড়ে তোলার দায়িত্ব হল সরকারের। কারণ এগুলিতে বেসরকারি উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগের সম্ভাবনা খুবই কম।

আমরা দেখেছি উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধন ও প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই সব দেশে যদি নির্ভরযোগ্য পরিকাঠামো থাকে তাহলে বিদেশ থেকে উৎপাদনে বিনিয়োগের জন্যে সাহায্য পাওয়া অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

চতুর্থত, উন্নয়নের একটি প্রধান উপাদান হল মানবসম্পদ। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে যেমন কলকারখানার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দক্ষ ও কুশলী শ্রমিকের, ম্যানেজারের। এর জন্যে দেশের বেকার শ্রমিককে মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করার দায়িত্বও সরকারকেই নিতে হবে। সরকারি ব্যয়েই তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও ট্রেনিং দেওয়া দরকার।

পঞ্চমত, আমরা দেখেছি কেবলমাত্র মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পন্ন হয় না, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরতা হার, গড় আয়ু, স্বাস্থ্য ইত্যাদিরও উন্নতি দরকার। এই ধরনের সামাজিক স্থির মূলধন (Social Overhead Capital) গঠনের জন্য সরকারি ব্যয় বিশেষ প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, আয় বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করার জন্যে সরকারি কর নীতি একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করারও প্রয়োজন আছে। বিশেষত আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে দেশের দারিদ্র্য কমে যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেইজন্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারকে বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করতে হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বহুমুখী লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে গেলে সরকারি রাজস্ব নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সরকার তাঁর বিভিন্ন প্রকার করের সাহায্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি করে উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করেন, আয় বৈষম্য হ্রাস করেন এবং উন্নয়নের স্রোতকে নির্দিষ্ট পথে চালনা করার চেষ্টা করেন আর সরকারি ব্যয়ের সাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করেন,—যেগুলি সরকারি আনুকূল্য ছাড়া উৎপাদিত হত না—এবং সম্পদের পুনর্বণ্টন করে আয় বৈষম্য হ্রাস করার চেষ্টা করেন।

১.৫ রাজস্ব নীতির মূল্যায়ন

রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা, বিশেষত মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠা, একসময় বিভিন্ন দেশে খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে বাজেট নীতির কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। দেখা গেল যে সরকারের কর ও ব্যয় নীতি সবসময় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে না। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমস্যাও রাজস্ব নীতির সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। যেমন দেশের কোনও এক অঞ্চলে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্যে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা বা কর হ্রাসের কোনও প্রয়োজন

নেই। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার ক্ষেত্রেও রাজস্ব নীতির সীমাবদ্ধতা আছে। মূল্য বৃদ্ধির সময় কর বৃদ্ধির ফলে ভোগ ভোগ ব্যয় হ্রাস না পেয়ে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে দ্রব্য কম উৎপাদন হচ্ছে এবং মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া গত শতাব্দীর ছয়-সাতের দশকে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে একই সঙ্গে যে মন্দাভাব ও মুদ্রাস্ফীতির সহাবস্থান দেখা দিয়েছিল তার মোকাবিলা রাজস্ব নীতির সাহায্যে করা যাচ্ছিল না। সেই অবস্থাকে অর্থনীতিবিদরা বদ্ধস্ফীতি (Stagflation) নামে আখ্যায়িত করেন।

উন্নয়নশীল দেশেও রাজস্ব নীতির কিছু সীমাবদ্ধতা চোখে পড়েছিল। দেখা গেল পরিবর্তন করে উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি পূরণ করা যাচ্ছে না—উপরন্তু একটি লক্ষ্য পূরণ হলে অন্য লক্ষ্য পূরণে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন উচ্চ হারে আয়কর বসালে আয় বৈষম্য হয়ত সামান্য কমছে কিন্তু সঞ্চয় ও বিনিয়োগও হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া এইসব দেশে উন্নয়নের প্রথম দিকে যে মূল্য বৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে তাও রাজস্ব নীতির প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, কারণ এই সব দেশের প্রধান সমস্যা হল দ্রব্যের স্বল্পতা।

কিছু অর্থনীতিবিদদের মতে রাজস্ব নীতির সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণ হল রাজস্ব নীতি যোগানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেইন্‌সীয় ঘরানা অনুযায়ী চাহিদার পরিবর্তনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যোগানের পরিবর্তন করা। যেমন সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রান্তিক আয়কর হ্রাস করে, শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি করা ও সঞ্চয়স্পৃহা বৃদ্ধি করা। কর হ্রাসের ফলে শ্রমিকেরা আগের থেকে কম বিশ্রাম ভোগ করবেন ও করদাতারা আগের থেকে কম ভোগ করবেন, কারণ তাঁদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, রাজস্ব নীতি সবসময় কার্যকর হয় না কারণ এই নীতি অর্থনীতিতে টাকাকড়ির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও উপেক্ষা করে। এঁরা মনে করেন কর ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা টাকাকড়ির পরিবর্তনই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি পূরণে অনেক বেশি সাফল্য আনতে পারে।

রাজস্ব নীতির এইসব সীমাবদ্ধতার জন্যে আধুনিককালে বিভিন্ন দেশে বাজেট নীতির প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিপূরক নীতিও ব্যবহার করা হয়, সরকারি আয় ও ব্যয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতিরও পরিবর্তন করা হয় অর্থাৎ সুদের হার হ্রাস বৃদ্ধি বা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ওপরও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেইরকম, উন্নয়নশীল দেশেও সরকারের বাজেট নীতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির যৌথ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের স্বার্থে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন কৃষি ও শিল্পকে ঋণ দেবার জন্যে বিশেষ ধরণের ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রয়োজন হলে ন্যায্য দামে কৃষকের কাছ থেকে পণ্য কিনে, ভোগকারীদের মধ্যে ন্যায্য দামে বিক্রয় করা ইত্যাদি।

১.৬ সারাংশ

রাজস্ব নীতি বলতে সরকারের কর নীতি, ব্যয় নীতি ও ঋণ নীতিকে বোঝায়। এই নীতি সরকার তার বাজেট মারফত কার্যকর করেন। সরকারি বাজেটে তিনটি অংশ থাকে। বাজেটের বিভাজন শাখার কাজ হল বেসরকারি দ্রব্যের উৎপাদন ও গণভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনের মধ্যে সম্পদের সুষম বিভাজন করা—বিশেষ করে গণভোগ্য

দ্রব্যগুলি উৎপাদন করা ও তাদের মূল্য নির্ধারণ করা। এই দ্রব্যগুলি বাজার মারফত উৎপাদন হয় না। উদাহরণ হল, প্রতিরক্ষা, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি। বাজেটের স্থিতিকরণ শাখার কাজ হল অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, শ্রমিকের নিয়োগকে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে রাখা, মূল্যস্তরে স্থিরতা আনা, বাণিজ্য চক্রের ওঠানামার হাত থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করে উন্নয়নের হারকে বজায় রাখা। বাজেটের তৃতীয় শাখা হল বণ্টন শাখা। এই শাখাটির সাহায্যে উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে বাজেটে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

কিছুদিন অন্তর অন্তর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে চক্রাকারে যে তেজীভাব ও মন্দাভাব দেখা যায় তাকেই বলা হয় বাণিজ্য চক্র। একটি বাণিজ্য চক্রের চারটি দশা থাকে, সমৃদ্ধি, অবনতি, মন্দা ও পুনরুন্নতি। একটি সমৃদ্ধির শীর্ষ বিন্দু থেকে আর একটি সমৃদ্ধির শীর্ষ বিন্দু বা একটি মন্দার নিম্ন বিন্দু থেকে আর একটি মন্দার নিম্ন বিন্দুতে আসতে যে সময় লাগে তার থেকে জানা যায় বাণিজ্যচক্রের দৈর্ঘ্য কত। তবে সব বাণিজ্য চক্র সমান দৈর্ঘ্যের হয় না।

বাণিজ্য চক্র বিরোধী রাজস্ব নীতির দুটি অংশ থাকে, স্বয়ংক্রিয় স্থিতিকারক রাজস্ব নীতি ও বিবেচনামূলক রাজস্ব নীতি। প্রথমোক্তের ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতির অন্তর্জাত কিছু কিছু সরকারি ব্যয়, যেমন হস্তান্তর পাওনা এবং কিছু কিছু কর যেমন প্রগতিশীল আয়কর, বাণিজ্য চক্রজনিত অর্থনীতির উত্থান বা পতনের সময় এমনভাবে পরিবর্তিত হয়, যাতে মন্দার সময় মন্দাভাব কেটে যেতে শুরু করে আর তেজী অবস্থায় অর্থনীতিকে আরও তেজী হতে দেয় না। বিবেচনামূলক রাজস্ব নীতিতে সরকারকে বিবেচনা করে সরকারি কর এবং সরকারি ব্যয়কে পরিবর্তন করতে হয়। মন্দার সময় ব্যয় বৃদ্ধি ও কর হ্রাস করতে হয় আর সমৃদ্ধির সময় ব্যয় হ্রাস ও কর বৃদ্ধি করতে হয়। সরকার যে পরিমাণ কর বা ব্যয় পরিবর্তন করেন (তখন) পরিবর্তিত হয় তার থেকে অনেকগুণ বেশি।

উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যেও রাজস্ব নীতিকে ব্যবহার করা হয়। এখানে সরকার কর আরোপ করে বেসরকারি ভোগ ব্যয়ের সংকোচন করে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও সংগ্রহ করেন। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। এর জন্যে কর ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। করগুলি আয় বৈষম্য হ্রাসে সাহায্য করবে। করের বোঝা উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপরই পড়বে। অপ্রত্যক্ষ করগুলি রাজস্ব সংগ্রহে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলেও এগুলি প্রধানত বিলাস দ্রব্যের ওপরই ধার্য করা উচিত। তাছাড়া করগুলি যেন বেসরকারি উদ্যোগকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এবং এগুলি যেন সহজ বোধগম্য হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সরকারের করনীতি বিনিয়োগের ধরনকেও প্রভাবিত করে। বেসরকারি বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে কাম্য পথে চালনা করার দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হয় বিভিন্ন করের সাহায্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারকে ঋণাত্মক কর বা ভর্তুকি দিতে হয়।

দেশের স্বার্থে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। বিশেষত সামাজিক স্থির মূলধন—উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠনে সরকারি ব্যয়ের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সরকারি উদ্যোগে রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যালয় স্থাপন, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হলে, দেশের লোকের জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি পাবে।

সরকারের রাজস্ব নীতি প্রধানত চাহিদার পরিবর্তনের ওপর গুরত্ব দেয়। আধুনিক কালে যোগানভিত্তিক রাজস্ব নীতির কথাও বলা হয়। তাছাড়া রাজস্ব নীতির কিছু সীমাবদ্ধতার জন্যে রাজস্ব নীতিকে, আর্থিক নীতির মতো কিছু পরিপূরক নীতির সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী—১

১। সঠিক বাক্যটিকে (✓) চিহ্ন দিন

(ক) উন্নয়নশীল দেশে সরকারি বাজেটের বিভাজন শাখা ও স্থিতিকরণ শাখা বণ্টন শাখার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। (সঠিক/ভুল)

(খ) উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি ব্যয় হ্রাসের থেকে বেশি প্রয়োজনীয় হল সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা। (সঠিক/ভুল)

(গ) সঞ্চয় বৃদ্ধি করার প্রধান উপায় হল বেসরকারি ভোগ ব্যয় হ্রাস করা। (সঠিক/ভুল)

(ঘ) কেবল মাথা পিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। (সঠিক/ভুল)

২। উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের প্রধান সমস্যা কি? (১০০টি শব্দের মধ্যে লিখুন)

৩। উন্নয়নশীল দেশে কর ব্যবস্থার প্রধান পাঁচটি কাম্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন। (দশটি শব্দের মধ্যে লিখুন)

১.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

বিভাজন (নিয়োজন) শাখা (Allocation Branch)	:	সরকারের বাজেটের একটি শাখা যার কাজ হল দেশের সম্পদের কত অংশ গণভোগ্য দ্রব্য এবং কত অংশ বেসরকারি দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহার করা হবে, তা ঠিক করা।
স্থিতিকরণ শাখা (Stabilisation Branch	:	সরকারি বাজেটের একটি শাখা যার কাজ হল দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।
বণ্টন শাখা (Distribution Branch)	:	বাজেটের একটি শাখা যার কাজ হল দেশের মধ্যে আয় বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করা।
গণভোগ্য দ্রব্য (Public Goods)	:	যে দ্রব্যের উৎপাদনে 'বাদ দেওয়ার নীতি' অনুসরণ করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ দ্রব্যটি একবার উৎপাদন করা হলে সকলেই এটি ভোগ করতে পারবে এবং দ্রব্যটি একজন ভোগ করলে অন্যদের ভাগে কম পড়বে না। যেমন রাস্তা, পার্ক ইত্যাদি।
হস্তান্তর ব্যয় (Transfer Payment)	:	কোনওরকম প্রতিদান ছাড়াই যে অর্থ ব্যয় করা হয়। যেমন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বার্ধক্য ভাতা, বেকার ভাতা ইত্যাদি। জাতীয় আয়ের হিসেব থেকে এগুলি বাদ দেওয়া হয়।

মূলধনী খাত (Capital (Account)) : যে সমস্ত আয় সরকারের দায় বৃদ্ধি করে (যেমন সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ) এবং যে সমস্ত ব্যয় সরকারের দাম হ্রাস করে (যেমন দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের ব্যয়) সেগুলি বাজেটের যে হিসাব খাতে বিবেচনা করা হয়।

চলতি খাত (Current Account) : যে সমস্ত আয় সরকারের দায় বৃদ্ধি করে না (যেমন কর রাজস্ব) এবং যে সমস্ত ব্যয় সরকারের দায় হ্রাস করে না (যেমন সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয়) সেগুলি বাজেটের যে হিসেব খাতে বিবেচনা করা হয়।

পরিপূরণমূলক রাজস্ব নীতি (Compensatory Fiscal Policy) : যে রাজস্ব নীতির সাহায্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা হয়।

মন্দা (Depression) : বাণিজ্য চক্রের যে অবস্থায় আয়, নিয়োগ, বিনিয়োগ, মুনাফার হার ইত্যাদি হ্রাস পেতে নিম্নতম বিন্দুতে পৌঁছায়।

তেজীভাব (Boom) : বাণিজ্য চক্রের যে অবস্থায় আয়, নিয়োগ, বিনিয়োগ, মুনাফার হার ইত্যাদি সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়।

বদ্ধস্ফীতি (Stagflation) : মূল্যবৃদ্ধি এবং উৎপাদন ও নিয়োগের অচল অবস্থার সহাবস্থান। অর্থাৎ একদিকে উৎপাদনে কোনও বৃদ্ধি হয় না অন্যদিকে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সামাজিক স্থির মূলধন (Social overhead capital) : যে সব মূলধন গঠনের উপর সামাজিক মঙ্গল নির্ভর করে। যেমন স্কুল কলেজ স্থাপন করে শিক্ষার প্রসার করা এবং হাসপাতাল ইত্যাদির প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের লোকের মৃত্যুহার হ্রাস করা, গড় আয়ু বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

ভর্তুকি (Subsidy) : উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্যে উপাদানের দামে ছাড় দিয়ে কম দামে উপাদানটি উৎপাদককে সরবরাহ করা। ঋণাত্মক কর বলা যেতে পারে।

আর্থিকতাবাদী (Monetarist) : যে সব অর্থনীতিবিদ মনে করেন অর্থনীতিতে টাকাকড়িই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। টাকাকড়ির হ্রাস-বৃদ্ধির ওপরই অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। সেইজন্যে বাজেট নীতি অপেক্ষা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি বেশি প্রয়োজনীয়।

১.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। (ক) ভুল (খ) সঠিক (গ) সঠিক (ঘ) ভুল ২।১.২.১ ৩। ১.২.২

অনুশীলনী—২

১। (ক) ভুল (খ) সঠিক (গ) সঠিক (ঘ) ভুল ২।১.৩ ৩। ১.৩.১ ও ১.৩.২

অনুশীলনী—৩

১। (ক) ভুল (খ) সঠিক (গ) সঠিক (ঘ) ভুল ২।১.৪ ৩। ১.৪

একক ২ ❐ সরকারি ঋণ

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ সরকারি ঋণের বৈশিষ্ট্য

২.৩ সরকারি ঋণ সংগ্রহের সূত্র

২.৪ সরকারি ঋণের তাৎপর্য

২.৫ সরকারি ঋণের ভার

২.৫.১ আভ্যন্তরীণ ঋণের ভার

২.৫.২ বৈদেশিক ঋণের ভার

২.৫.৩ সরকারি ঋণের ভার ও আন্ত-প্রজন্ম সমতা

২.৬ সারাংশ

২.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২.৮ উত্তরমালা

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককে সরকারি ঋণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই একক পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- সরকারি ঋণের সঙ্গে বেসরকারি ঋণের পার্থক্য।
- সরকার কিভাবে ঋণ সংগ্রহ করেন।
- দেশের অর্থনীতিতে এই ঋণের তাৎপর্য।
- এই ঋণের ভার কে বহন করেন।
- আভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে পাওয়া ঋণের সঙ্গে বৈদেশিক সূত্র থেকে পাওয়া ঋণের পার্থক্য।

১.১ প্রস্তাবনা

যে কোনও সরকারি সংস্থাকেই তার বিভিন্ন ধরনের ব্যয় মেটাবার জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়। যেসব সরকারি সংস্থা কেবল প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তারা এই ব্যয়ের কিছুটা মেটায় তাদের উপার্জিত আয়

থেকে। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকার কর রাজস্ব থেকেই তাদের ব্যয়ের প্রধান অংশটুকু সংগ্রহ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার আবার টাকাকড়ির যোগান বাড়িয়ে অর্থের প্রয়োজন মেটালে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। সেইজন্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাবার জন্যে সরকারকে প্রধানত বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে হয়। অন্যান্য ঋণের ন্যায় এই ঋণের জন্যেও সরকারকে সুদ দিতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে আসল ঋণটিও ফেরত দিতে হয়। সুতরাং ঋণ গ্রহণ করার অর্থ হল ঋণের ভারটিও বহন করা।

গত কয়েক দশকে সরকারের কার্যাবলী বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ঋণের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা দেখেছি সরকার অনেক সময় দেশের স্বার্থে বাজেটে ঘাটতি দেখান। এই ঘাটতি মেটাবার জন্যে সরকারকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণ দিতে হয়। এই ঋণ যদি আবার দীর্ঘমেয়াদী হয় তাহলে এই ঋণশোধ হতে অনেক বছর কেটে যায়। আবার কিছু কিছু সরকারি ঋণ শোধ হতে অনেক বছর কেটে যায়। আবার কিছ কিছু সরকারি ঋণ কোনও দিনই শোধ দেবার প্রয়োজন হয় না—কেবল নিয়মিত সুদ দিয়ে যেতে হয়। তাছাড়া এমনও হয় যে ঋণ শোধ দেবার দায়িত্ব যাঁর ওপর বর্তায় তিনি হয়ত আসলে ঋণটি নেননি—ঋণটি নিয়েছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। তাছাড়া সরকার তাঁর ঋণের জন্য নিয়মিতভাবে যে সুদ দেন বা ঋণের মেয়াদ অন্তে যে আসলটি ফেরত দেন তা সংগ্রহ করেন দেশের লোকের ওপর কর বসিয়ে। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সরকারি ঋণের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

২.২ সরকারি ঋণের বৈশিষ্ট্য

সাধারণত সরকারের আয় যদি সরকারের ব্যয়ের থেকে বেশি হয় তাহলে সরকারকে ঋণ দিতে হয়। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে সরকারি ঋণের সঙ্গে বেসরকারি ঋণের কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু সরকারি ঋণের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল :

১। ব্যক্তিগত ঋণ কখনও বাধ্যতামূলক হয় না—ঋণ দেওয়া বা না দেওয়া ঋণদাতার মর্জির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সরকারি ঋণ অনেক সময় বাধ্যতামূলক হয়। দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে—যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে দেশের লোকের কাছে ঋণ দিতে পারেন।

২। ব্যক্তিগত ঋণ আয়ের ঘাটতি মেটাবার জন্য নেওয়া হয় কিন্তু সরকার অন্যান্য উদ্দেশ্যেও ঋণ দিতে পারেন। যেমন মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার দেশের লোকের সরকারি ঋণপত্র কিনতে উৎসাহ দিতে পারেন। এইভাবে ঋণ সংগ্রহ করলে দেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩। ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ শোধ দিতে না পারলে ঋণী ব্যক্তিটি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু সরকার কোনও দিন দেউলিয়া হন না। যখনই কোনও ঋণ শোধ দেবার সময় উপস্থিত হয় তখন সরকার

একটি নতুন ঋণ নিয়ে পুরনো ঋণটি পরিশোধ করে দেন। একে বলা হয় ঋণের প্রত্যর্পণ (Refunding of Loan)।

৪। ব্যক্তিগত ঋণের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে এবং সময় অতিক্রান্ত হলে এই ঋণ পরিশোধ করতেই হয়। কিন্তু কিছু কিছু সরকারি ঋণের কোনও সময়সীমা নাও থাকতে পারে—সরকার ঋণদাতাকে কোনদিনই ঋণটি পরিশোধ করেন না। অবশ্য সরকারকে বছর বছর ঋণদাতাকে নির্দিষ্ট সুদটি দিয়ে যেতেই হয়।

৫। ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছে করে ঋণগ্রস্ত হতে চান না, কিন্তু সরকার অর্থনীতির প্রয়োজনে—যেমন উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের স্বার্থে—আয়ের থেকে ব্যয় বেশি করে, ঋণের সাহায্যে ঘাটতি মেটান।

৬। ব্যক্তিগত ঋণের প্রভাব শুধু ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সরকারি ঋণের প্রভাব শুধুমাত্র সরকারের আয়-ব্যয়ের ওপরই পড়ে না, অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে।

২.৩ সরকারি ঋণ সংগ্রহের সূত্র

সরকার দেশের অভ্যন্তর থেকে বা বিদেশ থেকে ঋণ-সংগ্রহ করতে পারেন। দেশের অভ্যন্তর থেকে সরকার সাধারণত ঋণপত্রের সাহায্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারেন। সরকারি ঋণে যেহেতু ঝুঁকির সম্ভাবনা কম এবং অনেকক্ষেত্রে যেহেতু ঋণপত্রগুলি হস্তান্তরযোগ্য, ঋণ সংগ্রহ করতে সরকারের বিশেষ অসুবিধে হয় না।

সরকারি ঋণপত্রগুলি স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী, দুই প্রকারেরই হতে পারে। স্বল্পকালীন ঋণ-সংগ্রহের সরকারি হাতিয়ার হল সরকারি রাজকোষ বিল (Treasury Bill)। সাধারণত ৯১ দিনের (তবে এর মেয়াদ ১৮২ বা ৩৬৪ দিনও হতে পারে) জন্যে সরকার এই ঋণ দেয়। অনেক দেশে রাজকোষ বিলের মাধ্যমে সরকার জনসাধারণ এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগ (যাঁদের উদ্বৃত্ত অর্থ আছে)—উভয়ের কাছ থেকেই ঋণ নেয়। ইংল্যান্ডে সরকারি লগ্নীপত্র বা রাজকোষ বিলগুলি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট দিনে বাজারে বিক্রির জন্যে উপস্থাপিত করা হয়। ঐ নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত লগ্নীপত্র বিক্রি না হলে অবিক্রীত অংশের পুরোটাই ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যান্ড কিনে নেয় এবং পরে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ধীরে ধীরে অবিরাম গতিতে বিক্রয় করেন। রাজকোষ বিল সবদেশে জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করা হয় না। যেমন ভারতবর্ষ সরকার (তার) রাজকোষ বিলগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছেই বিক্রয় করেন। সরকার যখন এইভাবে ঋণ-সংগ্রহ করেন তখন দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়।

দীর্ঘকালীন ঋণ সংগ্রহের হাতিয়ার হল সরকারি তমলুক (Board)। এই ঋণপত্রের মালিক নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সুদ হিসাবে পেয়ে থাকেন। এইসব লগ্নীপত্র বা তমসুকগুলি হস্তান্তরযোগ্য এবং খোলাবাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

কিছু কিছু সরকারি লগ্নীপত্র যেকোনও পরিমাণে পাওয়া গেলেও সেগুলি হস্তান্তর অযোগ্য। যেমন ভারতবর্ষের জাতীয় সঞ্চয় প্রত্যয় (Natural Savings Certificates) পত্র বা কিষাণ বিকাশ পত্র। এগুলির ক্রেতারা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে সুদসমেত আসলটি ফিরে পান।

সরকার যখন বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণ করেন, তখন সেই ঋণ পেতে পারেন সরাসরি বৈদেশিক সরকারের কাছ থেকে, অথবা সেই দেশের বেসরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার বা বিশ্বব্যাঙ্কের মতো আন্তর্জাতিক ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও বিভিন্ন দেশে ঋণ দিয়ে থাকে। অনেক সময় সরকার বিদেশ থেকে ঋণ সংগ্রহের জন্য বিশেষ ধরনের ঋণপত্রও বাজারে সরবরাহ করেন।

বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণ করার যেমন অনেক সুবিধে আছে তেমনি কিছু অসুবিধাও আছে। এই ধরনের ঋণের মাধ্যমে যেমন মহার্ঘ বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা যায় তেমনি এই ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয়, ঋণগ্রহণকারী দেশের কাছে সেই প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা নাও থাকতে পারে। ফলে পুরনো ঋণ পরিশোধের জন্যে বা নিয়মিত সুদ দেবার জন্যে আবার বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে দেশটিকে ঋণের ফাঁদে (Debt Trap) পড়তে হয়।

অনুশীলনী—১

১। সঠিক বাক্যটিকে (✓) চিহ্ন দিন

(ক) সরকার তার সংগৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে দেউলিয়া হয়ে যান। (সঠিক/ভুল)

(খ) সরকারি ঋণপত্রগুলি হস্তান্তরযোগ্য হতে পারে। (সঠিক/ভুল)

(গ) ভারতবর্ষের জাতীয় সঞ্চয় প্রত্যয়পত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়। (সঠিক/ভুল)

(ঘ) ভারতবর্ষের রাজকোষ বিলগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রয় করা হয়। (সঠিক/ভুল)

২। সরকারি ঋণের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঋণের তিনটি পার্থক্যের উদাহরণ দিন।

৩। বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণ নেওয়ার অসুবিধেগুলি ৫০টি শব্দের মধ্যে প্রকাশ করুন।

২.৪ সরকারি ঋণের তাৎপর্য

আধুনিককালে সরকারি আয় ও ব্যয়ের মতো সরকারি ঋণও, সরকারের রাজস্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর সাহায্যে সরকার যে কেবল তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করেন তাই নয় দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

প্রথমত, যেহেতু সরকারকে ঋণ দেওয়া সবচেয়ে নিরাপদ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে সরকারি ঋণপত্রগুলি বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়।

দ্বিতীয়ত, সরকারি ঋণের ফলে দেশের ক্রয়ক্ষমতা সমবসময় হ্রাস পায় না—অনেক সময় বৃদ্ধিও পায়। সরকার যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করেন তখন দেশে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অনেক সময় মূল্যস্তরও বৃদ্ধি পেতে থাকে, অর্থাৎ দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়—বিশেষত যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা থাকবার জন্যে দ্রব্য সামগ্রীর যোগান চাহিতা মতো বৃদ্ধি করা না যায়।

তৃতীয়ত, ক্রমবর্ধমান সরকারি ঋণ দেশের লোকের কাছে বোঝা হয়ে ওঠে, কারণ ঋণের ওপর দেয় সুদটি এবং মূল ঋণটি পরিশোধ করার অর্থ সরকার দেশবাসীর ওপর কর বসিয়ে সংগ্রহ করেন। এর ফলে করদাতাদের কাছ থেকে সম্পদ সরকারি তমসুকের মালিকদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। এর নীট ফল হল অর্থনীতিতে আবশ্যক চাপ ও জটিলতার সৃষ্টি।

চতুর্থত, সরকার যত কম সময়ের জন্যে ঋণ নেন, সুদের হার তত কম হয় এবং কর বসিয়ে সুদ দেবার সরকারি দায় তত কমে যায়। কিন্তু অসুবিধে হল অনেকসময় এই ধরনের ঋণগুলিকে যেকোনও সময় ঋণের মেয়াদ শোধ করার আগেই নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা যায় অর্থাৎ সরকারকে আসলটি পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে সরকারের আর্থিক নীতির স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হতে পারে।

পঞ্চমত, সরকারি ঋণের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে বেসরকারি মূলধনী বাজারে তত টানাটানির সৃষ্টি হবে। কারণ মূলধনী বাজারে যদি খুব বেশি নিষ্ক্রিয় তহবিল না থাকে, তাহলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে অর্থ বেসরকারি মূলধনী বাজারে বা অর্থের বাজারে লগ্নী করতেন, সেই অর্থ দিয়েই সরকারি ঋণপত্র ক্রয় করেন।

ষষ্ঠত, সরকারি ঋণ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঋণ ব্যবস্থাপনের ওপরও সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। কি ধরনের ঋণপত্র মারফত সরকার অর্থ সংগ্রহ করবেন—স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী কি ধরনের সুদ চাওয়া হবে এবং ঋণপত্রগুলি কখন প্রত্যর্পণ করা হবে, এসবই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। যেমন অর্থনৈতিক মন্দার সময় সরকার অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্যে বাকি ঋণগুলি পরিশোধ করে দিতে পারেন।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার সরকারি ঋণের ভার নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও দেয় সুদের সঙ্গে জাতীয় আয়ের অনুপাত যদি ক্রমবর্ধমান হয় তাহলে সেটি একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, কারণ সুদ দেবার জন্যে যে কর আরোপ করার প্রয়োজন হয় তা অর্থনীতির পক্ষে নীট ক্ষতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

অনুশীলনী—১

১। অর্থনীতির ওপর সরকারি ঋণের তিনটি প্রভাব উল্লেখ করুন।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কোন বাক্যটি সঠিক নয়?

(ক) সরকারি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সরকারি মূলধনী বাজারে বিনিয়োগ কমে যেতে পারে।

(খ) অর্থনৈতিক মন্দার সময় সরকারের উচিত পুরনো ঋণগুলি পরিশোধ করা।

(গ) ব্যক্তিগত ঋণের মতো সরকারি ঋণও ঝুঁকিবহুল।

(ঘ) সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিলে দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়।

২.৫ সরকারি ঋণের ভার

আমরা জানি যখন কেউ কোনও ঋণ গ্রহণ করেন তখন ঋণটি যতদিন না পরিশোধ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত (তাকে) ঋণদাতাকে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয় এবং মেয়াদ অন্তে আসলটি ফেরত দিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে সুদ সহ আসল ফেরত দেবার দায়িত্বকেই ঋণের ভার বা বোঝা বলা যেতে পারে। ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে এটি আবশ্যই প্রযোজ্য—ঋণগ্রহণকারীই ঋণের বোঝা বহন করেন। কিন্তু সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটু অন্যরকমের।

প্রথমত, সরকারি ঋণের ভারটি দেশবাসীকেই বহন করতে হয়। তাদের ওপর কর বসিয়ে সরকার ঋণ পরিশোধের দায়টি মেটায়।

দ্বিতীয়ত, সরকারি ঋণের একটি আর্থিক বোঝা ছাড়াও একটি প্রকৃত বোঝা আছে।

এগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সময় আমাদের দেখা দরকার দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগৃহীত ঋণের ভারের সঙ্গে বিদেশ থেকে সংগৃহীত ঋণের ভারের কোনও পার্থক্য আছে কিনা।

২.৫.১ আভ্যন্তরীণ ঋণের ভার

সরকার যখন বন্ড বা ঋণপত্র বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করেন তখন সেই বন্ডের জন্যে দেয় সুদ এবং মুদ্রিত মূল্যটি ফেরত দেবার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তা সরকার সংগ্রহ করেন দেশবাসীর ওপর কর বসিয়ে। এর ফলে দেশের মধ্যে টাকাকড়ির হস্তান্তর ঘটে—করদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে বন্ডের মালিকদের প্রাপ্য অর্থ মেটানো হয়। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে সম্পদের কোন হস্তান্তর হয়—কোনও পরিবর্তন হয় না। বরঞ্চ ঋণের সদব্যবহার হলে নতুন সম্পদ সৃষ্টিও হতে পারে। এই যুক্তিতে বলা হয় আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনও ভার নেই। এই ধরণের ঋণের ক্ষেত্রে দেশবাসীরা নিজেরাই নিজেদের নিকট ঋণী থাকে (We owe it to ourselves)।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যাঁরা বন্ড কিনছেন (অর্থাৎ সরকারকে ঋণ দিচ্ছেন) আর যাঁরা কর দিচ্ছেন (অর্থাৎ সরকারি ঋণ পরিশোধ করছেন), তাঁরা সবাই এক লোক নন। এবং করদাতারা কর দেবার ফলে যে তৃপ্তি হারাচ্ছেন বা বন্ডের মালিকেরা সুদ পেয়ে যে তৃপ্তি লাভ করছে, সেই দুটি পুরোপুরি সমান হবার সম্ভাবনা খুব কম। যদি তৃপ্তি হ্রাসের পরিমাণ তৃপ্তি লাভের পরিমাণের থেকে অধিক হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে সমাজের মঙ্গলসাধন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আভ্যন্তরীণ ঋণের একটি ভার সৃষ্টি হবে।

যদি ধরে নেওয়াও হয় যে যাঁরা বন্ড কিনে সরকারকে ঋণ দিচ্ছেন তাঁরাই সরকারকে ঋণ পরিশোধ করতে সাহায্য করছেন, তাহলেও সরকারি ঋণের একটি ভার থাকবে। কারণ, বন্ডের মালিকেরা মনে করেছিলেন যে বন্ড কেনার ফলে তাঁদের কিছু আর্থিক লাভ হবে, যে লাভ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

অর্থনীতিবিদ Domar এর মতে সরকারি ঋণের ভারকে মাপা উচিত মোট ঋণ ও মোট জাতীয় আয়ের অনুপাতের সাহায্যে। যদি সরকার একদিকে ক্রমশ ঋণ নিতে থাকেন এবং অন্যদিকে জাতীয় আয় মোটামুটি স্থির থাকে তাহলে ঋণ ও জাতীয় আয়ের অনুপাত কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সরকারি ঋণের ভার সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকবে না। কিন্তু মোট জাতীয় আয় সাধারণত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সরকারি ঋণের ভার নাও বৃদ্ধি পেতে পারে।

তিনি দেখিয়েছেন যদি সরকার প্রত্যেক বছর জাতীয় আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং যদি জাতীয় আয় বছর বছর একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে মোট ঋণ ও মোট জাতীয় আয়ের অনুপাতের কোনও পরিবর্তন হবে না—অনুপাতটি একটি নির্দিষ্ট ধ্রুবকের সঙ্গে সমান হবে। অর্থাৎ ঋণের ভারটি অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে। Domar এর বক্তব্য মডেলের সাহায্যে দেখান যায় :

ধরা যাক

R = জাতীয় আয়

D = সরকারি ঋণ

α = মোট জাতীয় আয়ের যে নির্দিষ্ট অংশ সরকার প্রতিবছর ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করেন।

r = জাতীয় আয়ের নির্দিষ্ট বৃদ্ধির হার

জাতীয় আয় বৃদ্ধির সমীকরণ : $R = Roe^{rt}$ ..... (১)

এখানে Ro হল ভিত্তি বছরের জাতীয় আয় এবং t হল যে কোনও সময়সীমা।

সরকারি ঋণের বৃদ্ধির সমীকরণ : $\hat{D} = \frac{dD}{dt} = £.R$ ..... (২)

ভিত্তি বছর শূন্য থেকে যে কোনও বছর t পর্যন্ত মোট সরকারি ঋণের সমীকরণ :

আলোকনের সাহায্যে

$$D = D_0 + \int_0^t \hat{D}\,dt$$

$$= D_0 + \int_0^t \infty R.dt\,\hat{D}\,dt \quad \text{..... সমীকরণ (২) অনুযায়ী}$$

$$= D_0 + \int_0^t \infty R_0 e^{rt}.dt \quad \text{..... সমীকরণ (২) অনুযায়ী}$$

$$= D_0 + \infty.R_0.\frac{e^{rt}-1}{r} \quad \text{..... (৩)}$$

সমীকরণ (৩)-কে R দিয়ে ভাগ করে এবং সমীকরণ (১) এর সাহায্যে

$$\frac{D}{R} = \frac{D_0}{R_0 e^{rt}} + \frac{£R_0}{R_0 e^{rt}.r}.(e^{rt}-1) \quad \text{..... (৪)}$$

এই সমীকরণে সময়সীমা t যদি খুব দীর্ঘ হয় অর্থাৎ যদি $t \to \infty$, তাহলে $\frac{D}{R} = \frac{£}{r}$ ..... (৫)

সমীকরণ (৫) থেকে জানা যাচ্ছে যদি প্রথম বছর to তে বেসরকারি ঋণ Do-র কোনও ভার না থাকে তাহলে পরবর্তীকালে নেওয়া ঋণগুলির (ধরা যাক D_1, D_2 ইত্যাদির) কোনও ভার থাকবে তার কোনও কারণ

নেই যদি আমরা ধরে নিই জাতীয় আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং জাতীয় আর একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ Lerner এর মতে যদি দেশের মধ্যে অব্যবহৃত সম্পদের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্য নেওয়া হয় এবং এই ঘাটতি সরকারি ঋণের সাহায্যে মেটানো হয়, তাহলে দেখতে হবে ঋণের সাহায্যে অর্থের সংস্থান না করলে দেশের কত সম্পদ অব্যবহৃত বা বেকার অবস্থায় পড়ে থাকত। এইভাবে হিসেব করলে ঋণের ভার অনেকটা কম মনে হবে।

আভ্যন্তরীণ ঋণের আর্থিক ভার ছাড়াও একটি প্রকৃত ভার আছে। দেশে যদি সব সময়ই বেশ খানিকটা সরকারি ঋণ থাকে তাহলে তার কিছুটা প্রভাব অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রথমত, আমরা দেখেছি সরকারি ঋণের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সরকারি ঋণপত্রগুলির তারল্য খুব বেশি হওয়ায় সরকারি ঋণপত্রের যোগান বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফাতি হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য সরকারি ঋণপত্রগুলি বিক্রয়ের সময় সুদের হারও বৃদ্ধি পায়। তার ফলে ঋণপত্রের বাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, সরকারি ঋণ যত বৃদ্ধি পাবে, সরকারকে তত বেশি কর সংগ্রহে মন দিতে হবে। এই কর সাধারণত প্রত্যক্ষ কর হওয়ার ফলে শিল্পোদ্যোগীদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করার স্পৃহা হ্রাস পাবে—তাঁরা ঝুঁকিবহুল উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে ইতঃস্তত করবেন। এর ফলে সম্পদের সুষ্ঠু এবং কাম্য ব্যবহারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তৃতীয়ত, সরকারি ঋণের পরিমাণ যদি খুব বেশি হয় তাহলে আয় বণ্টনে অসাম্য বৃদ্ধি পাবে। কারণ সাধারণত সরকারি ঋণপত্রগুলির ক্রেতারা হলেন উচ্চ আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিরা। তাঁরাই এগুলির সবরকম সুবিধে যেমন, নিরাপদ আয়, উচ্চ তারল্য ইত্যাদি ভোগ করেন। অবশ্য Lerner এর মতে বেশি ঋণপত্র বাজারে ছাড়ার জন্যে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায় না, আয় বৈষম্য থাকার জন্যেই উচ্চ আয়ের লোকের হাতে বেশি ঋণপত্র থাকে।

২.৫.২ বৈদেশিক ঋণের ভার

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বৈদেশিক ঋণের আর্থিক ভার আভ্যন্তরীণ ঋণের আর্থিক ভারের থেকে বেশি, কারণ আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সময় দেশের সম্পদের কোনও হানি হয় না—কেবল করদাতাদের কাছ থেকে বন্ডের মালিকদের কাছে সম্পদের হস্তান্তর ঘটে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে যে দেশ ঋণ নিয়েছে, সেই দেশের লোকের ওপর কর বসিয়ে বিদেশের ঋণদাতাদের পাওনা মেটাতে হয়। তার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ দেশ থেকে বিদেশে চলে যায়।

কিন্তু এই যুক্তিতে কিছু ত্রুটি আছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে যখন সরকার ঋণ সংগ্রহ করেন তখন দেশের বেসরকারি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতে বেসরকারি বিনিয়োগ থেকে

যে আয় পাবার সম্ভাবনা থাকে তাও হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু সরকার যদি বিদেশ থেকে ঋণ সংগ্রহ করেন তাহলে সেই ঋণের ফলে আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি পায় এবং দেশের বিনিয়োগযোগ্য সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় না। বরঞ্চ আভ্যন্তরীণ ঋণের তুলনায় বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে বৈদেশিক ঋণের ভার আভ্যন্তরীণ ঋণের ভারের থেকে কম।

অবশ্য ভবিষ্যতে যখন বৈদেশিক ঋণের জন্যে নিয়মিত সুদ দিতে হয় এবং ঋণ পরিশোধ করার সময় উপস্থিত হয়, তখন সরকারকে দেশের অভ্যন্তরে কর বসিয়ে সেই অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। এর ফলে আভ্যন্তরীণ সম্পদের স্থানান্তর হয়েই থাকে। সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে আভ্যন্তরীণ ঋণের ভারের সঙ্গে বৈদেশিক ঋণের ভারের কোনও পার্থক্য নেই।

আভ্যন্তরীণ ঋণের তুলনায় বৈদেশিক ঋণের ভার বেশি না কম তা নিয়ে আলোচনা করার সময় আরো দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথমত, দেখা প্রয়োজন দেশের অভ্যন্তরে যে প্রকৃত সুদের হারে সরকার ঋণ সংগ্রহ করতে পারেন, সেই সুদের হার বিদেশ থেকে সংগৃহীত ঋণের ওপর দেয় প্রকৃত সুদের হারের থেকে বেশি না কম। যদি আভ্যন্তরীণ প্রকৃত সুদের হার বৈদেশিক প্রকৃত সুদের হারের থেকে বেশি হয় তাহলে আভ্যন্তরীণ সরকারি ঋণের ভার বৈদেশিক ঋণের ভারের থেকে বেশি হবে। আর যদি আভ্যন্তরীণ সুদের হার কম হয় তাহলে বৈদেশিক ঋণের ভারটি বেশি হবে। দুটি হার সমান হলে দু'ধরনের ঋণের ভারও একরকম হবারই সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণের জন্য সুদ এবং আসল পরিশোধ করতে হয়। ফলে একদেশের মুদ্রার সঙ্গে আর এক দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। যদি ঋণগ্রহণকারী দেশের মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারটি দেশের পক্ষে প্রতিকূল হয় তাহলে বৈদেশিক ঋণের ভারটিও বেশি হবে। সর্বশেষে মনে রাখা দরকার বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ঋণটি বা ঋণের ওপর দেয় সুদ যে বৈদেশিক মুদ্রায় দিতে হয় তা অনেক সময় সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এর ফলে ঋণগ্রহণকারী দেশকে আগের ঋণ পরিশোধের জন্যে নতুন করে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয় এবং এইভাবে দেশটি ক্রমশ ঋণের ফাঁদে (Debt Trap) আবদ্ধ হয়। এই ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণের প্রকৃত ভার অনেক বেশি।

২.৫.৩ সরকারি ঋণের ভার ও আন্ত-প্রজন্ম সমতা (Burden of Public Debt and Intergeneration Equity)

সরকারি ঋণের ভার নিয়ে আলোচনা করার সময় এটাও দেখা দরকার এই ঋণের ভার কতটা পরবর্তী প্রজন্মের ওপর সরিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সরকার যদি ঋণ নিয়ে মূলধনী খাতে ব্যয় করেন তাহলে তার সুফল পেতে পেতে একটি প্রজন্ম কেটে যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে যাঁরা এই সুফল ভোগ করবেন তাঁরাই যদি ঋণের ভারটি বহন করেন, তাহলে সেটাই হবে যথোপযুক্ত তবে ঋণের ভারের কতটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর পড়বে সে ব্যাপারে অবশ্য অর্থনীতিবিদরা একমত নন।

সাধারণত বলা হয় যে সরকার বন্ড বিক্রয় করে যে ঋণ সংগ্রহ করেন সেই ঋণ পরিশোধ করা হয় অনেকদিন বাদে। সুতরাং সরকারকে কর দিয়ে ঋণ শোধ করার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষের বহন করতে হয় পরবর্তী প্রজন্মকে—সরকার যে সময় ঋণ সংগ্রহ করেন সেই সময় দেশবাসীর উপর ঋণের কোনও ভার থাকে না।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হয় যে ঋণের ভার আদৌ সরিয়ে দেওয়া যাবে কিনা বা কতটা সরিয়ে দেওয়া যাবে, তা নির্ভর করে আসলে সরকারি ঋণের ফলে ভোগব্যয় হ্রাস পাচ্ছে না মূলধন গঠন হ্রাস পাচ্ছে, তার ওপর।

Ricardo, Pigou প্রভৃতি ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রবিদরা মনে করেন যে সরকারকে যাঁরা ঋণ দেন, তাঁরা প্রধানত তাঁদের সঞ্চয় হ্রাস করেই ঋণটি দেন—তাঁদের ভোগ ব্যয়ের কোনও হ্রাস হয় না। বন্ডের মালিক হবার ফলে তাঁরা মনে করেন তাঁদের অবস্থা ভালো হয়েছে এবং তাদের ভোগ ব্যয় হ্রাস করার কোনও প্রয়োজন নেই। এবং যেহেতু ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী সঞ্চয় সবসময় বিনিয়োগের সঙ্গে সমান হয়, সঞ্চয় হ্রাসের অর্থ হল বিনিয়োগ হ্রাস ও ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস। এর ফলে সরকারকে যাঁরা ঋণ দিচ্ছেন তাঁদের সামগ্রিক কল্যাণের কোনও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে না কিন্তু তাঁদের উত্তর পুরুষেরা আগের থেকে কম মূলধন দ্রব্য পাচ্ছেন। এটি অবশ্যই একটি ভার এবং এবং ক্ষেত্র সরকারি ঋণের ভার পরবর্তী প্রজন্মের ওপর সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু যদি ঋণদাতারা তাঁদের ভোগ ব্যয় হ্রাস করে সরকারকে ঋণ দেন তাহলে তাঁদের সামগ্রিক কল্যাণ অবশ্যই বিঘ্নিত হবে কিন্তু তাঁদের বংশধরদের ওপর এই অর্থে ঋণের ভার এসে পড়বে না। তাঁদের ঋণশোধের জন্যে অবশ্যই সরকারকে কর দিতে হবে কিন্তু তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে আগের থেকে বেশি মূলধনী দ্রব্য পাবেন।

অর্থনীতিবিদ Buchanan অবশ্য মনে করেন যে সরকারি ঋণের ভার ভবিষ্যতে দেশবাসীর ওপর সরিয়ে দেওয়া যায়। কারণ সরকারকে যারা ঋণ দেন তাঁরা ইচ্ছাপূর্বকই দেন— সে ভোগ ব্যয় হ্রাস করেই হোক বা সঞ্চয় হ্রাস করেই হোক। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে তাঁদের ওপর কোনও ঋণভার থাকার কথা নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনও এক সময় যখন কর বসিয়ে বন্ডগুলির আসল অর্থ ফেরত দেওয়া হয় তখন বন্ডের মালিকদের আপেক্ষিক অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না—তাঁদের কাছে যে বন্ড ছিল সেগুলি অর্থে রূপান্তরিত হয় মাত্র—কিন্তু কর বসাবার ফলে সেই সময়কার দেশবাসীর ওপর অবশ্যই একটি ভার এসে পড়ে।

অর্থনীতিবিদ Musgrave-এর মতে যদি একটি প্রজন্ম শেষ হবার আগেই পরবর্তী প্রজন্মের শুরু হয় তাহলে আভ্যন্তরীণ সরকারি ঋণের ভার কিছুটা বর্তমান প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের ওপর সরিয়ে দেওয়া সম্ভব।

ধরা যাক প্রথম প্রজন্ম ১ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত অবস্থান করে। দ্বিতীয় প্রজন্ম ২৫ বছর থেকে শুরু করে ৭৫ বছর পর্যন্ত অবস্থান করে। আগে ধরা যাক সরকার ঋণশোধ করবার জন্যে কর রাজস্বের ওপর নির্ভর করে। এই

অবস্থায় প্রথম প্রজন্মের কাছ থেকে প্রথম বছরে একটি সরকারি বাড়ির ব্যয় মেটাবার জন্য সরকার ২০০,০০০ টাকা সংগ্রহ করলেন এবং বাড়িটি ৫০ বছর ধরে কাজে লাগবে। প্রথম প্রজন্ম এই অর্থ দিল তাদের ভোগ ব্যয় হ্রাস করে। কিন্তু ২৫ বছর বাদে, ২৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে যখন দ্বিতীয় প্রজন্ম শুরু হয়ে গেছে তখন সরকার তাদের কাছে থেকে ১০০,০০০ টাকা সংগ্রহ করে প্রথম প্রজন্মের হাতে ফেরত দিলেন। এইভাবে প্রথম প্রজন্ম, প্রথমদিকে সমগ্র ঋণভারটি বহন করলেও পরবর্তী কালে দ্বিতীয় প্রজন্মের ওপর ঋণভারের অর্ধেক অংশ হস্তান্তরিত করতে পারে। মূলধন গঠনের ওপর এই ধরনের হস্তান্তরের কোনও প্রভাব পড়ে না।

মূল কথা হল সরকারি ঋণের হস্তান্তরের বিষয়টি নির্ভর করে সরকার সংগৃহীত ঋণটি কিভাবে ব্যয় করছেন তার ওপর। যদি সরকার ঋণ দিকে মূলধনী খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করেন তাহলে ব্যয়ের সুফলগুলি ভবিষ্যতেও ভোগ করা যাবে। এইক্ষেত্রে সরকারি ঋণের ভারের কিছুটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হলে আর প্রজন্ম সমতা বজায় থাকবে। এইজন্যেই সরকারি খাতে মূলধনী খাতে আয়ব্যয়ের স্বতন্ত্র হিসেব থাকে।

বৈদেশিক সূত্র থেকে পাওয়া ঋণের ক্ষেত্রে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের ওপর সরকারি ঋণের ভার হস্তান্তর করার ব্যাপারটি একটু অন্যরকম। এইক্ষেত্রে প্রথম প্রজন্মের ওপর, বৈদেশিক ঋণের কোনও ভার পড়ে না— তাদের ভোগ ব্যয় হ্রাস করার কোনও প্রয়োজন হয় না। বেসরকারি ক্ষেত্রের সম্পদের কোনও হ্রাস হয় না কারণ সরকার সম্পদ সংগ্রহ করছেন বৈদেশিক সূত্র থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের ওপর এই বৈদেশিক ঋণের ভার পড়ে। এই নয় যে তারা আগের থেকে কম মূলধনী দ্রব্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাচ্ছে— বৈদেশিক ঋণের ভারটি আসে ঋণটির জন্যে প্রয়োজনীয় সুদ দেবার এবং মেয়াদ অন্তে ঋণটি পরিশোধ করার দায় থেকে। বিদেশের ঋণদাতাদের সুদ দেবার জন্যে তাদের সরকারকে কর দিতে হয়। সুতরাং দ্বিতীয় প্রজন্মকে আর 'নিজেদের কাছেই ঋণী' এইভাবে আখ্যায়িত করা যাবে না।

অনুশীলনী—১

১। সঠিক বাক্যটিতে (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) সরকারি বন্ড যাঁরা ক্রয় করেন তারাই সরকারকে ঋণ দেন। (সঠিক/ভুল)

(খ) মোট ঋণ ও মোট জাতীয় আয়ের অনুপাত হ্রাস পেলে ঋণের ভারও হ্রাস পায়। (সঠিক/ভুল)

(গ) ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রবিদরা মনে করেন যে আভ্যন্তরীণ ঋণের ভার পরবর্তী প্রজন্মকে বহন করতে হয়। (সঠিক/ভুল)

(ঘ) সরকারি ঋণের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে শিল্পোদ্যোগীদের কর্মপ্রচেষ্টা তত হ্রাস পাবে। (সঠিক/ভুল)

২। পাঁচটি বাক্যে বলুন কেন বলা হয় যে আভ্যন্তরীণ সরকারি ঋণের কোনও ভার নেই।

৩। বৈদেশিক ঋণ ও আভ্যন্তরীণ ঋণের পার্থক্যগুলি বর্ণনা করুন। (১০০টি শব্দ)

২.৬ সারাংশ

বিভিন্ন সূত্র থেকে সরকারের যে আয় হয় তার থেকে যদি সরকারের ব্যয় বেশি হয় তাহলে সরকারের বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি মেটাবার জন্যে সরকারকে ঋণ নিতে হয়। সরকারি ঋণের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঋণের কিছু পার্থক্য আছে। সরকার যখন দেশবাসীর কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করেন তখন সেই ঋণ বাধ্যতামূলক হতে পারে এবং ঋণ ফেরত দেবার কোনও সময়সীমা নাও থাকতে পারে। ঋণ শোধ না করে সরকারের দেউলিয়া হবার প্রশ্নও ওঠে না।

সরকার দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকারের ঋণপত্র বিক্রয় করে ঋণ সংগ্রহ করেন, ঋণ পেতে কোনও অসুবিধেও হয় না কারণ সরকারকে ঋণ দেওয়া সব সময় নিরাপদ। বিদেশ থেকেও বিভিন্ন বেসরকারি লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সরকার ঋণ নিয়ে থাকেন।

দেশের অর্থনীতির ওপর সরকারি ঋণের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সেইজন্যে ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়।

সরকারি ঋণের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর ভারটি অর্থাৎ ঋণটির জন্যে ঋণদাতাকে দেয় সুদ ও মেয়াদ অন্তে আসলটি ফেরত দেবার দায়টি, সরিয়ে দেওয়া যায়। দেশবাসীর ওপর কর বসিয়ে সেই কর রাজস্ব থেকে সরকার ঋণ পরিশোধ করেন।

বলা হয় আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনও ভার নেই, কারণ এই ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে দেশের সম্পদের কোনও অপচয় হয় না, কেবল সম্পদের হস্তান্তর ঘটে—দেশের লোকের কাছ থেকে কর রাজস্ব সংগ্রহ করে দেশের মধ্যেকার ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করা হয়—দেশের সম্পদ দেশেই থাকে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে দেশের লোকের উপর কর বসিয়ে বিদেশের ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করা হয়, ফলে দেশের সম্পদ হ্রাস পায়।

অর্থনীতিবিদ ডোমার (Domar) দেখিয়েছেন যে সরকার যদি প্রতি বছর জাতীয় আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং জাতীয় আয় যদি একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে সরকারি ঋণের ভারও স্থির থাকে।

সরকার যদি ঋণ নিয়ে মূলধন গঠনে ব্যবহার করেন তাহলে তার সুফল পেতে একটি প্রজন্ম কেটে যেতে পারে। সেইজন্যে সমতার স্বার্থে পরবর্তী প্রজন্ম,—যাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের আমলে নেওয়া ঋণের ফল ভোগ করছেন—তাঁদেরও সরকারি ঋণের ভারটি বহন করা উচিত। তবে সরকারি ঋণের কতটা ভার পরবর্তী প্রজন্মের ওপর সরিয়ে দেওয়া যাবে সে ব্যাপারে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

২.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

ঋণের প্রত্যর্পণ (Refunding of Loans) : একটি ঋণ পরিশোধ করার সময় হলে নতুন আর একটি নতুন ঋণ নেওয়া।

তমসুক (Bond) : যে কোনও ঋণস্বীকারপত্র যার সুদের হারটি (অর্থাৎ আয়) স্থির এবং পূর্বনির্ধারিত।

রাজকোষ বিল (Treasury Bill) : স্বল্পকালীন ঋণ সংগ্রহের সরকারি হাতিয়ার।

ঋণের ফাঁদ (Debt Trap) : একটি পুরনো ঋণ শোধ দেবার জন্যে ক্রমাগত নতুন করে ঋণ নেওয়া যায় ফলে ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। (ক) ভুল (খ) সঠিক (গ) সঠিক (ঘ) সঠিক

২। ২.২

৩। ২.৩

অনুশীলনী—২

১। ২.৪

২। (গ)

অনুশীলনী—৩

১। (ক) সঠিক (খ) সঠিক (গ) সঠিক

২। ২.৫.১

৩। ২.৪

একক ৩ ❐ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব নীতি

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থা কাকে বলে

৩.৩ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থার যৌক্তিকতা

৩.৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় কর ব্যবস্থা

৩.৫ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি ব্যয়

৩.৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় কেন্দ্র-আঞ্চলিক সরকার সম্পর্ক

৩.৬.১ কর রাজস্ব বণ্টন

৩.৬.২ সরকারি অনুদান

৩.৬.৩ কর অধিক্রমণের সমস্যা

৩.৭ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থার সমস্যা

৩.৮ সারাংশ

৩.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৩.১০ উত্তরমালা

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককে আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকারের আয়-ব্যয় নীতি কিভাবে নির্ধারিত হয় তাই নিয়ে আলোচনা করা হবে—

- যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থা কাকে বলে।
- এই ধরণের রাজস্ব নীতির প্রয়োজনীয়তা।
- যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অধঃস্তন অঙ্গ সরকারগুলির মধ্যে কিভাবে রাজস্ব সম্পর্কিত কার্যাবলীর বিভাজন ঘটে।
- এই রাজস্ব নীতি কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

১.১ প্রস্তাবনা

আধুনিককালে অধিকাংশ দেশেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বর্তমান আছে। এই ধরনের রাষ্ট্রে যে সরকার কেন্দ্রে থাকে এবং যে সব অধঃস্তন সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে শাসনক্ষমতা অধিকার করে থাকে, তাদের মধ্যে কার কতটা এক্তিয়ার তা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন হয়। এই এক্তিয়ার কেবল ভৌগোলিকভাবেই নির্দিষ্ট করা হয় না—কার কতটা আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা তাও নির্ধারণ করতে হয়। রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয় করার অধিকারও শাসনক্ষমতার একটি প্রধান অঙ্গ। এই ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সরকারের মধ্যে একটি ক্ষমতার বিভাজন এবং এলাকা নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রটি আসলে একটিই রাষ্ট্র, শাসনের সুবিধে বা অন্য কোনও কারণের জন্যে সমগ্র রাষ্ট্রটিকে কয়েকটি স্বশাসিত ভৌগোলিক এলাকায় ভাগ করা হয়।

বিভিন্ন সরকারের রাজস্ব নীতির মধ্যে সমন্বয় না থাকে—একটি সরকারের রাজস্ব নীতি যদি কেন্দ্রে যে সরকার আছে তার রাজস্ব নীতি বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত অন্য একটি সরকারের রাজস্ব নীতির অনুপূরক না হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব নীতিই শুধু বিপন্ন হবে না, যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে।

সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব নীতি কি হবে তা বিচার করার সময় অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৩.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থা কাকে বলে

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব নীতির অর্থ ব্যাখ্যা করার আগে জানা দরকার যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করবার জন্য সাধারণত যে দু'ধরনের শাসন ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় তার একটি হল এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা, আর একটি হল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটিমাত্র সরকারের হাতে দেশ শাসন করার দায়িত্ব দেওয়া থাকে। যেমন ইংল্যান্ডে; যদিও কাউন্টিগুলির হাতে কিছু কিছু স্থানীয় শাসনক্ষমতা দেওয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে একটিই পার্লামেন্ট, একটিই সরকার আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে একটি সরকারের স্থানে একাধিক সরকার বা বহুমাত্রিক সরকার থাকে। প্রথমত, সমগ্র রাষ্ট্রের জন্যে একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার জন্যে একটি করে আঞ্চলিক সরকার থাকে যাকে প্রাদেশিক সরকার বা রাজ্য সরকারও বলা হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, প্রত্যেক রাজ্যে আবার স্থানীয় ভিত্তিতে কিছু স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান থাকে। ভারতবর্ষে কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত ইত্যাদি এই ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের কাউন্টিগুলির হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন রাজ্য (প্রাদেশিক) সরকার, একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের অন্তর্গত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে যে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তাকেই বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র। ভারতবর্ষ, আমেরিকার, কানাডা প্রভৃতি দেশকে

যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়। ২৮টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আর ৫০টি রাজ্য নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের যেহেতু তিনটি সরকারের হাতেই কিছু না কিছু শাসনক্ষমতা দেওয়া থাকে সেইজন্যে এই ধরনের রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শাসনক্ষমতার সুষ্ঠু বিভাজন করা অর্থাৎ দেশ শাসন করতে গেলে যে সব আইন প্রণয়ন করা এবং যেগুলি কার্যে পরিণত করা প্রয়োজন সেগুলি কতটা করবে কেন্দ্রীয় সরকার আর কতটাই বা করবে রাজ্য সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, তা নির্ধারণ করা। কয়েকটি ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্তে আসা আপেক্ষাকৃত সহজ। যেমন নিরাপত্তার ভার বা বৈদেশিক নীতি স্থির করার দায়িত্ব যে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে, তাতে কোনও দ্বিমত নেই, কিন্তু দেশের প্রয়োজনে যদি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু আইন প্রণয়ন করা দরকার হয়, তাহলে সেই আইন কোন পর্যায়ের সরকার করবে তার কেই বা তা কার্যে রূপান্তরিত করবে সেই ব্যাপারে আগে থেকেই কিছু সিদ্ধান্ত না নিয়ে রাখলে পরে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ক্ষমতার বিভাজন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু অধিকার করে থাকে।

আবার প্রশাসনিক ক্ষমতা বিভাজনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজস্ব কার্যের বিভাজন। যে কোনও স্তরেই সরকার চালাতে গেলে কিছু আয় করা দরকার যা দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানো সম্ভব হয়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটিই সরকার সারা দেশ থেকে কর রাজস্ব সংগ্রহ করে এবং সারা দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয়গুলি করার দায়িত্বে থাকে। অবশ্য ইংল্যান্ডের মতো দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে কিছু কিছু স্থানীয় কর সংগ্রহ করার এবং ব্যয় করার অধিকার আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত।

যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক সরকার থাকায় সব স্তরের সরকারের হাতেই করার বসিয়ে আয় কার ক্ষমতা বা সরকারি ব্যয় করার অধিকার আছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন সারা দেশ থেকে—বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে বা বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন বা বিক্রীত দ্রব্য থেকে—কর রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারে এবং তা দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাতে পারে, তেমনি রাজ্য সরকারও রাজ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে বা রাজ্যে উৎপাদিত বা বিক্রীত দ্রব্য থেকে কর সংগ্রহ করতে পারে রাজ্যের প্রয়োজনে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে এইভাবে স্থানীয় কর বসানো এবং ব্যয় করার অধিকার থাকে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থা বলতে এমন একটি রাজস্ব ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে কর রাজস্ব সংগ্রহ করার ক্ষমতা এবং সরকারি ব্যয় করার অধিকার থাকে।

৩.৩ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থার যৌক্তিকতা

আগের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় করার ব্যাপারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ঘটে। রাজস্ব নীতির দিক থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে। সেগুলি হল—

১। আমরা জানি রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য হল মূলত তিনটি, প্রথমত, সামাজিক কল্যাণের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে কিছু কিছু গণভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন করা, দ্বিতীয়ত, আয়ের পুনর্বণ্টন দ্বারা আয় বণ্টনে একটি কাম্য সমতা আনা এবং তৃতীয়ত, দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে শেষের দুটি হল সমগ্র দেশের দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং এই দুটির দায়িত্ব একাধিক সরকারের হাতে না থেকে যদি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে তাহলে দেশের পক্ষে সেটি হবে মঙ্গলজনক। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই দুটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট মারফত যতটা কার্যকর আয়-ব্যয় নীতি অবলম্বন করা সম্ভব, অন্যান্য আঞ্চলিক সরকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। অন্যদিকে রাজস্ব নীতির প্রথম লক্ষ্যটি পূরণ করার দায়িত্ব আঞ্চলিক সরকারগুলির হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ গণভোগ্য দ্রব্যগুলির যোগান এমনভাবে হওয়া দরকার যাতে সেগুলি ভোগকারীদের পছন্দ মতো হয় এবং তাদের প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু সারা দেশে ভোগকারীদের পছন্দ বা প্রয়োজন একই রকমের হয় না। সেইজন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে এগুলি সরবরাহ করলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ছাড়াও, ভোগকারীরা তাদের পছন্দ মতো দ্রব্য বা পরিষেবা পায়। অবশ্য যে সব গণভোগ্য দ্রব্য বা পরিষেবা সমস্ত দেশের প্রয়োজনে লাগে সেগুলি সরবরাহ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যেমন দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা বা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই দায়িত্ব।

সুতরাং সামগ্রিক রাজস্ব নীতির সফল রূপায়ণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থা থাকা দরকার।

২। অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পেছনে কিছু ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক কারণ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যেসব অঞ্চল বা রাজ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, তারা হয়তো আগে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা বেশ কিছু সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করত। যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবার সময় তাদের অধিকাংশ সার্বভৌম ক্ষমতা বিসর্জন দিতে হয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষমতা হয়তো তাদের হাতে রয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবার পূর্বশর্ত অনুযায়ী। যেমন যুক্তরাষ্ট্রটি গঠিত হবার পরও তারা তাদের আগেকার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কিছু কিছু কর রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারে এবং পছন্দ মতো ব্যয় করতে পারে। এই ধরণের রাজস্ব ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্বের পক্ষে প্রয়োজন।

৩। যে কোনও সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যে রূপান্তরিত করার পূর্বে তার একটি ব্যয়-সুবিধে বিশ্লেষণ (Cost-Benefit Analysis) করা প্রয়োজন। রাজস্ব সম্পর্কিত যে সব সরকারি সিদ্ধান্ত প্রধানত কোনও রাজ্য বা কোনও বিশেষ অঞ্চলের জন্যে ভাবা হয়, সেই সিদ্ধান্ত নেবার ভার সেই রাজ্য বা সেই অঞ্চলের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত; কারণ তারাই সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারবে সিদ্ধান্তটি কার্যে রূপান্তরিত করার জন্য কতটা ব্যয় হবে এবং তাদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার কতটা উপকার হবে।

৪। রাজস্ব সংগ্রহের এবং সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে তার ফলে, রাজ্য সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সরকার নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় রাজস্ব নিয়ে নানারকম কর বসিয়ে এবং

সরকারি ব্যয় করে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে, যার ফলে সমগ্র দেশের রাজস্ব নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

অনুশীলনী—১

১। সঠিক বাক্যটিতে (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) ভারতবর্ষে পঞ্চায়েতকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। (সঠিক/ভুল)

(খ) রাজস্ব ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ না হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হবে না। (সঠিক/ভুল)

(গ) যুক্তরাষ্ট্রে কোন পর্যায়ের সরকার কি ধরনের আইন প্রণয়ন করবে সেই ব্যাপারে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। (সঠিক/ভুল)

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম স্থানীয় স্বায়ত্তমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে কররাজস্ব সংগ্রহ করার ক্ষমতা এবং সরকারি ব্যয় করার অধিকার থাকে। (সঠিক/ভুল)

২। ১০০টি শব্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩.৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় কর ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থা যে তিনটি মূল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে প্রধান হল কর ব্যবস্থা। আর দুটি হল সরকারি ব্যয় এবং কেন্দ্র-আঞ্চলিক সরকার সম্পর্ক।

যুক্তরাষ্ট্রে যে তিন ধরনের সরকার থাকে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কর বসিয়ে আয় করার ক্ষমতা আছে। কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশ থেকে কেন্দ্রীয় কর মারফত (কর বসিয়ে) রাজস্ব সংগ্রহ করে, রাজ্য সরকার রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকা থেকে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা থেকে কর সংগ্রহ করতে পারে।

এখানে লক্ষণীয় যে বিভিন্ন স্তরের সরকারের কর সংগ্রহের এলাকা নির্দিষ্ট করা থাকলেও, কোন সরকার কি কর বসাবে সে ব্যাপারে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এই ব্যাপারে কোনও কোনও যুক্তরাষ্ট্রের দেশের সংবিধান বিভিন্ন সরকারের কর বসাবার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিতে পারে, আবার অনেক যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যাপারে প্রচলিত প্রথা মানা হতে পারে। আমেরিকার মতো যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েই বিভিন্ন হারে একই ব্যক্তির ওপর আয়কর বসিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ করে। আবার ভারতবর্ষের মতো যুক্তরাষ্ট্রে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারেরই আয়কর মারফত রাজস্ব সংগ্রহ করার অধিকার আছে।

আবার অনেক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েই একই দ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক বা বিক্রয় কর বসাতে পারে। রাজ্য পর্যায়ে করের ক্ষেত্রে দ্রব্যটি রাজ্যের মধ্যে উৎপন্ন হলে বা ক্রয়-বিক্রয় হলে তবেই রাজ্য উৎপাদন শুল্ক বা বিক্রয় করের আওতায় আসবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত তাদের এলাকায় অধিবাসীদের বিভিন্ন পরিষেবা দেবার জন্য যে ব্যয় করে সেই ব্যয় মেটাবার জন্য কিছু কর বসিয়ে থাকে; যেমন জল কর। এছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তি কর আদায় করার দায়িত্ব এইসব প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কর ব্যবস্থার কতকগুলি কাম্য বৈশিষ্ট্য হল (i) আঞ্চলিক কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের যে ব্যয় হয় তা যেন জাতীয় স্তরে ঐ একই কর সংগ্রহের খরচের থেকে বেশি না হয়। (ii) সরকারি ব্যয়ের ফলে যে এলাকা উপকৃত হয়, সেই এলাকার বাসিন্দারাই ঐ ব্যয় মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় কর দেবে। (iii) যে সব করের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পৃথকীকরণ করা সম্ভব নয় সেইসব কর কেন্দ্রীয় স্তরেই সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন একটি কোম্পানির দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা অফিস থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ঐ কোম্পানির দেয় কর (যেমন 'কোম্পানি কর') কেন্দ্রীয় সরকারেরই সংগ্রহ করাই বাঞ্ছনীয়।

৩.৫ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি ব্যয়

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় দ্বিতীয় ভিত্তি হল সরকারি ব্যয়ের বিভাজন। যুক্তরাষ্ট্রে যে তিন ধরনের সরকার থাকে তাদের প্রত্যেককেই কিছু সরকারি ব্যয় করতে হয়। এই ব্যয় করার প্রয়োজন হয় মূলত তাদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার ধরাবাঁধা শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্যে এবং কিছু ব্যয় দ্রব্য বা পরিষেবা উৎপাদন করার জন্যে। বলা বাহুল্য কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত সরকারের ব্যয় রাজ্য সরকারের ব্যয়ের থেকে অনেক বেশি হয়। আবার রাজ্য সরকারের ব্যয় রাজ্যের অন্তর্গত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ের থেকে বেশি হয়।

মনে রাখা দরকার আঞ্চলিক সরকারগুলি একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন সরকার এবং তারা কেন্দ্রীয় সরকার মারফত একটি পারস্পরিক যোগসূত্রে আবদ্ধ। সেই জন্যে বিভিন্ন স্তরের সরকারের ব্যয়ের পরিধি অর্থাৎ কোন সরকার কি ধরনের ব্যয় করতে পারবে, তা আগে থেকে চিহ্নিত করে রাখা প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থার যৌক্তিকতা আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রধানত দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আয়ের পুনর্বণ্টনের দায়িত্ব থাকা উচিত। সুতরাং এই তিনটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে যে ধরনের সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন এবং যে ধরনের সরকারি ব্যয় করা দরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের সেগুলি করা প্রয়োজন। যেমন সারা দেশে আয়ের বণ্টনে সমতা আনার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চবিত্তদের ওপর উচ্চহারে কর বসিয়ে সেই কর রাজস্ব অল্প আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপকারের জন্য ব্যয় করতে পারে। অথবা বেকার সমস্যা দূর করার জন্যে বা উৎপাদন বৃদ্ধি করে মূল্য স্তরে স্থিরতা আনার জন্যে সরকারি বিনিয়োগে অর্থ ব্যয় করতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আয়বৈষম্য হ্রাস করা বা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করার মতো উদ্দেশ্য পূরণ করার মতো রাজস্ব নীতি গ্রহণ আঞ্চলিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি কোনও রাজ্য সরকার ধনীদের ওপর

কর বসিয়ে সেই কর রাজস্ব গরীবদের উপকারের জন্যে ব্যয় করতে শুরু করে তাহলে কিন্তু ঐ রাজ্যে আয়বৈষম্য হ্রাস পাবে না— যেটি ঘটবে তা হল ঐ অঞ্চল থেকে ধনীরা অন্য রাজ্যে সরে যাবে এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে ঐ রাজ্যে গরীবদের অনুপ্রবেশ ঘটবে। ঠিক একইভাবে নিজের রাজ্যে বেকার সমস্যা সমাধান করার মতো আর্থিক সামর্থ্য বা মূল্যস্ফীতি রোধ করার মতো ক্ষমতা ঐ রাজ্যে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

কিন্তু রাজস্ব নীতির তৃতীয় উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগে সামাজিক ও গণভোগ্য দ্রব্য (Public Goods) উৎপাদন, সেট পূরণের দায়িত্ব থাকা উচিত আঞ্চলিক সরকারের হাতে। এর পেছনে একটি কারণ আছে। সরকারি ব্যয়ে গণভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের প্রাথমিক শর্ত হল, ব্যয়টি হওয়া উচিত উপকৃত ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী। যারা বা যে এলাকা সরকারি ব্যয় থেকে কোনও উপকার পাবে, সরকারের উচিত তাদের জন্যে বা সেই এলাকার জন্যে দ্রব্য বা পরিষেবা সরবরাহ করা। এর ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন হবে।

অধিকাংশ গণভোগ্য দ্রব্য (যেগুলি সবাই ভোগ করতে পারে) থেকে যে উপযোগ পাওয়া যায় তা আঞ্চলিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। যেমন অগ্নিনির্বাপণের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া বা শহরাঞ্চলে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যাবার জন্যে দ্রুত যানবাহনের ব্যবস্থা করা বা গ্রামে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা বা পুকুর পরিষ্কার করা ইত্যাদি। এই ধরনের সরকারি ব্যয় করার দায়িত্ব থাকা উচিত আঞ্চলিক সরকারের হাতে অর্থাৎ এইগুলি করবে হয় রাজ্য সরকার না হয় পঞ্চায়েত বা কর্পোরেশন। আবার এমন কিছু গণভোগ্য দ্রব্য আছে যা সারা দেশের উপকারে লাগে। যেমন আমরা আগেই দেখেছি দেশের প্রতিরক্ষা, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের জন্যে রাস্তাঘাট বা রেলপথ নির্মাণ। এইসব দ্রব্য বা পরিষেবা উৎপাদনের সুফল সারা দেশের জনসাধারণই ভোগ করে। সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকা উচিত।

সুতরাং গণভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে সরকারি ব্যয়ের বিভাজনের সাধারণ নিয়ম হল যদি সরকারি ব্যয়ের উপযোগ ক্ষুদ্র এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেই সরকারি ব্যয় করবে আঞ্চলিক বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান আর ব্যয়জনিত উপকৃত এলাকা যদি সমগ্র দেশে বিস্তৃত থাকে তাহলে সেই ব্যয় করবে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মেরও কিছু ব্যতিক্রম আছে।

প্রথমত, সরকারি কার্যাবলীর ফলে কারা কারা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হচ্ছে তা অনেক সময় ঠিক করা যায় না। কারণ অনেক সময়ে সরকারি ব্যবস্থা যাদের কথা ভেবে নেওয়া হয়, ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তারা তো উপকৃত হয়ই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য এলাকাও উপকৃত হয়। এই ধরনের উপকারকে বলা হয় ভৌগোলিক বাহ্যিক সুবিধে (Geographic spillover)। যেমন সরকার যদি কোনও একটি গ্রাম বা কোনও একটি রাজ্যে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের জন্য বা স্কুল-কলেজ স্থাপনের জন্যে ব্যবস্থা নেন, তাহলে এর ফলে আশেপাশের অনেক এলাকাই উপকৃত হবে। সুতরাং এইসব কার্যাবলীর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারেরই করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু বা পরিষেবা বৃহদায়তনে না করলে ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধে পাওয়া যায় না, যেমন ধরা যাক কয়েকটি রাজ্যে বিদ্যুতের অভাব আছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্য যদি আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা করে তাহলে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি পড়বে। কিন্তু কেন্দ্রীয় উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হলে, বৃহদায়তনে উৎপাদন করা সম্ভব হবে এবং একক প্রতি উৎপাদন ব্যয়ও কম পড়বে। রাজ্যবাসীরা অল্প দামে বিদ্যুৎ পেতে পারবেন।

তৃতীয়ত, আগেই আমরা দেখেছি, কেন যে কোনও একটি রাজ্যের পক্ষে আয় বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব নয়। ঠিক একইভাবে এলাকাভিত্তিক উপযোগের ভিত্তিতে যদি কোনও আঞ্চলিক সরকার কিছু সরকারি ব্যয় করেন যার ফলে এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হয় তাহলে ঐ এলাকায় পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি থেকে অনেক লোকের অনুপ্রবেশ ঘটবে, সরকার কর্তৃক সৃষ্ট সুবিধেগুলি ভোগ করার জন্যে। এর ফলে ঐ এলাকায় জনসমাবেশ বৃদ্ধি পেয়ে, অপরাধ ও জনস্ফীতির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হবে। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে এসে সব কয়টি এলাকার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে।

অনুশীলনী—১

১। সঠিক বাক্যটিতে (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) পরিষেবার সরবরাহ বৃহদায়তনে করা উচিত। (সঠিক/ভুল)

(খ) সাধারণত গণভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী হওয়া উচিত। (সঠিক/ভুল)

(গ) কোনও একটি রাজ্যের একার পক্ষে আয় বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব নয়। (সঠিক/ভুল)

(ঘ) যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েই একই প্রকার কর দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারেন। (সঠিক/ভুল)

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর ব্যবস্থার কি ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। (পাঁচটি বাক্যে লিখুন)

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কি কি ব্যয় করার দায়িত্ব থাকা উচিত? (পাঁচটি বাক্যে লিখুন)

৩.৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় : কেন্দ্র-আঞ্চলিক সরকার সম্পর্ক

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থার তৃতীয় ভিত্তি হল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন স্তরের সরকারের মধ্যে রাজস্বভিত্তিক আর্থিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক, বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারের সম্পর্ক কি রূপ নেবে তা অনেকটা নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতির ওপর। যেমন কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র যদি একজোট হয়ে একটি রাষ্ট্রজোট (Confederation) তৈরি করে বা একটি বাণিজ্য জোট গঠন করে তবে এদের মধ্যে রাজস্ব নীতি নিয়ে কোনও জটিলতার সৃষ্টি হয় না। যেমন ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি ঠিক করতে পারে ইউনিয়নের

বাইরে থেকে আমদানী করা যে কোনও দ্রব্যের ওপর একই হারে আমদানি শুল্ক বসানো হবে। এখানে প্রত্যেক রাষ্ট্র যে কর রাজস্ব আয় করে তার পুরোটাই নিজেরা ভোগ করে। কিন্তু যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কে অনেক বাধ্যবাধকতা থাকে এবং যেখানে যুক্তরাষ্ট্রটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রাজ্য সরকারের রাজস্বকে ভিত্তি করে ঘনিষ্ঠ, আর্থিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরম্ভ করে রাজ্য সরকার এবং স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানেরই বিভিন্ন কর বসিয়ে রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিকমূলক যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষে অবস্থান করার ফলে, এই সরকার সারা দেশে বসবাসকারী লোকদের কাছ থেকে বা উৎপাদিত দ্রব্য থেকে কর রাজস্ব আদায় করতে পারেন। কেবল তাই নয়, আমদানি শুল্ক বসাবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারেরই থাকে। তাছাড়া অন্যান্য নানা সূত্র থেকেও কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন, যেমন বৈদেশিক ঋণ, ঘাটতি ব্যয় ইত্যাদি। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক বেশি শক্তিশালী। সেই তুলনায় রাজ্য সরকারের কর রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা অনেক সীমিত। আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সামান্য কয়েকটি কর বসিয়ে রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা থাকে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্নভাবে রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি মেটাতে হয় এবং রাজ্য সরকারকেও রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আয়-ব্যয়ের ঘাটতি মেটাবার দায়িত্ব নিতে হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে রাজ্য সরকারের রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করেন তা নিয়ে আলোচনা করার আগে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় যে দুটি প্রধান সমস্যা দেখা দেয় তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এগুলি হল (ক) রাজস্ব ব্যবস্থায় উল্লম্ব অসমতা (খ) রাজস্ব ব্যবস্থায় আনুভূমিক অসমতা।

(ক) **রাজস্ব ব্যবস্থায় উল্লম্ব অসমতা** (Vertical Fiscal Imbalance)

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে যে সব আঞ্চলিক সরকার থাকে তাদের অধিকাংশেরই আঞ্চলিক প্রয়োজনে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবহনের জন্যে কিছু সরকারি ব্যয় করতেই হয়। সেই তুলনায় তাদের কর রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বেশি হয় না। প্রথমত, আমরা দেখেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কর বসাবার এক্তিয়ার এবং তারা কি কি কর বসাতে পারবে তা আগেই বলে দেওয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে পেছিয়ে থাকার জন্যে তারা কর রাজস্ব বেশি সংগ্রহ করতে পারে না। তৃতীয়ত, প্রশাসনিক দুর্বলতা বা অদক্ষতার জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যতটা কর সংগ্রহ করা সম্ভব তাও তারা করতে পারে না। চতুর্থত, কোনও আঞ্চলিক সরকার এককভাবে নিজের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় নতুন কর বসাতে বা কর বৃদ্ধি করতে পারেন না। কারণ এর ফলে ঐ রাজ্য থেকে শ্রম ও মূলধন অন্যত্র চলে যেতে পারে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে। ফলে এইসব সরকারের সবসময়ই আয়-ব্যয়ের মধ্যে একটা অসমতা দেখা দেয়।

বিভিন্ন স্তরের সরকারের ব্যয় করার বাধ্যবাধকতার তুলনায় কর রাজস্ব সংগ্রহের সীমিত ক্ষমতাকেই বলা হয় রাজস্বের উল্লম্ব অসমতা।

আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের কর বসাবার এবং কর রাজস্ব সংগ্রহ করার ক্ষমতাও অনেক বেশি। যেমন এই সরকার প্রগতিশীল আয়কর বসাতে পারে যার সাহায্যে কর ব্যবস্থাকে অনেকটা আয়-স্থিতিস্থাপক করে তোলা যায়। ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কেন্দ্রীয় স্তরের সরকারের রাজস্বে এই ধরনের কোনও অসমতা থাকার কথা নয়।

(খ) রাজস্ব ব্যবস্থায় আনুভূমিক অসমতা (Horizontal Fiscal Imbalance)

যে সব সরকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় তাদের সবাইয়ের কর রাজস্ব সংগ্রহ করার ক্ষমতা সমান হয় না। যে সব রাজ্য কৃষ্টি-শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত হওয়ার জন্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত, তাদের কর রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা অনেক বেশি। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর অঞ্চলগুলির কর রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা সেই তুলনায় অনেক কম। ফলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মাথাপিছু আয়, সম্পদ বা বিক্রয়—যার ভিত্তিতে কর রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়—সমান হয় না। ফলে কিছু রাজ্যের প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় করার ক্ষমতা আর সব রাজ্যের থেকে কম হয়। যেমন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ইত্যাদি রাজ্য, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের তুলনায় উন্নত হওয়ার ফলে এদের কর রাজস্ব থেকে আয় করার ক্ষমতাও অনেক বেশি। ফলে এরা অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি সরকারি ব্যয়ও করতে পারে।

রাজ্যস্তরে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজস্বের ক্ষেত্রে যে অসমতার সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় রাজস্বের আনুভূমিক অসমতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই দু'ধরনের সমস্যা রাজ্য সরকারের সঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও দেখা দিতে পারে। এই দুই ধরনের সমস্যাই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ব্যয়ের মধ্যে সমতার অভাব দেখা দেয় এবং একই স্তরের বিভিন্ন সরকারের মধ্যে, ধরা যাক বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অথবা একই রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুব বেশি আয়বৈষম্য থাকে তাহলে যে ক্ষোভ বা অসন্তোষের সৃষ্টি হয় তাতে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্বই বিঘ্নিত হতে পারে। সেইজন্য সব কেন্দ্রীয় সরকারই এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য রাজস্ব সম্পর্কিত কিছু কিছু ব্যবস্থা নেন। বলা যেতে পারে এটি হল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় সরকার যে যে উপায়ে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে রাজস্ব সম্পর্কিত বৈষম্য হ্রাসের চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে প্রধান দুটি হল কর রাজস্বের বণ্টন এবং সরকারি অনুদান।

৩.৬.১ কর রাজস্ব বণ্টন

আমরা আগে দেখেছি কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত সরকার সারা দেশ থেকে কর রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারেন, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিগত আয়কর বা কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক থেকে। এই কর রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকার নিজের মধ্যে রেখে অবশিষ্ট অংশ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন। একেই বলা হয় রাজস্বের বণ্টন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল রাজ্য সরকারগুলির বা আঞ্চলিক সরকারগুলির রাজস্ব সংগ্রহের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় কর রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে অনেকগুলি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারকে ঠিক করতে হবে কেবল কয়েকটিমাত্র কেন্দ্রীয় কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বই আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে, না মোট কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের একটি অংশ আঞ্চলিক সরকারগুলির জন্য বরাদ্দ করে রাখা হবে। দ্বিতীয়ত, ঠিক করতে হবে কর রাজস্বে কেন্দ্রের অংশ এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সরকারের অংশ কিভাবে নির্দিষ্ট করা হবে। তৃতীয়ত, বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা কেন্দ্রীয় রাজস্ব কিভাবে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে তা ঠিক করা অর্থাৎ একটি আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে কি পরিমাণ কর রাজস্বের অংশ পাবে তা হিসেব করাও একটি সমস্যা।

অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম দুটি সমস্যার সমাধানের জন্যে নির্দিষ্ট কোনও সূত্র অবলম্বন করা হয় না। কিছু কিছু কেন্দ্রীয় কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের (বিশেষত আয় কর ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের) একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকার নিজের জন্যে রাখেন এবং অবশিষ্ট অংশ রাজ্যগুলির জন্যে রেখে দেন—এর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে রাজ্যগুলির আয়-ব্যয়ের ঘাটতি মেটানো অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্বের উল্লম্ব অসমতা দূর করা। তৃতীয় প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অর্থাৎ কোন রাজ্যের কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের কতটা অংশ প্রাপ্ত, তা নির্ধারণ করার সময় অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করা হয়। এদের মধ্যে প্রথম হল জনসংখ্যা—যে রাজ্য যত জনবহুল তার কেন্দ্রীয় ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তাও তত বেশি, সেই রাজ্যের প্রাপ্য অংশের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে বেশি হবে। দ্বিতীয়ত, রাজ্য থেকে সংগৃহীত রাজস্বকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়—যেমন যে রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় আয়কর বেশি সংগৃহীত হয়, সেই রাজ্যটি স্বভাবতই কেন্দ্র সংগৃহীত আয়করের একটু বেশি অংশ পাবার আশা করতে পারে। ত-তৃতীয়ত, কর রাজস্বের বণ্টনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ আন্ত-রাজ্য ক্ষেত্রে অসমতা দূর করার কথা মনে রাখলে কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের তুলনামূলকভাবে বেশি অংশ পাওয়া উচিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে অনগ্রসর রাজ্যগুলির। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার যখন এক একটি রাজ্যের কর রাজস্বের প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করেন তখন এই তিনটি বিষয়ের উপর যথাযথ গুরুত্ব না দিলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজস্বের ক্ষেত্রে অসাম্য দূর হবে না।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুযায়ী সরকার প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি অর্থ কমিশন গঠন করেন যার প্রধান কাজ হল কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের বণ্টনের পদ্ধতি নিয়ে নির্দিষ্ট সুপারিশ করা। এই

কমিশনের সুপারিশ পাঁচ বছরের জন্য কার্যকর থাকে। যেমন অর্থ কমিশনের (যার সুপারিশের মেয়াদ ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছিল) সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ২৯ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের জন্যে রেখে দেবে। এই রাজস্ব বণ্টনের সময় অবশ্য রাজ্যের জনসংখ্যা, কর আদায়ের প্রচেষ্টা (Tax Effort) ও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় রাজ্যটি আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে কতটা পিছিয়ে আছে তাও বিবেচনা করতে হবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কর রাজস্ব বণ্টন অত সমস্যার সৃষ্টি করে না। কারণ ওখানে রাজ্যগুলিকে নিজেদের প্রয়োজন মতো বিভিন্ন রকমের কর বসাবার অবাধ অধিকার দেওয়া আছে। তাছাড়া ফেডারেল সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে এবং রাজ্য সরকার রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অনুদান দিয়ে থাকে।

সরকারি অনুদান নিয়ে আলোচনা করার আগে কর বিভাজনের একটি মূল্যায়ন করা দরকার। এ কথা অনস্বীকার্য যে কর বিভাজনের ফলে রাজস্ব ব্যবস্থায় কাম্য বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব হয় এবং রাজ্যগুলির পক্ষে তাদের সামাজিক দায় পালন করবার মতো সরকারি ব্যয় করা সম্ভব হয় এবং অনাবশ্যক কর না বসিয়ে তারা তাদের রাজস্বের ঘাটতি মেটাতে পারে। কিন্তু এই ধরনের কর ব্যবস্থায় কিছু অসুবিধেও আছে।

প্রথমত, বলা হয় অনেক রাজ্য সরকারের নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন রকম কর বসিয়ে বা প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত কর রাজস্ব সংগ্রহ করার ক্ষমতা থাকলেও তারা সেইরকম কোনও উদ্যোগ নেন না, কারণ তাঁরা জানেন তাঁদের রাজস্ব ঘাটতি কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের অংশ দিয়ে মেটানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত কর রাজস্বের অংশ দিয়ে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যয় না মিটিয়ে, অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ে খরচ করতে পারেন অথবা নিজেদের ব্যয় কমিয়ে দিতে পারেন।

তৃতীয়ত, বলা হয়ে থাকে নিজেদের উপার্জিত আয় খরচ করার সময় রাজ্য সরকারগুলি যতটা সচেতন থাকেন, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত আয় খরচ করার ব্যাপারে ততটা সচেতন নাও থাকতে পারেন।

কর রাজস্বের এই সমস্যাগুলির কিছুটা সমাধান করা যায় সরকারি অনুদানের সাহায্যে।

৩.৬.২ সরকারি অনুদান

অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রে অবস্থিত উচ্চতর সরকার, অধস্তন আঞ্চলিক সরকারকে বিভিন্ন ধরনের অর্থসাহায্য দিয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি হল কর রাজস্ব বণ্টন, যা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই বণ্টন

পদ্ধতিতে সাধারণত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটি অংশ আবার তাদের মধ্যেই বণ্টন করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থার মূল সমস্যা—রাজ্যগুলির নিজেদের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি মেটানো এবং রাজস্বের ক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্য অসমতা দূর করা—এ দুটির সম্পূর্ণ মোকাবিলা করা যায় না। সেই জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে অর্থসাহায্য বা অনুদান দিয়ে থাকে। এই অনুদানের একটি সুবিধে হল এটিকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে দেওয়া যায়।

সরকারি অনুদানের সম্ভাব্য শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করার আগে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারকে যে অনুদান দিয়ে থাকেন তার উদ্দেশ্যগুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এগুলি হল—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের সংগৃহীত রাজস্বের কিছু অংশ রাজ্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে হস্তান্তরিত করা;

(খ) বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মাথাপিছু আয়ে যে বৈষম্য আছে তা দূর করা;

(গ) রাজ্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে একই দামে সামগ্রিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে সরকারি দ্রব্য (বা সামাজিক দ্রব্য) সরবরাহ করতে পারেন তার দিকে লক্ষ্য রাখা;

(ঘ) কোনও বিশেষ অঞ্চলে কোনও বিশেষ ধরনের পরিষেবার প্রয়োজন হলে সেই অঞ্চলকে ঐ পরিষেবার যোগান দিতে সাহায্য করা;

(ঙ) কোনও একটি অঞ্চলে সামাজিক দ্রব্য বা পরিষেবার ব্যবস্থা করার ফলে অন্যান্য অঞ্চলের যে বাহ্যিক সুবিধে বা অসুবিধে হয়, অনুদান দেবার সময় সেগুলি বিবেচনা করা।

এগুলির মধ্যে প্রথম দুটি উদ্দেশ্য অবশ্যই কর রাজস্ব বণ্টনের মাধ্যমে পূরণ করা যায়। বিশেষত যখন রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ করা কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটি অংশ, তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তখন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ কতটা হয়েছে সেটি বিবেচনা করা হয়। এর জন্যে রাজ্যের মাথাপিছু আয়ের ব্যস্ত অনুপাত (inverse rates of per capita income) দিয়ে একটি সূচক তৈরি করা হয়। বলা বাহুল্য পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি কর রাজস্বের তুলনামূলকভাবে বেশি অংশ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

তৃতীয় উদ্দেশ্যের অর্থ হল কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত সরকার সবসময়ই চায় যেন সারা দেশেই একান্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবাগুলি পাওয়া যায়। যেমন সব রাজ্যেই যেন শিক্ষা লাভের সুযোগ-সুবিধে থাকে, চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে এবং জনজীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় পানীয় জলের সরবরাহ, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ইত্যাদিরও ব্যবস্থা থাকে। এবং এইসব সরকারি পরিষেবা যেন সব রাজ্যের লোকেরা একইরকমভাবে ভোগ করতে পারেন।

চতুর্থ উদ্দেশ্যের অর্থ হল যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রটি অনেকগুলি অঞ্চল বা রাজ্য নিয়ে গঠিত, সব জায়গাকার সমস্যা একইরকম নাও হতে পারে। সেইজন্যে কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলে হয়তো কোনও বিশেষ ধরনের সরকারি প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যেমন ভারতবর্ষে উড়িষ্যা বা বিহার প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। সুতরাং এখানে বিহার ও উড়িষ্যা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে শিক্ষার প্রসার বাবদ কেরালার থেকে অধিক আর্থিক অনুদান আশা করতে পারি।

পঞ্চম উদ্দেশ্যটি বোঝবার আগে বাহ্যিক সুবিধে বা অসুবিধে বলতে কী বোঝানো হয় তা জানা দরকার। ধরা যাক কোনও একটি রাজ্য সরকার নিজের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় বনসম্পদ রক্ষা করার জন্যে ব্যবস্থা নিলেন। এর ফলে পাশের রাজ্যে বন্যা হবার সম্ভাবনা কমে গেল। প্রতিবেশী রাজ্যটির যে উপরকার হল তাকে বাহ্যিক সুবিধে বলা যেতে পারে। আবার কোনও একটি রাজ্য যদি নিজের শহর এলাকায় বস্তির গড়ে ওঠা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে পাশের রাজ্যে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আবার আমেরিকার মতো যুক্তরাষ্ট্রে যদি কোনও একটি রাজ্যে স্কুলজেলাগুলি (School Districts) সরকারি আনুকূল্যে ভালোভাবে গড়ে ওঠে তাহলে অন্যান্য রাজ্য থেকে, নিজেদের সন্তানদের ভালো শিক্ষার জন্য, ঐ রাজ্যে অনেক লোকের অনুপ্রবেশ ঘটবে, ফলে রাজ্যটির অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। এই ঘটনা ঘটত না যদি অন্য রাজ্যেও ভালো শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকতো। এই যে একটি রাজ্যের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফলাফল অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে তাকে আমরা বাহ্যিক সুবিধে অসুবিধে বলতে পারি (Externalities বা Spillovers)। কেন্দ্রীয় অনুদান দেবার সময় এই ফলাফলগুলি মনে রাখতে হয়। যেমন কোনও রাজ্যে শিল্পগঠনজনিত দূষণের ফলে যদি শুধু ঐ রাজ্যেরই নয় প্রতিবেশী রাজ্যগুলিরও অসুবিধে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সব কটি রাজ্যকেই দূষণরোধ করবার জন্যে অর্থ সাহায্য দিতে হয়।

আবার অনেক সময় দেখা যায় সরকারি উদ্যোগে কোনও দ্রব্য উৎপাদন করলে বা পরিষেবার ব্যবস্থা করলে তার সুফল অন্যান্য রাজ্যেও বিস্তৃত হবে একমাত্র যদি কাজটি বৃহদায়তনে সম্পন্ন করা হয়। এইক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ নেবার ভার যদি আঞ্চলিক সরকারের হাতে তাকে তাহলে সরকার হয়ত অর্থের অভাবে উদ্যোগটি নাও নিতে পারে বা বৃহদায়তনে নাও করতে পারে। সুতরাং এই উদ্যোগটি সম্পূর্ণভাবে রূপায়ণ করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সুফল ছড়িয়ে দেবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুদানের ব্যবস্থা করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ গঙ্গা দূষণ রোধের প্রকল্পের কথা বলা যেতে পারে।

এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারকে যে অনুদান দিয়ে থাকেন তাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলি হল,

(ক) শর্তহীন অনুদান (Unconditionl Grant)

কেন্দ্রীয় সরকার কোনও শর্ত ছাড়াই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বা অনগ্রসর রাজ্যকে বা সাধারণভাবে যেসব রাজ্য সরকারের ব্যয়, আয় অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ বাজেটে ঘাটতি আছে, সেই সব রাজ্যকে অনুদান দিতে পারেন। প্রাপক

রাজ্যটি ইচ্ছামতো এই অনুদান ব্যয় করতে পারেন। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব তো হয়ই, উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার বাজেটের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল রাজ্য থেকে সংগৃহীত রাজস্ব অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যে হস্তান্তর করতে পারেন। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি আনুভূমিক সমতা স্থাপিত হয়।

তবে শর্তহীন অনুদানের কিছু অসুবিধেও আছে। প্রথমত, সরকার এই ধরনের অনুদান দিলে উপকৃত রাজ্যগুলি নিজেরা যতটা কর রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারেন ততটা কর সংগ্রহ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। দ্বিতীয়ত, প্রাপক রাজ্যটি অনুদানের অর্থ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারেন। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে সব শিল্প স্বয়ংসঙ্গত বা বাস্তবায়নযোগ্য নয় সে সব শিল্পকে, অনুদানের অর্থ, ভর্তুকি হিসেবে দিয়ে, টিকিয়ে রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এককথায় বলতে গেলে শর্তহীন অনুদানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অধঃস্তন সরকারের রাজস্ব সম্পর্কিত কার্যকলাপে উচ্চতর সরকারের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কমে যায় ঠিকই, কিন্তু সম্পদের কাম্য ব্যবহার নাও হতে পারে।

(খ) **শর্তাধীন অনুদান** (Conditional Grant)

শর্তাধীন অনুদানের অর্থ হল কেন্দ্রীয় সরকার কোনও আঞ্চলিক সরকারকে অনুদানটি অনুমোদন করার সময় কিছু শর্তও আরোপ করতে পারেন। এই শর্তগুলি আবার নানা রকমের হতে পারে। যেমন :

(i) নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্যে অনুদান অথবা নির্বাচনমূলক অনুদান (Earmarked or Selectvic Grant) : কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোনও অনুদান অনুমোদন করবার সময় কোন ক্ষেত্রে বা কোন প্রকল্পে অনুদানের অর্থটি ব্যয় করা যাবে তাও নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। যেমন কোলকাতার গঙ্গায় একটি নতুন সেতু নির্মাণ করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুদান দিতে পারেন। ঐ অনুদান থেকে পাওনা অর্থ অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

(ii) নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের শর্তাধীন অনুদান (Matching Grant) : এই ধরণের কেন্দ্রীয় অনুদান তখনই দেওয়া হয় যখন প্রাপক রাজ্য সরকার অনুদানের সমপরিমাণ অর্থ অথবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিজের রাজস্ব থেকে ব্যয় করতে সম্মতি জানায়। যেমন যদি শর্তটি এমন হয় যে প্রাপক রাজ্যকে শতকরা ২০০ ভাগ বা ১ : ১ ভিত্তিতে নিজের রাজস্ব থেকে ব্যয় করতে হবে তাহলে ১ লক্ষ টাকার কেন্দ্রীয় অনুদান পেতে গেলে রাজ্য সরকারকে নিজের কোষাগার থেকে ১ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। আবার যদি এমন হয় যে প্রাপক রাজ্যকে শতকরা ৫০ ভাগ নিজের ব্যয় করতে হবে তাহলে ১ লক্ষ টাকার কেন্দ্রীয় অনুদান পেতে গেলে রাজ্যকে ৫০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে।

(iii) থোক অনুদান বা কৃত্যগত অনুদান (Block Grant or Functional Grant) : এই ধরনের অনুদান দেবার সময় কেন্দ্রীয় সরকার অনুদানের অর্থ কি উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে কেবল তাই বলে দেন, কিন্তু বিশদভাবে কোথায় এবং কিভাবে ঐ অর্থ ব্যয় করা হবে, তা প্রাপক রাজ্য সরকারের উপরই ছেড়ে দেন। যেমন কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্যে কোনও রাজ্যকে অনুদান দিতে পারেন কিন্তু কোন কোন জেলার কোন কোন গ্রামে নলকূপ বসানো হবে তা নির্দিষ্ট করে দেন না।

আমরা ওপরে অনুদানের যে উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করেছি তার মধ্যে প্রথম দুটি উদ্দেশ্য শর্তহীন অনুদানের সাহায্যে পূরণ করা যায়, অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে গেলে অনুদানের সঙ্গে কিছু শর্ত আরোপ করার প্রয়োজন হয়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার কেন্দ্রীয় সরকার যেমন রাজ্য সরকারগুলিকে অনুদান দিয়ে থাকেন, রাজ্য সরকারও তেমনি নিজের এক্তিয়ারভুক্ত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন ধরনের অনুদান দিয়ে থাকেন—এগুলি শর্তাহীন বা শর্তাধীন, দুইই হতে পারে। যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যের স্কুলজেলা (School District)-গুলিকে যে অনুদান দিয়ে থাকেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকারও এই ধরনের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দিতে পারেন। সম্প্রতি ভারতবর্ষে সংবিধানের ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনের দ্বারা পঞ্চায়েতের মতো স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

তবে মনে রাখা দরকার কেন্দ্রীয় সরকার যে অনুদান দিয়ে থাকেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হল, ঐ অর্থের সাহায্যে গণভোগ্য সামাজিক দ্রব্য উৎপাদন করতে রাজ্য সরকারকে উৎসাহিত করা—যাতে সমগ্র দেশের আধিবাসীরাই সামাজিক দ্রব্য ভোগের সমান সুযোগ পান। সুতরাং এই অনুদান দিয়ে রাজ্য সরকার যদি অন্য কোনও প্রয়োজন মেটায় তাহলে অনুদানের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

৩.৬.৩ কর অধিক্রমণের সমস্যা (Problem of Multiple Taxation)

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় উল্লম্ব অক্ষমতা ও আনুভূমিক অসমতা ছাড়াও আরও একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন স্তরের একাধিক আঞ্চলিক সরকার একই কর ভিত্তির ওপর কর প্রয়োগ করছেন। যেমন একই ব্যক্তিকে তার অর্জিত আয়ের জন্যে বা সম্পত্তির জন্যে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে, রাজ্য সরকারকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আয়কর বা সম্পত্তি কর দিতে হয়। এই ধরনের একই করভিত্তির ওপর বিভিন্ন পর্যায়ে কর বসানোকে কর অধিক্রমণ (Multiple Taxation or Tax Overlapping) বলা হয়।

সাধারণভাবে একই করভিত্তির ওপর একাধিকবার কর সংগ্রহের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না যদি এই ধরনের কর, কর প্রদান ক্ষমতা অনুযায়ী আরোপ করা হয়ে থাকে। তবে এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব নীতির সাহায্যে আন্তঃ-রাজ্য আয় বণ্টন সুষম করার উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হতে পারে।

যে সব যুক্তরাষ্ট্রে দেশবাসীকে একই ভিত্তির ওপর একাধিকবার কর দিতে হয়, সেখানে করদাতাদের কর ভার কমাবার জন্যে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন আয়করের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কর ছাড়ের ব্যবস্থা আছে।

প্রথম ধরনের করছাড়কে জমা করলে সুবিধা (Tax Credit) বলা যেতে পারে। এর অর্থ হল কেন্দ্রীয় সরকার এইরকম নিয়ম করতে পারেন যে, যখন কোনও ব্যক্তিকে একই সঙ্গে তার নিজের রাজ্যকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আয়কর দিতে হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয় আয়কর থেকে রাজ্যসরকারকে দেওয়া আয়করের সমস্ত অংশ বা কিছু অংশ বাদ দেওয়া যাবে। ধরা যাক কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত আয়ের ওপর ১০০০ টাকা আয়কর নির্দেশ করলেন এবং ঐ ব্যক্তিটিকে একই আয়ের ওপর ৫০০ টাকা আয়কর রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। (কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন হারে আয়কর বসান বলে দেয় করের পরিমাণ সমান হয়নি)। এক্ষেত্রে কিন্তু একশ ভাগ করছাড়ের সুবিধে থাকলে করদাতাকে, ১০০০ টাকা—৫০০ টাকা = ৫০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে আয়কর বাবদ জমা দিতে হবে। কর ছাড়ের সুবিধে যদি পঞ্চাশ ভাগ হয় তাহলে ব্যক্তিটিকে ৭৫০ টাকা (অর্থাৎ ১০০—৫০০ টাকা পঞ্চাশ শতাংশ = ১০০০-২৫০ = ৭৫০) আয়কর হিসেবে কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে।

দ্বিতীয় আর এক ধরনের কর ছাড়ের সুবিধেও কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেন। একে বলা যেতে পারে করযোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে ছাড় (Income Tax deductions)। ধরা যাক কোনও একটি রাজ্যে A এবং B উভয়েরই রাজ্য সরকারকে ১০০০ টাকা করে আয়কর দিতে হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে A এবং B উভয়েরই করযোগ্য আয়ের পরিমাণ, যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয় আয়কর হিসেব করা হবে তার পরিমাণ ১০০০ টাকা করে কমবে। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের ছাড়ের ফলাফল এক নাও হতে পারে। ধরা যাক দেয় কর হিসেব করার আগে A ব্যক্তিগত আয়ের যে শ্রেণীতে বা বিভাগে ছিল সেখানে কেন্দ্রীয় প্রান্তিক আয়করের হার শতকরা ৫০ ভাগ কিন্তু B, ব্যক্তিগত আয়ের যে শ্রেণীতে ছিলেন সেখানে কেন্দ্রীয় আয়করের হার শতকরা ২৫ ভাগ। এখন উভয়েরই করযোগ্য আয় ১০০০ টাকা কমে যাওয়ায় A-কে ৫০০ টাকা (১০০০ × ·৫ = ৫০০) কম আয়কর কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হচ্ছে, কিন্তু B কে ২৫০ টাকা (১০০০ × ·২৫ = ২৫০) কম আয়কর কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ এই ধরনের কর ছাড়ের ফলে A-এর সঞ্চয়, B-এর সঞ্চয়ের থেকে বেশি হচ্ছে।

এই ধরনের কর ছাড়ের সুবিধে আমেরিকা, ক্যানাডা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যবস্থায় আয়কর, সম্পত্তিকর প্রভৃতির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে। এর একটা সুবিধে হল এই যে, রাজ্য সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি কর বসাতে বা করের হার বৃদ্ধি করতে দ্বিধা করেন না। কারণ তাঁরা জানেন করদাতারা উচ্চতর সরকারকে যদি একই কর দেন তাহলে তাঁরা বিশেষ কর ছাড়ের সুবিধে পাবেন। অর্থাৎ তাঁদের ওপর কর হার বৃদ্ধির কোনও প্রতিকূল প্রভাব পড়বে না।

৩.৭ যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থার সমস্যা

আমরা দেখেছি, যে সব রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেখানে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে একটি বিশেষ ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থাও থাকা দরকার, যার ভিত্তি হল সরকারি আয় ব্যয় করার ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা। কিন্তু এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থা কিছু সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে।

প্রথমত, যখন একাধিক অনুসংগঠনের হাতে কর নীতির নির্ণয় এবং কার্যে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব থাকে তখন সমগ্র রাষ্ট্রের জন্যে একটি কাম্য কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যে কর বসানো এবং আদায়ের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব দেখা দিতে পারে। (যেমন) কোনও রাজ্য সরকার এমন কিছু কর বসাতে পারেন যে সব কর অন্যান্য রাজ্য সরকার অবাঞ্ছিত মনে করতে পারেন। যেমন কোনও একটি রাজ্য এককভাবে অন্যান্য রাজ্য থেকে আনা দ্রব্যের ওপর পণ্য প্রবেশে কর (Octroi Duty) বসাতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, কর আদায়ের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হবে তত কার্যকরভাবে কর দানের ক্ষমতাকে ব্যবহার করা যাবে। যেমন অনেক রাজ্য সরকার বা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জানা সম্ভব নয় তাদের এক্তিটারভুক্ত এলাকার বাসিন্দাদের, এলাকা বাইরে কোনও সম্পত্তি আছে কিনা। এলাকার বাইরের কোনও অঞ্চল থেকে যদি তাঁরা কোনও সম্পত্তি কেনেন তখন ঐ সম্পত্তির ওপর দেয় বিক্রয়করটি থেকে তাঁদের নিজেদের রাজ্য সরকার বঞ্চিত হয়।

তৃতীয়ত, আমরা আগে দেখেছি শ্রম এবং মূলধন এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে অবাধে চলাচল করতে পারলে, অনেক সময় রাজ্য সরকারগুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্যে প্রয়োজন থাকলেও নিজের রাজ্যে কর হার বৃদ্ধি করতে পারেন না।

চতুর্থত, অনেক রাজ্য অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অনগ্রসর থাকার ফলে প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় করতে

পারেন না। আমরা দেখেছি অনুদান দিয়ে বা কেন্দ্রীয় কর রাজস্বের অংশ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই অমসতা দূর করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সবসময় সেটি সম্ভব হয় না।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায়, রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলীর বিভাজনের ফলে, একই সরকারি কাজ করার জন্য একাধিক পর্যায়ের শাসনযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যেমন একই ব্যক্তিকে যদি একবার রাজ্য সরকারকে আর একবার কেন্দ্রীয় সরকারকে আয়কর দিতে হয়, তাহলে এই দুই ধরনের আয়কর সংগ্রহের জন্যে একবার রাজ্য সরকারের, আর একবার কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ঠিক একইভাবে সম্পত্তিকরের ক্ষেত্রে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার, তিনটি সরকারই একই সম্পত্তির মালিকের কাছ থেকে নিজের নিজের শাসনযন্ত্র মারফত এই কর রাজস্ব আদায় করতে পারেন। সুতরাং সামগ্রিকভাবে কর সংগ্রহের ব্যয় বেশি পড়ে।

অনুশীলনী—৩

১। সঠিক বাক্যটিতে (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) একটি রাজ্যে কারখানা গড়ে উঠলে যদি পাশের রাজ্যের পরিবেশ দূষিত হয় তাহলে সেটিকে বাহ্যিক অসুবিধে বলা যেতে পারে। (সঠিক/ভুল)

(খ) কেন্দ্রীয় রাজস্ব বণ্টনের সময় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। (সঠিক/ভুল)

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে শর্তাধীন অনুদান পেতে গেলে রাজ্য সরকারকে সব সময় সমপরিমাণ অর্থ নিজের রাজস্ব থেকে ব্যয় করতে হয়। (সঠিক/ভুল)

(ঘ) স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের আয়ব্যয়ের ঘাটতি মেটাবার দায়িত্ব প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের। (সঠিক/ভুল)

২। কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে রাজ্য সরকারের বাজেটের ঘাটতি মেটান? (১০০টি শব্দের মধ্যে লিখুন)

৩। ১০০টি শব্দের মধ্যে রাজস্ব ব্যবস্থায় আনুভূমিক অসমতা ও উল্লম্ব অসমতার মধ্যে পার্থক্যটি বর্ণনা করুন।

৪। শর্তহীন অনুদান দিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখুন।

৩.৮ সারাংশ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বিভাজনের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য পর্যায়ের সরকার এবং রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রাজস্ব ব্যবস্থার একটি বিভাজন প্রয়োজন। এই ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থায় কর রাজস্ব সংগ্রহ বা সরকারি ব্যয় করার ক্ষমতাকে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য হল সামগ্রিক রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্যগুলি পূরণে সহায়তা করা এবং সামাজিক মঙ্গলসাধন করা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ের কর সংগ্রহের এলাকা নির্দিষ্ট করা থাকলেও কোন সরকার কি কর বসাবে সে ব্যাপারে অধিকাংশ দেশে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের হাতে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা, আয়বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করা বা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্যে যে ধরনের কর রাজস্ব আদায় করা এবং ব্যয় করা দরকার, তার দায়িত্ব থাকে। সরকারি ব্যয়ের সুফল যদি বিস্তৃত এলাকার ওপর পড়ে তাহলে সেই ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার অনেক বেশি ক্ষমতাশীল এবং অনেক বেশি সচ্ছল। সেই তুলনায় রাজ্যগুলির আর্থিক অবস্থা তত ভালো হয় না। ব্যয় করার বাধ্যবাধকতার তুলনায় তাদের কর রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা সীমিত। ফলে তাদের রাজস্ব ব্যবস্থার একটি উল্লম্ব অসমতা থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয় করার ক্ষমতা সমান না হওয়ায় ফলে তাদের মধ্যে একটি আনুভূমিক অসমতাও থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকার করবণ্টন ও অনুদানের সাহায্যে রাজ্য সরকারগুলির এই দুই ধরনের অসমতা দূর করার চেষ্টা করেন।

কর রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে ঠিক করা প্রয়োজন কি ধরনের কর রাজস্ব বণ্টন করা হবে, সংগৃহীত কর রাজস্বের কত অংশ রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্য বলে বিবেচিত হবে এবং কিসের ভিত্তিতে একটি রাজ্য সরকারের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত হবে। সাধারণত জনসংখ্যা ও কর রাজস্ব সংগ্রহের প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য অংশটুকু নির্ধারণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে অনুদান দিয়ে থাকেন তা শর্তহীন বা শর্তাধীন দুই ধরনেরই হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, অনেক জায়গায় এক ধরনের কর বিভিন্ন পর্যায়ের সরকার দেশবাসীর ওপর আরোপ করতে পারে, অবশ্য বিভিন্ন হারে। যেমন আয়কর, সম্পত্তি কর, উৎপাদন শুল্ক একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করতে একই ব্যক্তি বা দ্রব্যের ওপর কর আরোপ করে।

এই ধরনের কর অবিক্রমণের সময় করদাতাদের করভার লাঘবের জন্যে নানা কারণের করছাড়ের সুবিধে দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় সরকারি আয়-ব্যয় করার ক্ষমতায় বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বিভিন্ন রাজ্যের রাজস্ব নীতির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা দিতে পারে এবং একই সরকারি কাজ করার জন্য একাধিক পর্যায়ে সরকারি শাসন যন্ত্র ব্যবহৃত হতে পারে।

৩.৯ প্রধান শব্দগুচ্ছ

ব্যয় সুবিধে বিশ্লেষণ (Cost Benefit Analysis)	:	কোনও প্রকল্পের সামাজিক ব্যয় ও সামাজিক সুবিধের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পটির লাভযোগ্যতা বিচার করা।
রাজস্ব ব্যবস্থায় উল্লম্ব অসমতা (Vertical Fiscal Imbalance)	:	কোনও একটি সরকারের কর রাজস্ব মারফত অর্জিত আয় ও ব্যয়ের মধ্যেকার অসাম্য বা ঘাটতি।
রাজস্ব ব্যবস্থায় আনুভূমিক অসমতা (Horizontal Fiscal Imbalance)	:	বিভিন্ন রাজ্য সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রের বৈষম্য
কর আদায়ের প্রচেষ্টা (Tax Effort)	:	একটি সরকারের নিজের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় কর সংগ্রহের ক্ষমতা
বাহ্যিক সুবিধে-অসুবিধে (Spill Overs or Externalities)	:	কোনও শিল্পের প্রসার ঘটার ফলে অন্যান্য শিল্পের যে সুবিধা বা অসুবিধে হয়। যেমন একটি কারখানা গড়ে উঠলে আশে-পাশের কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নানারকম সুবিধে বা অসুবিধে হতে পারে।
পণ্য প্রবেশ কর (Octroi)	:	দেশের অভ্যন্তরে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে পণ্যসামগ্রীর প্রবেশ করার সময় দেয় কর।

৩.১০ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। (ক) সঠিক (খ) সঠিক (গ) সঠিক (ঘ) সঠিক

২। ৩.৩ অংশ দেখুন।

৩। ৩.২ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—২

১। (ক) সঠিক (খ) সঠিক (গ) সঠিক (ঘ) সঠিক

অনুশীলনী—৩

১। (ক) সঠিক (খ) ভুল (গ) ভুল (ঘ) ভুল

২। ৩.৬ (ক) ও ৩.৬ (খ)

২। ৩.৬ (ক), (খ) ও ৩.৬.১ ও ৩.৬.২

৪। ৩.৬.২ (খ)

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে ; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 225.00

Published by : Netaji Subhas Open University, 1 Woodburn Park, Kolkata–700 020 and
Printed at : Calcutta Repro Graphics, 36/8B Sahitya Parishad Street, Kolkata-700 006